KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA

18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007	Place of Publication ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভেনিউ, কলি-১৩
Collection : KLMLGK	Publisher মীর ওবায়দ
Title চতুরঙ্গ	Size 7"x9.5" 17.78x24.13 c.m.
Vol. & Number : ৪৯/৪ ৪৯/৫ ৪৯/৬ ৪৯/৭	Year of Publication শ্রাবণ ১৩৯৫ || Aug 1988 ভাদ্র ১৩৯৫ || Sep 1988 আশ্বিন ১৩৯৫ || Oct 1988 কার্তিক ১৩৯৫ || Nov 1988
	Condition : Brittle Good
Editor : আবদুর রউফ	Remarks :

C.D. Roll No. KLMLGK

হুমায়ুন কবির এবং আতাউর রহমান-প্রতিষ্ঠিত

চতুরঙ্গ

৪৯ বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা অগস্ট ১৯৮৮

সূচিপত্র

প্রাথমিক শিক্ষায় মানবশিশুর "জন্মগত অধিকার" । ১৯৬০ সালের
মধ্যে স্বাধীন ভারতের প্রতিটি শিশুকে এই
অধিকার দিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ছিলেন আমাদের নেতারা ।
পরিণতি কী দাঁড়িয়েছে ? প্রদত্ত
শিক্ষার মানই বা কেমন ? জাতিগঠনের পক্ষে প্রাসঙ্গিক
এইসব গুরুতর প্রশ্নের বিশ্লেষণ করেছেন প্রবীণ
বুদ্ধিজীবী এবং অর্থনীতিবিদ ড· ভবতোষ দত্ত তাঁর "প্রাথমিক
শিক্ষার অধিকার" প্রবন্ধে ।

প্রায় নব্বই বছর আগে স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন
"শূদ্রশাসনের" প্রতিষ্ঠা । তাঁর সেদিনের
সমাজভাবনা আজকের ভারতে কতখানি প্রাসঙ্গিক ?
এই নিয়ে অধ্যাপক
অমলেন্দু দে'র সন্দর্ভ "স্বামী বিবেকানন্দের
সমাজভাবনা ও তার প্রাসঙ্গিকতা" ।

পাঠ্যপুস্তকে গুচ্ছখানেক নীতিবাক্য শিখিয়ে শিশুদের কি
সমাজের প্রতি দায়বদ্ধ, পূর্ণপরিণত মানুষ
হিসাবে গড়ে তোলা যায় ? এই
প্রশ্ন নিয়ে মহাশ্বেতা চৌধুরীর আলোচনা
"হিতোপদেশ ও একটি শিশু" ।

বাঙলা ভাষায় প্রবন্ধের প্রকৃতি এবং অঙ্গরূপ নিয়ে মৌলিক আলোচনার
ঘাটতিপূরণের প্রয়াসে অধ্যাপক সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের
নিবন্ধ "প্রবন্ধ : সংজ্ঞা ও স্বরূপ" ।

নিপীড়িত কৃষকসমাজের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামকে রবীন্দ্রনাথ
কী চোখে দেখেছিলেন ? "প্রায়শ্চিত্ত"
নাটকের পরিপ্রেক্ষিতে ড· কান্তি গুপ্তর অনুসন্ধান ।

আধুনিক বাঙলা গানের সংকট নিয়ে
সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়ের বিস্তারিত আলোচনা ।

… মনে রেখো তোমার অন্তরে
আমিই রয়েছি,
নিরাশ হয়ো না।
তোমার প্রতিটি চেষ্টা, প্রত্যেক ব্যথা,
প্রত্যেক উল্লাস আর প্রত্যেক বেদনা,
তোমার হৃদয়ের প্রত্যেক আহ্বান,
তোমার মর্মের প্রত্যেক আকাঙ্ক্ষা …
সব জিনিস, কোনো কিছু বাদ না দিয়ে …
তোমাকে নিয়ে চলেছে আমারই দিকে …

— শ্রীমা

বর্ষ ৪৯। সংখ্যা ৪
অগস্ট ১৯৮৮
শ্রাবণ ১৩৯৫

প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার ভবতোষ দত্ত ২৮৫

প্রবন্ধ : সংজ্ঞা এবং স্বরূপ স্বনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ২৯৮

হিতোপদেশ এবং একটি শিশু মহাশ্বেতা চৌধুরী ৩২০

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজভাবনা অমলেন্দু দে ৩২৮

বরং রত্নেশ্বর হাজরা ২৯৪

চিরস্থায়ী নয় শীতল চৌধুরী ২৯৫

চিতা স্বজন হাজারী ২৯৬

জল কাটি জয়নাল আবেদীন ২৯৭

অসুখ রামচন্দ্র প্রামাণিক ৩১৪

সাহিত্য সমাজ সংস্কৃতি ৩৪২

"প্রায়শ্চিত্ত" ও বাঙলার কৃষকের মৌল অধিকার কান্তি গুপ্ত ॥

বামপন্থী সাহিত্যচেতনা বিপ্লব মাজী

শিবকুমার জোশী ও "সোনল ছায়" গৌরী ধর্মপাল

গ্রন্থসমালোচনা ৩৫৪

সন্তোষকুমার অধিকারী, সৌম্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত, খাজিম আহমেদ, কান্তি গুপ্ত

সংগীত ৩৬৪

বাঙলা আধুনিক গান : সংকটের আবর্তে সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

মতামত ৩৬৯

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য, সামসুল আলম সাঈদ, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

কলিকাতা লিটল ম্যাগাজিন লাইব্রেরি
ও
গবেষণা কেন্দ্র
১৮/এম, ট্যামার লেন, কলকাতা-৭০০০০৯

শিল্পপরিকল্পনা। রনেনআয়ন দত্ত

নির্বাহী সম্পাদক। আবদুর রউফ

শ্রীমতী নীরা রহমান কর্তৃক রামকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্‌, ৪৪ সীতারাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৯ থেকে অন্তরঙ্গ প্রকাশনী প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে মুদ্রিত ও ৫৪ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১৩ থেকে প্রকাশিত ও সম্পাদিত। ফোন : ২৭-৬৩২৭

ডঃ বিমলেন্দু মিত্র-এর

বিজ্ঞান পথিকৃৎ জগদীশচন্দ্র বসু

আচার্য জগদীশচন্দ্র পথিকৃৎ বিজ্ঞানী। ক্ষুদ্রতম মাইক্রোওয়েভ তিনি আবিষ্কার করেছেন। পদার্থের অর্ধপরিবাহিতা তাঁর আবিষ্কার। 'সাইবারনেটিক্‌স্'-এর তিনি আদিপুরুষ। আমরা এসব জানতাম না, বরং ভুল জানতাম, তিনি গাছের প্রাণ আবিষ্কার করেছেন। তিনি প্রথম জীবপদার্থবিজ্ঞানী, যিনি পদার্থবিদ্যার যন্ত্রপাতি দিয়ে প্রমাণ করেছিলেন,—প্রাণের কোনও রকমফের নেই, প্রাণী-উদ্ভিদে প্রাণের অভিব্যক্তি একই। এই বইটিতে জগদীশচন্দ্রের আবিষ্কার সম্বন্ধে অনেক ভুল ধারণা অপসারিত করে প্রকৃত তথ্য অতি প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করা হয়েছে। সেইসঙ্গে উপন্যাসের মত চমকপ্রদ তাঁর জীবনকাহিনী বর্ণনা। মূল্য ১৬ টাকা

ডঃ সূর্যেন্দুবিকাশ কর মহাপাত্র-এর

মেঘনাদ সাহা : জীবন ও সাধনা

এদেশে বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে মেঘনাদ সাহাকে কেন একজন অনন্য বিজ্ঞানী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়, বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণায় তাঁর ভূমিকা কতখানি, জ্যোতির্বিজ্ঞান, পরমাণু-বিজ্ঞান, জীব-পদার্থতত্ত্ব, নিউক্লিয় বিজ্ঞান গবেষণা এবং প্রয়োগে তিনি কতটা সার্থক, নদী-পরিকল্পনা রূপায়ণে তাঁর ভাবনা কতখানি সুদূরপ্রসারী ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লেখা অনবদ্য জীবনকাহিনী যে কোন বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসু পাঠককে তৃপ্ত করবে। মূল্য ২৫ টাকা

শ্রীভূমি

শ্রীভূমি পাবলিশিং কোম্পানী

৭৯, মহাত্মা গান্ধী রোড ॥ কলিকাতা-৭০০ ০০৯

প্রাথমিক শিক্ষার অধিকার

ভবতোষ দত্ত

আমাদের সংবিধানের "মৌলিক অধিকার"-এর পরিচ্ছেদে অনেক রকম স্বাধীনতা বা অধিকারের উল্লেখ আছে, কিন্তু প্রত্যেকটি শিশুর প্রাথমিক শিক্ষা পাবার আইনগ্রাহ্য কোনো অধিকার এর মধ্যে নেই। আছে ধর্মগত বা ভাষাগত সংখ্যালঘুদের নিজস্ব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান স্থাপন এবং পরিচালনার অধিকার। এটাও বলা আছে যে, এইসব সংখ্যালঘুদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে সরকার কোনো বৈষম্যমূলক আচরণ করতে পারবেন না। অর্থাৎ, যদি অন্য বিদ্যালয়কে সরকারি অর্থ-সাহায্য দেওয়া হয়, তাহলে একই নীতি অনুসারে সংখ্যালঘুদের বিদ্যালয়কে সাহায্য করতে হবে। মৌলিক অধিকার কোর্টে গিয়ে আদায় করা যায়। সর্বজনীন ও বিনামূল্যে প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে একটি নির্দেশ আছে সংবিধানের পরবর্তী অধ্যায়ে "নির্দেশক নীতিসমষ্টি"র মধ্যে। এখানে বলা হয়েছে যে, সংবিধান কার্যকর হবার পর থেকে (অর্থাৎ ১৯৫০-এর পর থেকে) দশ বছরের মধ্যে সরকার দেশের ১৪ বছর বয়স পর্যন্ত সব শিশুকে বিনামূল্যে এবং বাধ্যতামূলক ভাবে প্রাথমিক শিক্ষাদানের 'চেষ্টা করবেন'।

এই নির্দেশটিকে একটা নৈতিক প্রতিশ্রুতি বলে ধরে নেওয়া উচিত। কিন্তু সংবিধান প্রবর্তনের ৩৮ বছর পরেও এই প্রতিশ্রুতি পালন করা সম্ভব হয় নি। সপ্তম পরিকল্পনাতে ধরা হয়েছিল যে ১৯৮৯-৯০তে ছয় থেকে চোদ্দ বছরের ১০৪ শতাংশ ছেলে আর ৮০ শতাংশ মেয়ে—এবং ছেলে-মেয়ে একত্র করে ৯৩ শতাংশ—স্কুলে এসে যাবে। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, যদি সব শিশুই স্কুলে ভরতি হয় তাহলে শতাংশের হিসাবে অনুপাতটা ১০০-র বেশি হবে, কারণ বয়ঃসীমার নীচের কিছু এবং উপরের কিছু ছাত্র স্কুলে থাকে, বা অন্তত নাম লেখানো থাকে। যদি ৬-১১ এবং ১১-১৪ এই দুই বয়স-স্তরকে আলাদা করে দেখা হয়, তাহলে ১৯৮৯-৯০তে প্রথম স্তরে ৯৯·৮৯ শতাংশ এবং দ্বিতীয় স্তরে (১১-১৪) ৭৯·৪৬ শতাংশ ছেলেমেয়ের স্কুলে আসার কথা। যদি ছেলে আর মেয়েদের হিসাব আলাদা করে দেখা যায়, তাহলে চোখে পড়ে দুই স্তরেই এখনো অনেক মেয়ে স্কুলে আসে নি—৬ থেকে ১১-র স্তরে প্রায় ৭০ লক্ষ এবং ১১-১৪-র স্তরে ৯০ লক্ষ সপ্তম পরিকল্পনার শেষে স্কুলের বাইরে থেকে যাবে।

এই সংখ্যাগুলি আর-একটু বিশদভাবে দেখা প্রয়োজন। প্রথমত, যেখানেই বেসরকারি সমীক্ষা হয়েছে সেখানেই দেখা গিয়েছে যে, ছাত্রছাত্রীসংখ্যা সরকারি হিসাবে যা দেখানো হয় তার চেয়ে আসলে ২০-২৫ শতাংশ কম। খাতায় নাম আছে, অথচ স্কুলে আসে না—এরকম ছাত্রের, এবং বিশেষ করে

ছাত্রীর সংখ্যা বয়স বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে বাড়তে থাকে। প্রথম শ্রেণীতে যতজন থাকে, চার বছর পরে পঞ্চম শ্রেণীতে থাকে তার চেয়ে অনেক কম। এই 'ড্রপ-আউট' বা পথিমধ্যে ছেড়ে দেওয়ার একটা কারণ বলা হয় যে একটু বড়ো হলে গ্রামাঞ্চলের ছেলেরা এবং বিশেষ করে মেয়েরা বাবার পেশাতে এবং মায়ের গৃহস্থালিতে সাহায্য করে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কোনো ফী লাগে না, সরকার বিনামূল্যে সব বই দেন, তবু ছাত্রসংখ্যা কমতে থাকে। যে কারণটার কথা বলা হল সেটা ছাড়া অন্য কারণও আছে। পশ্চিমবঙ্গেই এমন জেলা আছে (জলপাইগুড়ি, পুরুলিয়া) যেখানে মেয়েরা স্কুলে আসতে পারে না, কারণ স্কুলে আসতে হলে ন্যূনতম যেটুকু জামাকাপড় প্রয়োজন তাও তাদের নেই। টিফিনে কিছু খাদ্য দিলে ছেলেমেয়েরা আকৃষ্ট হয়, মেয়েদের বেলাতে একপ্রস্থ স্কুলের পোশাক দিতে পারলে হয়তো কাজ হবে।

দ্বিতীয়ত, সংখ্যাটা বেশি করে দেখানোর একটা আকর্ষণ আছে। প্রাথমিক স্কুলে ক-জন শিক্ষক থাকবেন সেটা নির্ভর করে ছাত্রসংখ্যার উপরে। প্রতি ৩০ থেকে ৪০ জন ছাত্রের জন্য একজন শিক্ষক। অতএব, খাতায় বেশি ছাত্র দেখাতে পারলে বাড়তি শিক্ষক নিয়োগের অনুমোদন পাওয়া যায়। শিক্ষকের সংখ্যা বাড়িয়ে তোলা হয় শুধু শিক্ষাগত প্রয়োজনে নয়, রাজনৈতিক কারণেও। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির অল্প পরেই আমাদের রাজনৈতিক দলগুলির কর্মকর্তারা বুঝলেন যে গ্রামে-গ্রামে বিনা-ব্যয়ে যদি দলের কাজ করবার লোক পেতে হয়, তাহলে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকেরা সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবেন। পশ্চিমবঙ্গে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকের সংখ্যা দেড়লক্ষেরও বেশি। সারা ভারতে স্কুল-শিক্ষকের সংখ্যা ২৫ লক্ষ। এ ধরনের সংগঠিত কর্মী সারা দেশময় ছড়ানো—এর সঙ্গে তুলনীয় আর কিছু নেই। তাই প্রত্যেক দলই চেষ্টা করে প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকদের তাদের পতাকার নীচে আনতে, তাদের দলের মতানুসারী বিশ্বস্ত শিক্ষকের নিয়োগ বাড়াতে। প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তার এখন শুধু স্কুল-স্থাপন আর শিক্ষক-নিয়োগেই সীমিত। শিক্ষার প্রয়োজনে শিক্ষাবিস্তার হোক, এটা দ্বিতীয় স্তরে এসেছে।

তৃতীয়ত, প্রাথমিক শিক্ষার বিস্তারে সর্বভারতীয় সংখ্যাটাকে মেনে নিলেও দেখা যায় যে, সব রাজ্যে সমান উন্নতি হয় নি। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে এবং নতুন প্রতিষ্ঠিত রাজ্যগুলিকে বাদ দেওয়া সমীচীন। কারণ, সেখানে জনসংখ্যার তুলনায় সরকারি ব্যয় খুব বেশি। এদের কিছু-কিছু হিসাব বিশ্বাস-যোগ্যও নয়—যেমন ১৯৮৪-৮৫তে স্থানীয় প্রশাসনের দেওয়া হিসাব অনুসারে লাক্ষাদ্বীপে ৬-১১ বয়স-স্তরের শিশুদের মধ্যে ১৬৮ শতাংশই স্কুলে পড়ত। এই অনুপাতটা নাগাল্যানড, মণিপুর, মেঘালয়, সিকিম, ত্রিপুরা, আন্দামান-নিকোবর, গোয়া-দামন-দিউ, পনডিচেরি ইত্যাদি অঞ্চলে বা রাজ্যে একশর চেয়ে অনেকটা বেশি। চণ্ডীগড়ে সামান্য বেশি, কিন্তু দিল্লীতে কম। পুরানো রাজ্যগুলির মধ্যে সবচেয়ে ভালো অনুপাত মহারাষ্ট্রে—১১৩ শতাংশ। এ ছাড়া ১০০ শতাংশের উপরে আছে কেরল (১০৩), পনজাব (১০১), পশ্চিমবঙ্গ (১০৭)। কিন্তু সর্বত্রই অনুপাতটা ছেলেদের মধ্যে বেশি, মেয়েদের মধ্যে কম। এই বৈষম্য কেরলে খুব কম—সেখানে ৬-১১ বয়স-স্তরের ৯৮'৫ শতাংশ মেয়ে ১৯৮৪-৮৫তে প্রাথমিক ক্লাসে পড়ত। সবচেয়ে পশ্চাদ্‌বর্তী রাজ্য উত্তরপ্রদেশ (৭২ শতাংশ)। আসাম এবং বিহারেও অনুপাতটা ৮০-র নীচে।

এর পরের স্তরে (১১-১৪), দুটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল—গোয়া-দামন-দিউ এবং মিজোরাম—বাদে আর সর্বত্রই অনুপাতটা অনেক নীচে। ১৯৮৪-৮৫-র হিসাব অনুসারে অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার, ওড়িশা আর রাজস্থানে বয়স-স্তরের ৪০ শতাংশও স্কুলে পড়ে না। কেরলে এই অনুপাত ৯৭ শতাংশ, কিন্তু মহারাষ্ট্রে

মাত্র ৬৩'২১, পশ্চিমবঙ্গে ৬৪'৪০। এর মধ্যে মেয়েদের আলাদা করে নিলে দেখা যায়, বিহারে এই বয়স-স্তরের মাত্র ১৬ শতাংশ স্কুলে এসেছে, রাজস্থানে ১৯ শতাংশ, উত্তরপ্রদেশে ২১'৭। পশ্চিমবঙ্গে এই অনুপাত ৫৭'৩ শতাংশ। মোট সংখ্যার হিসাবটাও দেখে নেওয়া উচিত। ১৯৮৪-৮৫তে সারা ভারতে ৬-১১ বয়স-স্তরে মোট ছাত্রসংখ্যা ছিল ৮'৫৪ কোটি আর এর পরের ১১-১৪ স্তরে ছিল মাত্র ২'৬৭ কোটি। ১১ বছর বয়সের পরে এক বিরাটসংখ্যক ছেলেমেয়ে স্কুলের পড়াশোনা ছেড়ে দেয়। কিন্তু এদের আনতে না পারলে সংবিধানের নির্দেশ পালনের পথে লক্ষণীয় অগ্রগতি হবে না। সপ্তম পরিকল্পনায় ধরা হয়েছিল যে ১৯৮৯-৯০ সালে ছাত্রছাত্রীসংখ্যা বাড়বে ৬-১১ স্তরে আরো ১০'৬ লক্ষ এবং ১১-১৪ স্তরে ১৪'৯৪ লক্ষ। কিন্তু এর পরেও আরো অনেকে বাকি থাকবে। বিশেষত পাঁচ বছরে ৬-১৪ বছরের শিশুদের সংখ্যা বাড়বে প্রায় ১'৫ কোটি। অর্থাৎ আমাদের লক্ষ্যস্থল অনেক দূরে থাকবে। শেষ পর্যন্ত এই বিরাট ব্যবধানের প্রধান কারণ এই যে, এখনো যেসব জায়গায় প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারিত হয় নি, সেগুলি দুর্গম আরণ্য বা পার্বত্য অঞ্চল। কিন্তু শহরাঞ্চলেও সমস্যা থেকে যাবে—জনসংখ্যা এবং বহিরাগতদের সংখ্যা-বৃদ্ধিতে। পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার দিক থেকে কলকাতার অবস্থা বিশেষভাবে শোচনীয়।

কত প্রাথমিক স্কুল আছে?

স্কুলের সংখ্যার হিসাবটা একটু গোলমেলে। প্রথম দিকে পরিকল্পনা ছিল যে কিছু প্রাথমিক স্কুল হবে ৬-১১ স্তরের জন্য (প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণী), আর কিছু হবে ১১-১৪ স্তরের জন্য। শিক্ষাদানের প্রথা অনুসারে, কিছু স্কুল হবে সাধারণ ধরনের এবং কিছু হবে মহাত্মা গান্ধী প্রবর্তিত "বুনিয়াদি" ধরনের—যেখানে সব লেখাপড়া শেখানো হবে হাতের কাজের মাধ্যমে। ১১-১৪ স্তরে হবে জুনিয়র হাই-স্কুল। (ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী) আর বুনিয়াদি প্রথায় সীনিয়র বেসিক স্কুল। এর পরে থাকবে হাইস্কুল—নবম, দশম, একাদশ শ্রেণী নিয়ে। (তখনো ১০+২-এর প্রথা আসে নি)। কিন্তু হাইস্কুলেও ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী থাকবে। এর মধ্যে ঠিক কোন্ স্কুল কোন্ ধরনের—বিশেষ মধ্যবর্তী স্তরে —সেটা বার করা শক্ত। পশ্চিমবঙ্গে ১৯৮৫-৮৬-তে প্রাইমারি ও 'জুনিয়র বেসিক' স্কুল ছিল ৫০,৮১১, জুনিয়র হাইস্কুল (ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী) ছিল ৩,৮৯০, 'হাই' ও 'হায়ার সেকেনডারি' (এখন ১০+২) স্কুল ছিল ৬,৫৮০। একটু ক্ষোভের সঙ্গেই বলতে হয় যে মার্চ ১৯৮৮-তে প্রকাশিত ১৯৮৭-৮৮ সালের পশ্চিমবঙ্গের "আর্থিক সমীক্ষা"তে ১৯৮৬-৮৭ সালের স্কুলের সংখ্যাটা দেওয়া নেই। আর-একটা কথা বলে নিতে হয়—উচ্চ মাধ্যমিক (এগারো-বারো) কলেজেও পড়ানো হয়।

অন্য দেশের সঙ্গে তুলনায় সংখ্যাগত দিক থেকে ভারতের অবস্থা খুব নিন্দনীয় নয়। উচ্চবিত্ত দেশগুলির সঙ্গে তুলনা করা অর্থহীন, কারণ সেসব দেশে (ধনতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক যাই হোক না কেন) প্রথম স্তরে ৬-১১ বয়সের মোট শিশুর সংখ্যার ১০০ শতাংশই স্কুলে পড়ে। দু-একটা দেশে অনুপাতটা সামান্য নীচে—৯৮ বা ৯৯, আর কয়েকটি দেশে ১০০-র সামান্য উপরে। ওইসব দেশে সাধারণত বয়সের হিসাবটা নির্ভরযোগ্য। বিশ্বব্যাঙ্কের ১৯৮৭ সালের "ওয়ার্লড ডিভেলপমেনট রিপোর্ট"-এ শিক্ষা-সম্বন্ধীয় তথ্য দেওয়া আছে ১৯৬৫ এবং ১৯৮৪-র—ছেলে আর মেয়েদের আলাদা করে। ১২৮টি দেশের মধ্যে ৩৭টিকে "নিম্নবিত্ত" শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে—গড়পড়তা বার্ষিক আয় অনুসারে। এই মাপকাঠিতে ভারতের স্থান নীচের দিক থেকে সপ্তদশ। প্রাথমিক স্তরে (৬-১১) মোট শিশুসংখ্যার তুলনায় ছাত্র-ছাত্রীর অনুপাত ভারতে ১৯৬৫-তে ছিল ৭৪ শতাংশ

আর ১৯৮৪-তে ৯০ শতাংশ। যথারীতি, মেয়েদের ক্ষেত্রে অনুপাতটা অনেক কম। বাংলাদেশে মোট হিসাবে অনুপাতটা ১৯৮৪-তে ছিল ৬২ শতাংশ, বর্মাতে ১০২ শতাংশ, চীনে ১১৮ শতাংশ, শ্রীলঙ্কাতে ১০৩ শতাংশ। পাকিস্তানে খুবই কম—মাত্র ৪২ শতাংশ। পাকিস্তানে প্রাথমিক স্তরে ছাত্রীসংখ্যা মোট ৬-১১ বয়স-স্তরের মেয়েদের মাত্র ২০ শতাংশ। চীনের অনেক ব্যবস্থাই আমাদের নেওয়া কঠিন, কিন্তু শ্রীলঙ্কার সাফল্য অনুকরণীয়।

১৯৮৫-তে কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয়ের মধ্যে শিক্ষাখাতে ব্যয় ভারতে ছিল ১·৯ শতাংশ, পাকিস্তানে ১·২ শতাংশ, কিন্তু বর্মাতে ১১·৭ শতাংশ। চীনের হিসাব নেই। এখানে অবশ্য বলা দরকার যে এই তুলনা ত্রুটিপূর্ণ, কারণ ভারতে শিক্ষা-খাতে সরকারি ব্যয়ের অধিকাংশই হয় রাজ্য সরকারের বাজেট থেকে। কেন্দ্রীয় সরকারের মোট ব্যয়ের সঙ্গে শিক্ষার জন্য ব্যয়ের অনুপাতটা 'একক' রাষ্ট্রে বেশি দেখা যাবে, ফেডারাল বা যুক্তরাষ্ট্রে কম দেখা যাবে।

পশ্চিমবঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষার প্রসারের জন্য যথার্থ ব্যয় কত?

ভারতে শিক্ষার জন্য মোট সরকারি ব্যয় সাম্প্রতিক কালে অনেকটা বেড়েছে। কেন্দ্রীয় বাজেটে শিক্ষা-খাতে ব্যয় ছিল ১৯৮৭-৮৮-তে ১২০৯টি কোটি টাকা, আর ১৯৮৮-৮৯-র বাজেটে ধরা হয়েছে ১৫৮৪ কোটি টাকা। কিন্তু এ টাকার কিছুটা দেওয়া হয় মাধ্যমিক স্কুলে আর বাকি সবটা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রযুক্তি-শিক্ষণ, গবেষণা ইত্যাদির জন্য। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য সবটা ব্যয়ই করতে হয় রাজ্যসরকার-গুলিকে। ১৯৮৭-৮৮র বাজেটে ভারতের ২৫টি রাজ্য 'শিক্ষা, খেলাধুলা, কলা ও সংস্কৃতি'র জন্য মোট বরাদ্দ করেছিল ৮৪৪২ কোটি টাকা। এটা দু বছর আগের ৬৮৪০ কোটি টাকা থেকে ২৩·৪ শতাংশ বেশি। রাজ্য বাজেটের বেশির ভাগ টাকাই ব্যয়িত হয় প্রাথমিক শিক্ষার জন্য। পশ্চিমবঙ্গ সরকার শিক্ষাখাতে ব্যয় বরাদ্দ করেছিলেন ১৯৮৭-৮৮-তে ৭৬৫ কোটি টাকা, আর ১৯৮৮-৮৯-শে করেছেন ৮২০ কোটি টাকা। এর ৬০ থেকে ৭০ শতাংশ ব্যয়িত হবে প্রাথমিক স্তরে। কিন্তু এর মধ্যেও একটা অপ্রীতিকর প্রশ্ন ওঠে। মোট বরাদ্দ ৮২০ কোটি টাকার মধ্যে ৭৪০ কোটি টাকা 'পরিকল্পনা-বহির্ভূত'। অর্থাৎ, টাকাটা প্রধানত লাগে চালু স্কুলকলেজের শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতন ইত্যাদি দিতে। পরিকল্পনা খাতে আছে মাত্র ৮০ কোটি টাকা—এই থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রসারণ থেকে আরম্ভ করে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্থায়ী সম্পদ গঠন (বাড়ি, আসবাব ইত্যাদি) সব ব্যয় নির্বাহ করতে হবে।

আরো একটা কথা এখানে ওঠে। পরিকল্পনায় যে টাকা বরাদ্দ করা হয়, সেটা সব সময়ে পাওয়া যায় না। যদি কখনো কোনো কারণে (এরকম কারণের অভাব নেই) পরিকল্পনা ব্যয়ে কাটছাঁট করতে হয় তাহলে তার আঘাত সর্বাগ্রে এসে পড়ে শিক্ষা বাজেটের উপরে। প্রথম দিকে বড়ো-বড়ো কথা বলা হয়, পরে শিক্ষাপরিকল্পনা সংকুচিত করা হয়। সপ্তম পরিকল্পাতে ধরা হয়েছিল যে ১৯৮৫-৯০ এই পাঁচ বছরে শিক্ষা, ক্রীড়া ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে কেন্দ্র, রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের নতুন ব্যয় (পরিকল্পনা-বহির্ভূত বেতন ইত্যাদির ব্যয় বাদ দিয়ে) হবে ৬৩৮৩ কোটি টাকা, অর্থাৎ মোট পরিকল্পনা-ব্যয় ১,৮০,০০০ কোটি টাকার ৩·৫৫ শতাংশ। এ হিসাবটা করা হয়েছিল ১৯৮৪-৮৫ সালের মূল্যমান অনুসারে। এখন (১৯৮৮-র মধ্য ভাগে) পাইকারি মূল্যসূচী প্রায় ২৩ শতাংশ বেশি। প্রত্যেক বছরের মূল্যবৃদ্ধি অনুসারে বরাদ্দটা সংশোধন করে নিলে ৬৩৮৩ কোটি টাকা প্রায় ৭৩০০ কোটি টাকাতে দাঁড়াবে। পরিকল্পনার চতুর্থ বছরে শিক্ষা খাতে পরিকল্পনা-ব্যয় হওয়া উচিত প্রায় ১৪০০ কোটি টাকা। রাজ্যগুলির মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই প্রয়োজনীয় টাকার সংস্থান হবে না। একটি চালু প্রস্তাব আছে যে শিক্ষার জন্য সর্বস্তরে মোট ব্যয় জাতীয় মোট আয়ের অন্তত ৬ শতাংশ হওয়া উচিত। এ প্রস্তাব অনুসারে ১৯৮৬-৮৭-তে আমাদের মোট শিক্ষা-ব্যয় হওয়া উচিত ছিল ১৫,৫০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে অবশ্য শুধু সরকারি ব্যয় নয়, অভিভাবকের ব্যয়ও ধরা আছে। আমরা এর কাছাকাছিও পৌঁছতে পারি নি। পারিবারিক ব্যয়ের হিসাব পাওয়া শক্ত, তাই জোর করে কিছু বলা যায় না। তবে একথা স্বীকার্য যে প্রাথমিক স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য অভিভাবকের প্রত্যক্ষ ব্যয় (শহরের উচ্চবিত্ত শ্রেণীর কথা ছেড়ে দিলে) খুবই কম।

মূল প্রশ্ন : প্রাথমিক শিক্ষার মান কেমন?

এত সব তথ্যের পরে যে মৌলিক প্রশ্নটা ওঠে তার উত্তর পরিসংখ্যান দিয়ে দেওয়া যায় না। প্রশ্নটা শিক্ষার মানের। এটাকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম, শিক্ষণ-ব্যবস্থা, মূল্যায়ন-ব্যবস্থা ও শিক্ষার সহায়ক অনুষঙ্গের ব্যবস্থা। আরো একটা প্রশ্ন থাকে—প্রাথমিক স্তরের পরে যারা স্কুলে-পড়া ছেড়ে দেয়, তাদের শিক্ষিত রাখার এবং অধিকতর শিক্ষিত করার ব্যবস্থার প্রশ্ন। প্রাথমিক স্তরের পাঠক্রম নিয়ে খুব অভিযোগের কারণ নেই—এক ইংরেজি পড়ানো উচিত কি না, সেই প্রশ্ন ছাড়া। পুরানো যুগের পাঠশালাতে ছাত্রেরা (ছাত্রী খুব কমই থাকত) বাঙলা বানান শিখত, পড়তে শিখত, সরল পাটিগণিতও শিখত। অঙ্ক শেখার মধ্যে তারা গ্রাম-জীবনের প্রয়োজনীয় হিসাব করার পদ্ধতিও শিখে নিত—কড়াকিয়া, গণ্ডাকিয়া, কাঠাকিয়া থেকে আরম্ভ করে শুভঙ্কর ও সাধারণ যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ। একটা 'আনা-ওয়ারি' হিসাব প্রচলিত ছিল—এক টাকায় ষোলো আনা, এক মণে শুধু চল্লিশ সের নয়, ষোলো বার আড়াই সের, এক সেরে ষোলো ছটাক, এক গজে ষোলো গিরে। এখন তার স্থান নিয়েছে দশমিক, এবং একবার সেটা ছাত্রদের বুঝিয়ে দিতে পারলে সব হিসাবই সহজ হয়ে যায়। গত শতাব্দীতেই নিম্ন-প্রাথমিক এবং 'মাইনর' স্তরে পাটিগণিতের সঙ্গে জ্ঞানবর্ধক রচনা-পাঠ আরম্ভ হয়ে যায়—একই সঙ্গে ধারাপাত আর বিদ্যাসাগরের "বোধোদয়"।

এখনকার মাতৃভাষার পাঠ্যবই মোটামুটি সুপরিকল্পিত। পশ্চিমবঙ্গে রবীন্দ্রনাথের "সহজ পাঠ" প্রাথমিক স্তরে অবশ্য পাঠ্য হবে কিনা এটা নিয়ে বিতর্ক উঠেছিল, এখন একটা সমাধান হয়েছে—"সহজ পাঠ" এবং "কিশলয়" দুই-ই পাঠ্য। স্বাধীনতা-প্রাপ্তির পরে প্রাথমিক স্তরে সাধারণ পাঠক্রমের পাশাপাশি মহাত্মা-প্রবর্তিত বুনিয়াদি স্কুলের ব্যবস্থা হয়েছিল এবং প্রথম দিকটাতে মহা উৎসাহে কাজ শুরু হয়েছিল। বুনিয়াদি শিক্ষার মূলমন্ত্র কাজের মাধ্যমে শিক্ষাদান, এবং সে কাজ হবে ছাত্র-ছাত্রীর বাস্তবজীবনভিত্তিক। প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী (৬-১১) নিয়ে 'বেসিক' প্রাইমারি স্কুল হল, ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী নিয়ে হল উচ্চতর বেসিক স্কুল। এসব স্কুলে পড়ানোতে প্রশিক্ষণ দেবার জন্য জেলায় জেলায় হল 'বেসিক ট্রেনিং' আর সীনিয়র বেসিক ট্রেনিং' কলেজ। হাইস্কুলেও 'বেসিক' প্রথায় শিক্ষা-দানের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হল 'পোস্ট-গ্র্যাজুয়েট বেসিক ট্রেনিং কলেজে'। পশ্চিমবঙ্গে বাণীপুরে সুন্দর একটি প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠল। কয়েকজন আদর্শবাদী গান্ধীপন্থী শিক্ষাব্রতী ছিলেন যাঁরা তদ্‌গতচিত্তে বুনিয়াদি শিক্ষার প্রসারে এবং মান-উন্নয়নে ব্রতী হলেন।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত উৎসাহটা থাকল না। বুনিয়াদি শিক্ষার ভালোমন্দ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা চলতে পারে। একদল বলেছিলেন, চাষির ছেলেকে চাষি করে রাখাতেই কি শিক্ষার সার্থকতা? অন্যদিকে বুনিয়াদি শিক্ষার পক্ষেও অনেক যুক্তি দেওয়া যেত। এর অসাফল্যের প্রধান কারণ কর্মকর্তারা প্রায় কেউই

এই পদ্ধতিতে বিশ্বাস করতেন না। অথচ তাঁরা এগিয়ে এসেছিলেন, কারণ দ্বিতীয় পরিকল্পনাকালে বুনিয়াদি শিক্ষার জন্য প্রচুর টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। স্কুলের নামের সঙ্গে বুনিয়াদি কথাটা থাকলেই বাড়ি তৈরির অনুদান এবং অন্য অনেক সাহায্য সুনিশ্চিত ছিল। পশ্চিমবঙ্গের কাছাকাছি একটি রাজ্যে হাজার-হাজার সাধারণ প্রাইমারি স্কুলকে 'বুনিয়াদি' করে ফেলা হল, রাতারাতি, শুধু সাইন-বোর্ডটা বদলিয়ে দিয়ে। শিক্ষকেরাও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আদর্শবাদী ছিলেন না। স্কুলে-স্কুলে চরকা আর তাঁত চালিয়ে বিক্রয়ের অযোগ্য সুতো এবং গামছা-জাতীয় জিনিস তৈরি হয়ে জমে উঠল। এখন আর সাধারণ-বনাম-বুনিয়াদি বিতর্ক নেই। প্রধান কথা, বুনিয়াদি শিক্ষা ভালো, না মন্দ—সেটা ভালোভাবে পরীক্ষা করেই দেখা হল না।

কখন থেকে ইংরেজি ?

১৯৮১-তে পশ্চিমবঙ্গে ঝড় উঠেছিল প্রাথমিক স্তর থেকে ইংরেজি পড়ানো তুলে দেওয়া নিয়ে। অন্য কয়েকটি রাজ্যে ইংরেজি তুলে দেওয়া হয়েছিল আগেই, পশ্চিমবঙ্গ এবার সে পথে এল। বিতর্কটা অনেক সময় ভুল পথে চলে যেত। প্রাথমিক এবং উচ্চতর স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হওয়া উচিত মাতৃভাষা এ নিয়ে কোনো মতভেদ নেই। প্রশ্নটা ছিল—একটা দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজি পড়ানো কোন্ স্তরে আরম্ভ হবে। সরকার সিদ্ধান্ত নিলেন প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি একেবারেই পড়ানো হবে না, ষষ্ঠ শ্রেণীতে গিয়ে শুরু করা হবে। মাধ্যমের প্রশ্ন, আর একটা ভাষা শেখানোর প্রশ্ন সম্পূর্ণ আলাদা—স্কুলে সংস্কৃত শেখানো হবে এই সিদ্ধান্ত নিলে, কেউ বলেন না যে স্কুলের সব শিক্ষা সংস্কৃতের মাধ্যমে হোক। ইংরেজি নিয়ে বিতর্ক অপ্রীতিকর সংঘর্ষের স্তরে উঠেছিল। আসল কথাটা সরকার বুঝলেন না—ষষ্ঠ শ্রেণীতে ইংরেজি পড়ানো আরম্ভ করেও চার বছরে ভাষাটা শিখিয়ে দেওয়া যায়, কিন্তু তার জন্য প্রয়োজন সুপরিকল্পিত পাঠ্য বই, এবং তার চেয়েও বেশি প্রয়োজন উপযুক্ত শিক্ষক। পাঠ্য বই তৈরি হয়েছে, কিন্তু শিক্ষক তৈরি করা কঠিন কাজ। সবস্তুদ্ধ ফল হয়েছে যে, শহরাঞ্চলে ইংরেজি-মাধ্যমের স্কুলে ভরতির জন্য অসম্ভব ভিড়। ইংরেজির বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রবক্তারা-ও তাঁদের ছেলেমেয়েদের 'ইংলিশ-মীডিয়ম' স্কুলেই পাঠান।

ইংরেজি মাধ্যমের প্রাইমারি স্কুল অনেক ক্ষেত্রে সুপরিচালিত এবং সেখানে শিক্ষাদানের পদ্ধতিও ভালো। কিন্তু ভরতির প্রবল চাহিদার ফলে অসংখ্য পুরোপুরি ব্যবসায়িক ইংরেজি মাধ্যমের নারসারি বা কিনডারগার্টেন স্কুল গজিয়ে উঠেছে। তাতে এক-আধজন ইংরেজিভাষী শিক্ষিকা থাকেন, যিনি আসলে প্রায় অশিক্ষিত। তিনি ইংরেজির যে উচ্চারণ শেখান তা কোনো ইংরেজ বুঝবে না। অথচ, ছেলেমেয়েরা "হাসিখুশি" পড়ছে না, "আবোল তাবোল" পড়ছে না, কিন্তু ইংরেজি 'নার্সারি রাইম' গেয়ে যেতে পারছে—এই গর্বে বাবা-মা পরিপূর্ণ। শহরে ছুটো শ্রেণী তৈরি হয়ে যাচ্ছে—একটা অবহেলিত কিন্তু সংখ্যাবহুল, এবং আর একটা প্রায় পুরোপুরি কৃত্রিম। শ্রেণীবিরোধ নিয়ে যাঁরা বড়ো-বড়ো কথা বলেন, তাঁরাই শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই ছুটো শ্রেণী তৈরি করছেন। তদুপরি তাঁরা সাধারণ প্রাইমারি স্কুলে ইংরেজি পড়ানো একেবারে নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। কোনো স্কুল যদি বাড়তি বিষয় হিসাবে ইংরেজি পড়াতে চায়, তাহলে তার উপরে চাপ পড়ছে। ফল হচ্ছে, লুকিয়ে-লুকিয়ে পড়ানো এবং যাঁদের টাকা আছে তাঁদের ছেলেমেয়েদের জন্য ইংরেজির গৃহশিক্ষক নিয়োগ। ইংরেজির অবনয়ন অবশ্য সর্বস্তরেই হচ্ছে। আর কিছুদিন পরে আমাদের ছেলেমেয়েরা বিদেশে যেতে পারবে না, বিদেশী পত্রপত্রিকা পড়তে পারবে না, এবং এমন কি ভারতের অন্য রাজ্যেও কাজ পাবে না। প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি পড়ানো আবশ্যিক না করেও বিষয়টাকে ঐচ্ছিক করা যায়। কর্তারা সেটাও হতে দিচ্ছেন না, অথচ নিজেদের ছেলেমেয়েদের ইংরেজি স্কুলে পড়াচ্ছেন—রাজনৈতিক জোর খাটিয়ে ভরতি করাচ্ছেন।

যথার্থভাবে প্রশিক্ষিত শিক্ষক কোথায় ?

অন্য বিষয়ে পড়ানোর মান উন্নত হচ্ছে কি না বলা শক্ত। মানোন্নতির জন্য প্রয়োজন আনুষঙ্গিক অনেক কিছু এবং উপযুক্ত শিক্ষক। গত দু-তিন বছর ধরে "অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড" বলে একটা কথা শোনা যাচ্ছে। এরকম একটা মন্ত্রোচ্চারণ থেকেই বোঝা যায় যে অধিকাংশ প্রাথমিক স্কুলে লাইব্রেরি, গ্লোব, মানচিত্র, চার্ট ইত্যাদি তো দূরের কথা, একটা করে ব্ল্যাকবোর্ডও নেই। অথচ প্রাথমিক স্তরে—যেখানে ছাত্রদের চোখ এবং কান একসঙ্গে সজাগ করতে হয়, সেখানে ব্ল্যাকবোর্ড অপরিহার্য। ছাত্রের স্লেটে মাস্টারমশায় একটা অক্ষর লিখে দিলেন, তার উপরে পেনসিল বুলিয়ে-বুলিয়ে ছাত্র অক্ষরটা লিখতে শিখল—এর চেয়ে অনেক সুষ্ঠু প্রথা ব্ল্যাকবোর্ডে অক্ষরটা লিখে দিয়ে ছাত্রদের বলা যে তারা দেখে-দেখে লিখুক। এটা নিয়ে আলোচনা দীর্ঘ করার প্রয়োজন নেই। শুধু বলতে হয় যে এতদিন পরে জ্ঞান হচ্ছে যে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষণের প্রধান আনুষঙ্গিকই নেই। শিক্ষকের অভাব হবার কথা নয়—দেশে শিক্ষিত বেকার অগণ্য। কিন্তু তাদের নিরপেক্ষভাবে নিয়োগ করে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া একটা বিরাট কাজ। শিক্ষা-অধিকারের পক্ষে এ-কাজটা সম্পূর্ণ করা প্রায় অসম্ভব, এবং নিয়মিত স্কুল পরিদর্শনের ব্যবস্থা করাও অত্যন্ত কঠিন। অতর্কিত ভাবে কোনো স্কুলে গেলে দেখা যাবে, কোথাও হয়তো ছাত্র নেই, কোথাও ছাত্র আছে কিন্তু শিক্ষক নেই, আর অন্য কোথাও স্কুলটাই নেই। যেখানে আছে সেখানে স্কুল হয়ে দাঁড়াচ্ছে দলীয় রাজনীতির কেন্দ্র।

প্রাথমিক স্তরে যে লেখাপড়া শেখানো হয়, তার মূল্যায়নের সমস্যা উঠে গিয়েছে। বার্ষিক পরীক্ষা এখন আর নেই, কিন্তু তার বদলে সাপ্তাহিক বা মাসিক যে রিপোর্ট শিক্ষকের দেবার কথা, সেটাও যথাযথভাবে দেওয়া হয় না। পরীক্ষা যখন ছিল তখন তাতে অনাচার ছিল বহু, পরীক্ষা তুলে দেওয়াতে আর-এক ধরনের অনাচারের সৃষ্টি হয়েছে। প্রথম শ্রেণী থেকে ছাত্রছাত্রী অবাধ গতিতে পঞ্চম শ্রেণীতে চলে যায়—কী শেখে সেটা দেখে যাওয়ার দায়িত্ব কেউ গ্রহণ করেন না। শিক্ষাদানপদ্ধতিটা যদি বিজ্ঞানসম্মত হয় এবং শিক্ষক যদি ছাত্রের প্রয়োজন বুঝে পড়ান, তাহলে পরীক্ষায় কারো ফেল হওয়ার কথা না—বুদ্ধিহীন হয়ে আর ক-জন জন্মায় ? এবং সেক্ষেত্রে পরীক্ষা না নিলেও চলে। প্রায় কুড়ি বছর আগে পূর্ব জারমানি থেকে একদল শিক্ষক ভারতে এসেছিলেন। কলকাতায় তাঁদের সঙ্গে আলোচনা হল নানা স্তরে, এবং সবশেষে শিক্ষাদপ্তরে। পাঠক্রম নিয়ে কথা উঠল। দেখা গেল, অঙ্কের পাঠক্রম বেশ উঁচু। আমাদের একজন প্রশ্ন করলেন, যারা অঙ্কে কাঁচা, তাদের নিয়ে তোমরা কী কর ? উত্তর এল, কোনো বিষয়ে কেউ কাঁচা থাকতে পারে এটা আমরা বিশ্বাস করি না, সবটাই নির্ভর করে পড়ানোর উপরে। আমাদের দেশে "অঙ্কে কাঁচা"—এটা নিয়ে প্রবীণ শিক্ষিত ব্যক্তিকেও গর্ব করতে শোনা যায়। বলতে চান যে তাঁর সাহিত্য- ইতিহাস বা দর্শন-প্রীতি অঙ্ক না শেখাতে ব্যাহত হয় নি। তাঁদের মনে পড়ে না যে ইয়োরোপে বড়ো-বড়ো দার্শনিকেরাই অনেকে বড়ো-বড়ো গণিতজ্ঞও ছিলেন।

আসল কথা, আমরা এখনো প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধে মনস্থির করতে পারি নি, যথোপযুক্ত কর্মপন্থা নিতে পারি নি, মেয়েদের স্কুলে আনতে পারি নি, এমন শিক্ষা দিতে পারি নি যার থেকে দ্বিতীয় স্তরের স্কুলে না গিয়েও ছেলেমেয়েরা, তরুণ-তরুণীরা, প্রবীণ-

প্রবীণারা তাঁদের শিক্ষালাভের উৎসাহ বাঁচিয়ে রাখতে পারেন। নতুন অনেক বাণী শোনা যাচ্ছে। কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রকের নতুন নামকরণ হয়েছে "মানবসম্পদ বিকাশ মন্ত্রক"। শেকসপিয়র ভুল বলেছিলেন—নামে অনেকটাই আসে যায়। নাম বদল করা মাত্রই অগ্রগতির পথে চলতে আরম্ভ করেছি, এরকম একটা বিশ্বাস সঞ্চাত হয়েছে। নতুন নামকরণের আগেই এপ্রিল ১৯৮৬-তে শিক্ষামন্ত্রক একটি পুস্তিকা প্রকাশ করেন—তার নাম ছিল "চ্যালেনজ অভ এডুকেশন—এ পলিসি পারসকপেক্‌টিভ"। পুস্তিকাটি একটু 'পণ্ডিতী' হলেও মোটামুটি সুলিখিত এবং এতে খোলাখুলিভাবে শিক্ষার মূল সমস্যাগুলি আলোচিত হয়েছিল। রাজনীতির অনুপ্রবেশে শিক্ষাক্ষেত্রে যে দায়িত্বজ্ঞানহীনতা ও অনাচারের জন্ম হয়েছে তার কথাও স্পষ্টভাবে বলা হয়েছিল। অন্যদিকে কিছু কিছু ফাঁকা দার্শনিক বুলিও ছিল।

প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বলা হয়েছিল যে বর্তমান ব্যবস্থা শুধু স্কুলে আসা আর মুখস্থ করাতেই নিবদ্ধ। চার মাস পরে অগস্ট ১৯৮৬-তে নতুন নামের মানবসম্পদ বিকাশ মন্ত্রক প্রকাশ করলেন "ন্যাশনাল পলিসি অন এডুকেশন ১৯৮৬—প্রোগ্রাম অভ অ্যাকশন"। এই কার্যক্রমে ১৪ বছর পর্যন্ত বয়সের সব শিশুকে স্কুলে আনা এবং তাদের ধরে রাখার উপরে জোর দেওয়া হয়েছিল। স্কুলের উন্নতির জন্য বহু প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। আরো প্রস্তাব হল যে ৫০টি ছাত্র পাবার সম্ভাবনা থাকলেই নতুন স্কুল খোলা হবে, শিক্ষাকে 'আনন্দপূর্ণ', 'তৃপ্তিকর' করা হবে। বিনামূল্যে বইখাতার সঙ্গে পোশাকও দেওয়া হবে। সাধারণত এক মাইলের মধ্যে প্রত্যেক শিশু একটা স্কুল পাবে—এবং যদি বাসে যেতে হয় তাহলে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের 'পাস' পাবে। এখানেই 'অপারেশন ব্ল্যাকবোর্ড'-এর কথা ওঠে। বলা হয়, শুধু ব্ল্যাকবোর্ড নয়, অন্যান্য শিক্ষাসহায়ক জিনিসপত্রও দেওয়া হবে—যেমন, মানচিত্র, চার্ট, খেলার সরনজাম, গ্লোব, আতস কাঁচ, চুম্বক, বই-পত্রিকা, বাদ্যযন্ত্র ইত্যাদি। তালিকাটি দীর্ঘ। নিঃসন্দেহে সবই দরকার, কিন্তু কতদিনে ভারতের প্রায় পাঁচ লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সব কিছু দেওয়া সম্ভব হবে, সে প্রশ্ন তোলা হয় নি। এরজন্য টাকা খুব বেশি লাগবে না—প্রত্যেক স্কুলের জন্য ১০০০ টাকা দিলে সবসুদ্ধ লাগবে ৫০ কোটি টাকা, তিন বছরে ছড়িয়ে দিলে বছরে ১৭ কোটি টাকা। এর চেয়ে অনেক বেশি টাকা সরকারি ভ্রমণ, উৎসব ইত্যাদিতে ব্যয় হয়। সিদ্ধান্ত যদি অটল থাকে, প্রশাসনিক জটিলতার বাধা যদি দূর করা যায় এবং জিনিসপত্র সরবরাহের ক্ষেত্রে দুর্নীতির পথ বন্ধ করা যায়, তাহলে সরকারি পদক্ষেপকে সবাই স্বাগত জানাবেন।

বড়ো সমস্যা স্কুল-বাড়ি নিয়ে। প্রস্তাবটিতে বলা হয়েছে—গ্রামাঞ্চলে কর্মসংস্থান বাড়াবার যেসব প্রকল্প আছে, সেগুলির মাধ্যমে স্কুল-বাড়ি তৈরী এবং সংরক্ষণ করা যাবে। এখানে অবশ্য অন্যদিকও আছে—রাস্তা তৈরি, পুকুর কাটা, জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা করা প্রভৃতি আরো অনেক দিকে এসব প্রকল্পের কাজ হয়। তবু, যদি স্কুল-বাড়ির উপরে কিছুটা জোর পড়ে তাহলে বর্তমান অবস্থা থেকে অনেকটা উন্নতি হয়। খেলার মাঠের কথাও বলা হয়েছে। কয়েক কোটি টাকা খরচ করে কলকাতায় বিরাট ক্রীড়াঙ্গন তৈরি না করে সে টাকাটা যদি প্রাথমিক আর মাধ্যমিক স্কুলে খেলার ব্যবস্থার উন্নতির জন্য ব্যয় করা হত, তাহলে উপকার হত ব্যাপক। শিক্ষাকে কর্মমুখী করবার প্রস্তাব আছে, কিন্তু সেটা ৯ বছর বয়সের পরে। এখানেই নানা প্রশ্ন উঠবে—বিশেষত কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির। কর্মমুখী শিক্ষা আর কর্ম-সৃজনী উন্নয়ন পাশাপাশি না চললে দু দিক থেকেই ক্ষতি।

প্রস্তাবিত "নবোদয় বিদ্যালয়" স্থাপিত হবে জেলায় জেলায় মাধ্যমিক স্তরে। প্রত্যেক জেলায় একটি করে ভালো কলেজ গড়ে তোলার পক্ষে সবল

যুক্তি দেওয়া যায়, কিন্তু সমগ্র জেলাতে একটি নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপন করলে এর সুফল লাভ করবে অত্যন্ত সীমিতসংখ্যক ছাত্র। যাই হোক, এখানে মাধ্যমিক স্তরের কথা বলছি না। প্রাথমিক স্তরে নবোদয় বিদ্যালয় স্থাপনের কোনো পরিকল্পনা নেই। কিন্তু "নন-ফরম্যাল" বা আনুষ্ঠানিক প্রথাবহির্ভূত শিক্ষার কথা বলা হচ্ছে। যদি সার্থকভাবে এ-ব্যবস্থা করা যায় তাহলে ছুটো উপকার হয়—প্রাথমিক স্তরের পরে যেসব শিশু স্কুল ছেড়ে দেয়, তাদের আরো শিক্ষিত হবার পথ খোলা থাকে, আর বয়স্ক শিক্ষার ক্ষেত্রে এর সম্ভাবনা ব্যাপক।

নতুন জাতীয় শিক্ষানীতির এই কর্মসূচী সম্বন্ধে এখানে একটু বিশদ করে লেখা হল, সবটা সমস্যা একসঙ্গে দৃষ্টিগোচর রাখতে। বলা বাহুল্য, এখন যেটাকে "নতুন" নীতি বলা হচ্ছে, তার অনেকটাই আগেকার বহু কমিটি-কমিশনের রিপোর্টে বলা হয়েছিল। বিশেষত ১৯৬৫-র কোঠারি কমিশনের রিপোর্টে। তখন কোঠারি কমিশন যা বলেছিলেন এখন দুই দশক পরেও যদি মানব-সম্পদ-বিকাশ মন্ত্রক প্রায় তাই বলেন, তাহলে বুঝতে হয় যে আমরা এতদিন বহু মূল সমস্যা অবহেলা করেছি। প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপ্তি আর মান উন্নয়ন—দুটি উদ্দেশ্যই সফল না করলে আমরা একটা গভীর নৈতিক অপরাধে দোষী হব। কলেজি শিক্ষা সবাই পাবে কিনা—এটা নিয়ে মতদ্বৈধ থাকতে পারে। কিন্তু এটা অনস্বীকার্য যে-কোনো যোগ্য ছাত্র আর্থিক বা সামাজিক কারণে শিক্ষার উচ্চতম স্তরে যদি না যেতে পারে তাহলে আমাদের সব নীতি অসার্থক। প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শুধু এটুকু বললে চলে না। প্রাথমিক শিক্ষার স্থান দেশের লোকের মূল প্রয়োজন—অন্ন, বস্ত্র, পানীয় জল, বাসস্থান, চিকিৎসা-র সঙ্গে।

প্রাথমিক শিক্ষালাভ প্রত্যেক নবজাতকের জন্মগত অধিকার

ইনজিনীয়ারের চাহিদা কমলে ইনজিনীয়ারিং কলেজে ছাত্র ভরতি কমানো যেতে পারে, কিন্তু কোনো অবস্থায়-ই প্রাথমিক শিক্ষার প্রসার আর উন্নতিতে বাধা দেওয়া চলতে পারে না। উচ্চতর শিক্ষাতে যোগ্য ছাত্রের অধিকার আছে। প্রাথমিক শিক্ষার বেলাতে যোগ্যতা-অযোগ্যতার প্রশ্ন ওঠে না। খুব অল্প-সংখ্যক শিশু বাদ দিলে কেউ অযোগ্যতা নিয়ে জন্মায় না। প্রাথমিক শিক্ষা স্বাভাবিক যোগ্যতাকে বিকশিত করে এবং উন্নততর স্তরে নিয়ে যায়। এই স্তরে উপনীত হবার অধিকার সব নবজাতকের 'বার্থ-রাইট', জন্মগত অধিকার। এই অধিকার থেকে কাউকে বঞ্চিত রাখা অমার্জনীয় সামাজিক অপরাধ। যতদিন আমরা সব ছেলেমেয়েকে অন্তত ১৪ বছর পর্যন্ত স্কুলে রাখতে না পারছি, ততদিন অন্য সব অগ্রগতি অসার্থক। যদি প্রত্যেক ভারতীয়কে আমরা অন্ন, বস্ত্র, জল, বাসস্থান, চিকিৎসা ও প্রাথমিক শিক্ষা না দিতে পারি, তাহলে আমাদের অন্য সবদিকে অগ্রগতিও ব্যাহত হবে। অভুক্ত, নিরাবরণ, তৃষ্ণার্ত, গৃহহীন, স্বাস্থ্যহীন, শিক্ষাহীন মানুষকে দিয়ে কৃষি, শিল্প কোনো কিছুরই উন্নতি হবে না। মানবসম্পদবিকাশ যথোপযুক্ত স্তরে না পৌঁছলে দীর্ঘকালীন পরিপ্রেক্ষিতে কোনো বিকাশই সম্ভব নয়। শিক্ষার অধিকার একটা মৌলনীতির প্রশ্ন এবং একটা সার্বিক উন্নয়ন নীতিরও প্রশ্ন। একটা স্তরে এসে ছুটো প্রশ্নই এক।

বরং

রত্নেশ্বর হাজরা

বরং তৃষ্ণার মুখে ফেলে দেব ছায়া
ফেলে দেব ছোট্ট মরূদ্যানও
বিনিময়ে চাইব মরীচিকা—
বরং শঙ্খের মতো পদ্মের কুঁড়িটি তুলে
তাকে দেব যে কখনো পঙ্কজ দেখে নি।
গন্ধরাজ পচে গেছে যে-কোনো সকালে—তার দেহে
জন্মেছে বীজাণু
বরং তাকেও অঙ্গে মেখে নেব ডুব দিয়ে উঠে
ইচ্ছে হলে।
সন্ন্যাসীর কাছে কিচ্ছু নেই—তবু
তারই কাছে ভিক্ষে চাইব ব্রহ্মাণ্ডের চাবি।
যাব—ডুবে যাব—
শাদা হাঙরের মুখে পড়েছে ঝিনুক—তার
মুক্তোটি বাঁচিয়ে রাখতে উষ্ণ উপকূলে
ডুবে যাব—
বরং মাড়িয়ে দেব গোক্ষুরের লেজ—তারপর
মুকুটের পরিবর্তে তার সব অন্ধরাগ
জড়াব মাথায়
বরং ভাতের গন্ধে বিষ দেবে—যে বলেছে
তাকেও বাঁচিয়ে রাখতে শিরা কেটে রক্ত দিয়ে দেব।
কিন্তু তুমি ভণ্ড—তাই তোমার খুশির জন্য একটুও হাসব না
সম্রাট হলেও—
বরং যমের ঠোঁট নিঃশর্তে ছোঁয়াতে দেব
নিজের কপালে—

চিরস্থায়ী নয়

শীতল চৌধুরী

কিছুই চিরস্থায়ী নয়;
মানুষ
গাছ
পাখি
সবই বদলায়—বদলাতে থাকে
সুপ্তবীজ, প্রজন্ম, দ্রাক্ষাবনের মৌমাছির ডানা।

বদলে যেতে থাকে ডাকঘরের চিঠির অক্ষর
শেফালিকা বোসেদের হাসি
এবং বনলতা সেনের পাখির নীড়ের মতো চোখ!

শতাব্দী কখনো ঘুমোয়, কখনো জাগে
সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ে!

কেবল বদলায়—বদলাতে থাকে
সোনার মাছি, হলুদ প্রজাপতি, সবুজ ঘাস
প্রকৃতির বন্য হরিণেরা॥

চিতা

সুজন হাজারী

রাক্ষুসী আগুনের উত্তাপে ধাতব লোহা গলে
তবুও কঠিন লোহা জ্বলে না বিদ্রোহে জ্বালায় না
কাউকেও, বিক্ষোভের বিনাশী চিতায় রাবণী
চিতার হিংস্র চাতালে মরা লাশ সাজিয়ে
মানুষকে মানুষই পোড়ায়, এ কি? ভয়াবহ
শোকাহত যন্ত্রণায় উশকে দেয় চিতার আগুন
কেউবা দেয় উলুধ্বনি, বিমর্ষ বিষাদে তখনো
বেজে ওঠে সমবেত বেদনার শঙ্খধ্বনি করুণ
বিলাপে—জ্বলে উঠি আমি সামান্য উত্তাপেই
মলিন উষ্ণতায় গলে যাই—সমবেদনায়
বান ডাকে কোমল হৃদয়ে, উথলে ওঠে জোয়ার,
অকাল জোয়ারের স্রোতে ভেসে যাই বিরহের
হা-কৃষ্ণ বিষাদসাগরে, নীল জলের দখলে
হাবুডুবু খাই, তথাচ কাটি নে সাঁতার প্রেমিকের মতো
রমণীর রূপের গঙ্গায়, শুধু অলেপুড়ে মরি বিশুদ্ধ
ভালোবাসার চিতায়িতে—নিঃশেষে নিজেকে পোড়াই অনিমেষ।

বাংলাদেশ

জল কাটি

জয়নাল আবেদীন

জলের ভাঁজ কেটে পৌঁছুতে হবেই
যেখানে আমার মা
গাছের তলায় বিছিয়ে গেছে ভোর।
কিন্তু, কী করে পৌঁছুব আমি?
জলের তো পথ নেই—জল কাটি, জল এসে ভার যায়
এখানে ভোর নেই, দিন মানে নিশ্চল প্রকৃতি
ঘাম নেই, অরে কেঁপে যাচ্ছে শরীর
কোথায় পা রাখব মাটি
তাহলে কি ভুল ঠিকানায় চলে এসেছি?

প্রবন্ধ : সংজ্ঞা এবং স্বরূপ

সুনীলকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা

কাব্য, নাটক, উপন্যাস, এমনকি ছোটোগল্পও সাহিত্যে এক-একটি স্বীকৃত শাখা। কিন্তু ভাবে, ভাষায় বিষয়ের বৈচিত্র্যে, শিল্পসৃষ্টির উৎকর্ষে পৃথিবীর নানা দেশের প্রবন্ধশাখাটি সুপরিণত হয়ে উঠলেও তার সামাজিক কৌলীন্যলাভ অদ্যত আমাদের দেশে আজো ঠিক হল না। সাহিত্যের আসরে তার স্থান এখনো প্রান্তিক সীমানায়। অন্যান্য যে-কোনো শ্রেণীর রচনার তুলনায় এখানে প্রবন্ধের লেখক অল্প, পাঠক অল্পতর, এবং বিষয়টির ওপর প্রামাণ্য গ্রন্থ তো নেই-ই, ছোটো আকারের মৌলিক আলোচনা পর্যন্ত অল্পতম।

এবং শুধু আমাদের দেশে রয়, পশ্চিমের উন্নত প্রায় প্রতিটি দেশেই প্রবন্ধশাখাটির এই-ই সাধারণ অবস্থা। বিষয়টির সংজ্ঞা এবং স্বরূপ সম্বন্ধে কোনো মননশীল আলোচনা বা প্রবন্ধের বিচার-বিশ্লেষণ-ভিত্তিক কোনো পূর্ণাবয়ব প্রবন্ধ পৃথিবীর অন্যতম ঋদ্ধিময় যে ইংরাজি সাহিত্য, সেখানে পর্যন্ত এখনো নেই, বাঙলা সাহিত্যে তো প্রত্যাশিতই নয়।

এই পরিস্থিতিতে বাঙলা প্রবন্ধসাহিত্যের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে প্রথম থেকেই আমাদের নানা সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং প্রায়-আলোচিত সেইসব বিষয়ের সমাধান আমাদেরই করে নিতে হয়েছে।

১

"প্রবন্ধ" শব্দটির উদ্ভব "বন্ধ্" ধাতু থেকে। "বন্ধ্" ধাতুর অর্থ 'বন্ধন করা' এবং প্রবন্ধ শব্দের অর্থ,—প্রকৃষ্ট বন্ধনযুক্ত বা পরস্পর-অন্বয়যুক্ত বাক্যাবলী। সুতরাং ব্যুৎপত্তিগত অর্থে প্রবন্ধের মধ্যে একটা নৈয়ায়িক বন্ধনের, তার বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে একটা যুক্তিবদ্ধ ভাবসমন্বয়ের সংবেদ আছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে কাব্য, নাটক, দর্শন ইত্যাদি যে-কোনো শ্রেণীর রচনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মধ্যে যখনই একটা প্রকৃষ্ট বন্ধনের ভাব ফুটে উঠেছে, তখনই সেটি "কাব্যপ্রবন্ধ", "নাটকপ্রবন্ধ" ইত্যাদি নামে অভিহিত হয়েছে। "কাব্য-মীমাংসা"র লেখক রাজশেখর এই বৈশিষ্ট্যকে বলেছেন 'অনুস্যূর্যিতার্থ সম্বন্ধ', এবং এই মৌল লক্ষণাক্রান্ত যে-কোনো শ্রেণীর রচনাই সংস্কৃত আলংকারিকদের কাছে "প্রবন্ধ" বলে গণ্য। এই নিরিখে রামায়ণ, মহাভারত যেমন প্রবন্ধ, তেমনি অভিজ্ঞানশকুন্তলম্, মালতীমাধবও প্রবন্ধ।

প্রবন্ধের অঙ্গরূপের এই সুষ্ঠু বন্ধনে আবদ্ধ বৈশিষ্ট্যের কথা "পোয়েটিকস"-রচয়িতা আরিস্ততলের নাটকের কাহিনীর সুসংহত রূপ (unity of action)-এর কথা স্মরণ করায়।

সংস্কৃত সাহিত্যে প্রবন্ধের এই নৈয়ায়িক বন্ধনের ব্যঞ্জনা পরবর্তী কালে কিন্তু অনেকটা শিথিলভাবে নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। কৃত্তিবাসের "রামায়ণে" আছে, 'যতেক প্রবন্ধ করে নিশাচরগণে।' এখানে প্রবন্ধ শব্দটির "কৌশল" অর্থে এই প্রয়োগ "কাব্য-প্রবন্ধ", "নাটকপ্রবন্ধ" প্রভৃতি শব্দগুলির মতো বর্তমানে অপ্রচলিত।

মধ্যযুগের পর আধুনিক কাল। জ্ঞানবিজ্ঞানের দ্রুত প্রসারের ফলে কোনো দেশ আজ নিজের ভৌগোলিক সীমানায় আবদ্ধ নয়, বিভিন্ন প্রান্তের চিন্তাভাবনায় প্রায় প্রতিটি দেশ পরস্পরের দ্বারা প্রভাবিত। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে সমৃদ্ধতর ইংরাজি সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে বাঙলা সাহিত্যের প্রতিটি শাখা আজ আঙ্গিকে, অঙ্গরূপে, ধ্যান-ধারণায় প্রায় পরিণতরূপ লাভ করেছে। প্রাচীন এবং মধ্য যুগের অলংকারশাস্ত্রাদির অনুশাসন থেকে মুক্ত হয়ে বাঙলা কাব্য, নাটক, উপন্যাসের মতো প্রবন্ধশাখাও আধুনিক যুগে ইংরাজি ধারার অনুবর্তী।

তবে উনিশ শতকে আধুনিক ভারতীয় সাহিত্যের উন্মেষের সময় মধুসূদন আর বঙ্কিমচন্দ্রের একক প্রচেষ্টায় বাঙলা কাব্য ও উপন্যাসের যেমন নবজন্ম হয়েছিল, প্রবন্ধের ক্ষেত্রে কিন্তু একটু ভিন্নতর পরিস্থিতি দেখা যায়। নতুন যুগে মনের ভাবপ্রকাশের উপযোগী বাঙলা গদ্যের বিকাশ অনেকখানি হলেও নতুন আঙ্গিকের প্রবন্ধ তখনো দূর অস্ত। সংস্কৃত ঐতিহ্যে লালিত বাঙালি মানসে রামমোহন থেকে বিদ্যাসাগর-অক্ষয় দত্তের সময় পর্যন্ত "বন্ধ্" ধাতুর সেই দৃঢ়বন্ধ বা সংহত রূপের অবয়ব, আঙ্গিক সবই সংস্কৃত শাস্ত্রের ভাষ্যকারদের পদ্ধতি সগৌরবে বিরাজমান। কালের পরিবর্তন হলেও "প্রবন্ধ" শব্দের আধুনিক অর্থে প্রয়োগ বা ব্যবহার এই সময় পর্যন্ত প্রায় অজ্ঞাত রয়ে গেছে। প্রবন্ধের বিকল্প হিসাবে "সম্বাদ", "প্রস্তাব", "নিবন্ধ" প্রভৃতি যে শব্দগুলি কায়েম হয়ে ছিল, তাদের মধ্যে "বন্ধ্" ধাতুর স্পষ্ট আভাস পাওয়া যায়।

আমাদের সাহিত্যের অন্যান্য শাখার মতো বাঙলা প্রবন্ধের আদিযুগের পাণ্ডুর, মৃতকল্প অঙ্গরূপ ইংরেজি "এসে"-র সোনার কাঠির স্পর্শে ক্রমশ প্রাণপূর্ণ, বৈচিত্র্যময় হয়ে উঠেছে। "এসে" কথাটির উদ্ভব প্রাচীন ফরাসি শব্দ essai থেকে, যার অর্থ চেষ্টা বা attempt, এবং যার মধ্যে একটা ভাবের অসম্পূর্ণতার দ্যোতনা আছে; যুক্তিতর্কের মাধ্যমে কোনো বিষয়ের সমাধান বা পরিণতির ইশারা "এসে" শব্দটির জন্ম-পত্রিকায় পাওয়া যায় না।

কিন্তু দুঃখের বিষয়, এখন প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য জগতের সর্বত্র প্রবন্ধের ব্যাপক প্রসার হলেও এর রূপকল্প সম্বন্ধে বিশদ তথ্যের আজো বড়ো অভাব। এডগার অ্যালেন পো থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত ছোটো-গল্পের খ্যাতনামা শিল্পীরা তার সংজ্ঞা এবং স্বরূপ সম্বন্ধে অনেক তথ্য রেখে গেছেন। কিন্তু শত অবজ্ঞার পাহাড় ঠেলে প্রবন্ধশাখাটি যখন সাহিত্যের আসরে বর্তমানে সুপ্রতিষ্ঠিত, তখনো কিন্তু সর্বত্র এর শিল্প-রূপের বিশেষ আলোচনার অভাব বেদনাদায়ক।

আমরা ভূমিকাতেই উল্লেখ করেছি, ইংরেজি

সাহিত্যেও প্রবন্ধের ওপর প্রামাণ্য, পূর্ণাঙ্গ কোনো প্রবন্ধ নেই। যা আছে, তা কয়েকটি পরিচিতি অভিধানে সামান্য সূত্রমাত্র। যেমন এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার মতে, প্রবন্ধ হচ্ছে একটি বিষয়ের ওপর সহজে, অনায়াসে, কম আয়তনের মধ্যে লিখিত কোনো রচনা। জোসেফ সীপলে তাঁর বিশ্বসাহিত্যের অভিধানে বলেছেন, সাধারণত মাঝামাঝি আকারের এবং নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর একটি রচনার নাম প্রবন্ধ। আবার ক্যাসেল এনসাইক্লোপীডিয়ায় মন্তব্য করেছেন, প্রবন্ধের গঠনাকৃতিতে অসংলগ্নতা এবং অসম্পূর্ণতার ছাপ সুস্পষ্ট।[১]

এইসব সংক্ষিপ্ত মন্তব্য থেকে জানা যায় যে আধুনিক প্রবন্ধ বা "এসে"র আয়তনের স্বল্পতা এবং তার ভাব প্রকাশের অপূর্ণতা সম্বন্ধে সকলেই একমত। কিন্তু স্বল্পায়তনের সব গদ্যরচনাই কি প্রবন্ধ? অথবা, অপেক্ষাকৃত দীর্ঘআকারের তত্ত্ব, তথ্য, বা গবেষণামূলক রচনা, ইংরেজিতে যার নাম ট্রীটিজ, ডিসকোরস্ বা ডিস্যারটেশন,—এসব কি সবই প্রবন্ধ? প্রবন্ধের আকৃতি- ও প্রকৃতি -গত বিস্তারিত সেসব আলোচনা কোথায়?

বিশেষজ্ঞদের নির্দেশ বা মতামতের যেখানে এত অভাব, সেই পরিস্থিতিতে হিউ ওয়াকার তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ "দি ইংলিশ এসেজ অ্যানড এসেইস্টস্" (The English Essays and Essayists)-এ, টমাস ব্রাউন (Sir Thomas Browne 1605-82)-এর রচনাগুলির শ্রেণী ঠিক করতে গিয়ে প্রচলিত রীতির ওপর নির্ভর করে মন্তব্য করেছেন, তাঁর কিছু পুস্তিকার আয়তন অপেক্ষাকৃত দীর্ঘ হলেও একটি বাদে আর কোনোটিই প্রবন্ধের স্বীকৃত প্রচলিত সীমা অতিক্রম করে নি। ব্যক্তি-মানসে, শিল্প-রূপায়ণে ব্রাউন আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত প্রবন্ধকারই।[২]

প্রবন্ধের প্রকৃতি এবং আয়তনের কথা ছাড়া তার আকৃতিগত কিছু-কিছু প্রশ্নও আছে। যেমন নাটকের আকৃতিতে পরিবেশিত বঙ্কিমচন্দ্রের "ব্যাঙ্গাচার্য-বৃহন্নাঙ্গুলে"র মতো রচনা কি প্রবন্ধ? অস্মিতধর্মী রচনার প্রবক্তা বেনসন (A. C. Benson—The Art of the Essayist) তো এমন নাটকের আকারে পরিবেশিত রচনাকে প্রবন্ধের বৃত্তের মধ্যে স্থান দিতে যথেষ্ট কুণ্ঠিত! কিন্তু আমরা মনে করি, প্রবন্ধের বিচারের মানদণ্ড ঠিক আকৃতিতে ততটা নয়, যতটা প্রকৃতিতে, বক্তার উদ্দেশ্য আর তাঁর শিল্পবস্তুর নিজস্ব সাফল্যে। এবং সেই নিরিখে "ব্যাঙ্গাচার্যে"র মতো নিবন্ধ প্রবন্ধই; টমাস ব্রাউন সম্বন্ধে হিউ ওয়াকারের উক্তি স্মরণ করে আমরাও বলব, এইজাতীয় সাহিত্য সৃষ্টির সময় বঙ্কিমচন্দ্র ব্যক্তিমানসে, শিল্প-রূপায়ণে প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রবন্ধকারই ছিলেন। বিজ্ঞানধর্মী, সংস্কারমুক্ত আধুনিক সমালোচকও বলবেন, "ব্যাঙ্গাচার্যে"র মতো রচনাকে প্রবন্ধ হিসাবে গ্রহণ করাই আমাদের প্রচলিত রীতি বা custom।

২

প্রাচ্যের "প্রবন্ধ" শব্দের আদিম অভিধা বন্ধনযুক্ত, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং পাশ্চাত্য "এসে" শব্দের আদিম অভিধা খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত। এই দুই বিভিন্ন দেশের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে ফারাক আসমান-জমিন। ব্যবধানটা সম্ভবত প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য জীবনজিজ্ঞাসার ইঙ্গিতবহ। একদিকে আমরা দেখি, একটি বিষয়ের গভীরে অনুপ্রবেশ, তার সামগ্রিক রূপকল্পের বিন্যাস, সে বিন্যাসকে একটা নৈয়ায়িক সূত্রে বন্ধনের প্রচেষ্টা; অপরদিকে সাময়িক-আবেগ-চালিত হয়ে কোনো ভাবকল্পনাকে শিল্পরূপ দেওয়া, সেই ক্ষণিক প্রেরণার অবসানে শিল্পকর্মটির ওপর যবনিকা টানা: এই দুটি পদ্ধতির মধ্যে তফাত প্রাচ্য এবং প্রতীচ্য মানবপ্রকৃতির, বিভিন্ন ভৌগোলিক সীমানার ব্যক্তিমানসের।

কিন্তু প্রাচ্য এবং প্রতীচ্যের প্রবন্ধও "এসে" শব্দ দুটির এইসব তথ্য এবং পার্থক্য এখন বিগতকালের বস্তু। পৃথিবীর দুটি প্রত্যন্ত দেশের সমপর্যায়ের শব্দ

দুটির কুলজিতত্ত্বের এই ইতিহাস আধুনিক বিজ্ঞান-সভ্যতার যুগে শুধু ইতিহাসমাত্র। পরিবর্তনের স্রোতে ভাসতে-ভাসতে নানা দেশ এবং বিভিন্ন কালের সম্পদ আত্তীকৃত করতে-করতে বোধহয় উভয়েই একই বন্দরে উপনীত। ইতিহাসের নিয়মে উভয় শব্দেরই সংজ্ঞা এবং স্বরূপের বৃত্ত এমনি সম্প্রসারিত এবং পরিবর্তিত হয়েছে, স্বাদে-গন্ধে, আকৃতি-প্রকৃতিতে একদা উভয়ের যতই পার্থক্য থাক, সাহিত্যের সওদাগর এদের মধ্যে আজ আর বোধহয় বিশেষ ভেদাভেদ দেখতে পাবেন না। এসে-র মধ্যে যেমন এসেছে প্রবন্ধের ধাতুগত অভিধার বন্ধনযুক্ত, বিষয়-আশ্রয়ী রচনার উপাদান, অন্যদিকে তেমনি প্রবন্ধের মধ্যে দেখা দিয়েছে এসে-র আসল বৈশিষ্ট্য—মুক্তপক্ষ বিহঙ্গের স্বচ্ছন্দ বিহার।

শব্দ দুটির এইসব পার্থক্য এবং পরিবর্তন সত্ত্বেও কিন্তু পূর্ব আর পশ্চিমের প্রত্যেক দেশেই প্রবন্ধ-শাখাটির জন্মের আদিযুগে যুক্তিতর্কের বন্ধনযুক্ত অঙ্গ-রূপেই প্রথম আবির্ভাব ঘটে। প্রাথমিক এই পদ্ধতিটির পরিবর্তন সাহিত্যে সমৃদ্ধতর ইউরোপেই প্রথম দেখা দেয় ষোলো শতকে ফরাসি লেখক মনটেইনের সময়ে, তার আগে নয়। আর আধুনিক বাঙলা কাব্য, নাটক আর উপন্যাসের মতো এখানের প্রবন্ধশাখাও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে তারও অনেক পরে, পরিণত ইউরোপীয় সাহিত্যের সংস্পর্শে এবং প্রভাবে।

একটি পরিমিত আকারের শিল্পসম্মত গদ্যরচনাকেই আজ পূর্ব-পশ্চিম সর্বত্রই প্রবন্ধের সংজ্ঞা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বিশেষ সমালোচকের বিশেষ মতামত থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের এই তথ্যই সাধারণভাবে গৃহীত এবং আমরাও প্রচলিত রীতি অনুসারে উভয় শ্রেণীর প্রবন্ধকেই সমান আন্তরিকতায় গ্রহণ করব।

আজিকে, অঙ্গরূপে (ফর্ম্), এবং রূপকল্পে (ইমেজ) স্বাভাবিকভাবেই বর্তমান কালের প্রবন্ধ বৈচিত্র্যময়; তার কোথাও বা তথ্য আর তত্ত্বের উদ্ভাস, আবার কোথাও বা পল্লবগ্রাহী একটি ব্যক্তিমানসের স্বগতোক্তির ভাবনির্ঝর। এই বৈচিত্র্যের মধ্যেও কিন্তু শাখাটিতে দুটি মৌল ধারা লক্ষণীয়। একশ্রেণীর প্রবন্ধে মস্তিষ্কজাত নানা চিন্তার সমাবেশ, নৈয়ায়িক বন্ধনের প্রবণতা; অন্য শ্রেণীতে শিল্পীর মনের মাধুরী, তাঁর সৃষ্টিশীল কল্পনার লাবণ্যে রচনাটি উদ্ভাসিত। কোনোটির গতি স্বচ্ছন্দ, প্রাণস্ফূর্ত, কোনোটি হয়তো বা চিন্তার গুরুভারে হতশ্বাস, স্তিমিতপ্রাণ। ভিন্নমুখী এই দুটি ধারার নানা ভাব, নানা ভঙ্গি, কিন্তু লঘুগুরু যেভাবেই হোক, সকলেরই গন্তব্য সেই সাহিত্যের মহাসঙ্গম। উদ্দেশ্য এক হলেও কিন্তু সে লক্ষ্যে সবাই কি আর পৌঁছতে পারেন! আরো অনেক শিল্পের মতো প্রবন্ধশিল্পে সফলতা প্রতিভানির্ভর, লেখকের ক্ষমতা-অনুগত।

ওই একই গ্রন্থে সীপলে এইভাবেই প্রবন্ধকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করে বলেছেন, একটি বুদ্ধি-প্রভাবিত, কোনো নির্দিষ্ট বিষয়ে বিধিবদ্ধভাবে যুক্তিতথ্যসমন্বিত নিবন্ধ; অপরটি কল্পনাচালিত, অনির্দিষ্ট বিষয়ে লেখকের খেয়ালখুশিমতো আত্মকথনমূলক রচনা। প্রথম পর্যায়ে পড়ে জীবনী, ইতিহাস, সমালোচনা-বিষয়ক যে-কোনো বুদ্ধি-অনুগত রচনা। অপর পর্যায়ে পড়ে লঘু মেজাজের, লঘু আঙ্গিকের রেখাচিত্র গোত্রের লেখকের ব্যক্তিত্ব-আশ্রিত যে-কোনো রচনা।

অর্থাৎ, একটির প্রকৃতি 'বিষয়-গৌরবের', অপরটির 'বিষয়ী-গৌরবের'। রবীন্দ্রনাথের কবিদৃষ্টি-নির্ধারিত এবং বিশেষ পরিচিত প্রবন্ধের এই ব্যঞ্জনাময় সাধারণ বিভাজন আমরা এই প্রসঙ্গে বারবার স্মরণ করব।

প্রখ্যাত সম্পাদক কাম্বারলেজ (Cumberledge —Several Essays) সমগ্র প্রবন্ধসাহিত্যকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন,—চিন্তাভিত্তিক, সমালোচনা-ধর্মী, বর্ণনামূলক, এবং ভ্রমণকাহিনী (Reflective, Essays in Criticism, Descriptive, Essays on Travel)। আসলে এই চারপ্রকারের রচনাই কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিষয়- ও বিষয়ী-আশ্রিত, এই দুই প্রধান ধারার রকমফের।

সময়ের ছন্দে ছন্দ মিলিয়ে আজ সমানভাবে সাবলীল গতিতে চলেছে এই দুটি ধারা আর তাদের অনুগত নানা উপধারা। আমাদের সংজ্ঞা অনুযায়ী রচিত পরিমিত আকারের শিল্পসম্মত উভয় পর্যায়ের যে-কোনো প্রকৃতির রচনাকে আমরা স্বীকৃতি দেব, কারণ রূপকল্প এবং সফলতার পার্থক্য থাকলেও এরা সকলেই প্রবন্ধের সমাজে সমগোত্রীয়। সংস্কারমুক্ত মনে আমাদের আলোচনায় স্বাগত জানাব চিন্তা-সমালোচনায় ঋদ্ধ পরিচিত ধারায় প্রবন্ধের সঙ্গে আধুনিক কালের বর্ণনা- বা ভ্রমণ-মূলক রচনাকেও—বিভূতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক'র অনেক খণ্ডচিত্র, প্রবোধ সান্যালের 'দেবতাত্মা হিমালয়ে'র অনেক রেখাচিত্র প্রভৃতি। সবদেশের অনেক আধুনিক প্রবন্ধ কারের অনেক ক্ষেত্রেই এখন অনায়াসসিদ্ধি।

৩

চিত্র, ভাস্কর্য, কাব্য, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদির মতো প্রবন্ধেরও একটি রূপকল্প (ইমেজ) আছে। শিল্পী তাঁর অনুভূতিকে যে রূপকল্পে চিন্তা করেন, স্থানকালের খণ্ডিত সীমানায় তিনি তাকে একটি বিশিষ্ট অঙ্গরূপে (ফরম্) মূর্ত করে তোলেন। সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেই অনুভূতিকে বাণীবদ্ধ করে অঙ্গরূপ দেওয়া হয়। এই অঙ্গরূপের ব্যঞ্জনা ব্যাপক, তার সংবেদ অনেকটা দার্শনিক তত্ত্বের মতো গভীর ; অঙ্গরূপ কোনো বস্তুর শুধু বাইরের কাঠামো বা অবয়ব নয়, অঙ্গরূপ শিল্পীর সমগ্র জীবনদর্শনের প্রতিভাস। রচনাশৈলী যেমন লেখকের বিশেষ বাচনভঙ্গি প্রকাশ করে, অঙ্গরূপের মধ্যে তেমনি শিল্পীর একটি বিশেষ ভাব বা চিন্তা প্রকাশের ইঙ্গিত আছে। স্রষ্টার পরিকল্পনা, তাঁর চিন্তাভাবনা, তাঁর সারস্বত সাধনা অঙ্গরূপের মধ্যেই মূর্ত হয়ে ওঠে।

অঙ্গরূপ শব্দটির দ্যোতনা এত গভীর বলেই গ্রীক দার্শনিক আরিস্তোতল তাঁর "মেটাফিজিক্স" গ্রন্থে এর আলোচনা করেছেন। সীপলে বোধহয় আরিস্তোতলের সূত্র ধরেই অঙ্গরূপের ব্যাখ্যা দিয়ে বলেছেন, কোনো শিল্পবস্তুর অঙ্গরূপ শুধু তার বাইরের কাঠামোমাত্র নয়, যা তার বৈশিষ্ট্য গঠন করে, তাও অঙ্গরূপের অংশ। একটি শিল্পবস্তুর বিশেষ অর্থ বা দ্যোতনা, সেই দ্যোতনার প্রকাশ বা রূপকল্প এবং গঠনাকৃতি,—সবই অঙ্গরূপের এক-একটি অংশ। অর্থাৎ যেসব উপাদানের সমন্বয়ে রূপকল্পটি গঠিত হয়, সবই অঙ্গরূপের অন্তর্গত।[৩]

উপন্যাসের তুলনায় প্রবন্ধ অনেক স্বল্পায়তনের হলেও প্রবন্ধের অঙ্গরূপের মধ্যে অনেক সূক্ষ্মরেখার নকশা,—সৌন্দর্য, প্রতিসাম্য, সামঞ্জস্য প্রভৃতি অনেক কারুকার্যের সমাবেশ। "আমার মন" বা রামেন্দ্রসুন্দরের "মহাকাব্যের লক্ষণ"—বিরুদ্ধধর্মের এই দুটি প্রবন্ধ একটু বিশ্লেষণ করলেই আমাদের উক্তির অর্থ সহজেই উপলব্ধি করা যাবে।

এই গভীর, ব্যাপক, ব্যঞ্জনাময় অঙ্গরূপটি গড়ে ওঠার আগে প্রবন্ধকারের মনের মধ্যে যেভাবে এটির প্রথম উদয় হয়, তাকে বলা হয় কাঠামো বা অবয়ব (স্ট্রাকচার)। শিল্পীর আত্মপ্রকাশের একটি খসড়া গঠনাকৃতি এই কাঠামো বা অবয়ব। এর মধ্যে কোনো ব্যাপক মর্মার্থ নেই, এমনকি রূপকল্প বা ইমেজ গঠনের কোনো প্রচেষ্টাও এর মধ্যে হয়তো পাওয়া যাবে না। কাঠামোকে যখন বিশেষভাবে সাজিয়ে, অর্থাৎ কায়াকে কান্তিময় করে তার মধ্যে প্রাণের প্রতিষ্ঠা করা হয়, তখনই অঙ্গরূপের জন্মলাভ। অঙ্গরূপের গঠনাকৃতি সুচিহ্নিত, সুপরিচ্ছন্ন। ক্রান্তদর্শী প্রবন্ধ-শিল্পী এই অঙ্গরূপের মাধ্যমেই তাঁর জীবনদর্শন লিপিবদ্ধ করেন।

খসড়া গঠনাকৃতি থেকে ক্রমশ অঙ্গরূপে উত্তরণ, প্রবন্ধকারের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পরূপে পরিণতি লাভ,—যে-কোনো শাখার শিল্পকর্মের উদ্ভবের এই ইতিহাস। যে কৌশলে অঙ্গরূপ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, তার নাম শিল্পরীতি বা ক্রাফট। ইংরাজি এই ক্রাফট শব্দটির

ব্যুৎপত্তিগত অর্থ—শক্তি বা দক্ষতা। লেখকের শিল্প-কর্মের মূল্য তাঁর শিল্পরীতির দক্ষতার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। উচ্চমানের শিল্পরীতির প্রসাদে সামান্য অসামান্য হয়, সৃষ্টি হয় এক-একটি নিটোল প্রবন্ধ, প্রতিটি চিরন্তন আনন্দের প্রস্রবণ। "কাব্যের উপেক্ষিতা"র রবীন্দ্রনাথ এমনি এক অনন্যকুশলী সাহিত্যশিল্পী, যাঁর প্রতিভার জাদুস্পর্শে লেখনী জীবন্ত হয়ে উঠেছে, ফলে অখ্যাত, অবজ্ঞাত কয়েকটি চরিত্র শুভ্র সমুজ্জ্বল সৃষ্টিকর্ম হয়ে দেখা দিয়েছে। অপরদিকে আবার অনধিকারীর অপকর্মের ফল—স্থূলপাঠ্য তথা-কথিত প্রবন্ধমালা।

৪

বাঙলা প্রবন্ধসাহিত্যের ওপর একমাত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ শশিভূষণ দাশগুপ্তের "বাংলা সাহিত্যের একদিক"। তাঁর আলোচনা মননশীল, কিন্তু প্রবন্ধের সংজ্ঞা এবং স্বরূপ নির্ধারণে তাঁর সিদ্ধান্ত মনে হয় একদেশদুষ্ট। নিবন্ধ, সন্দর্ভ, প্রস্তাব, প্রবন্ধ ইত্যাদি যে-কোনো শ্রেণীর রচনা যার মধ্যে 'সাহিত্যিক নির্মিতির' চিহ্ন আছে, যে শিল্পকর্ম সাহিত্যরসসমৃদ্ধ, সেই প্রবন্ধকে তিনি "রচনা" এই নতুন নামে স্বীকৃতি দিয়েছেন, এবং অন্যান্য সব প্রচেষ্টাকে উপেক্ষার সুরে "প্রবন্ধ" এই নাম দিয়ে শাখাটির মধ্যে কার্যত তাদের ব্রাত্য করে রেখেছেন।

এই নিরিখে একমাত্র "রচনা"ই সাহিত্যিক সৃষ্টি, সাহিত্যরসে পরিপুষ্ট। তাঁর উক্তি, 'ভাষার পারি-পাট্যে, ভাবের গাম্ভীর্যে, সংহতি, চিন্তার পরিচ্ছন্নতায় সাজাইয়া যে গদ্য লেখা, তাকে রচনা নাম দিলাম, শব্দটির একটি যোগরূঢ় অর্থ নির্দিষ্ট হইল।' তিনি মনে করেন, দর্শন, ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, বিজ্ঞান ইত্যাদি বিষয়ের প্রবন্ধ মূলত বুদ্ধিনির্ভর, যুক্তিতর্ক-তথ্য-তত্ত্ব-অনুগত। সাহিত্যের প্রধান যে ধর্ম,—লেখকের হৃদয়ের সঙ্গে পাঠকের হৃদয়ের যোগ সৃষ্টি করা, বুদ্ধি-নির্ভর প্রবন্ধে তা হবার নয়, কারণ বুদ্ধি একাত্ম করে না। রচনা শিল্পীর হৃদয় থেকে উৎসারিত, এখানে ব্যক্তিমানবের প্রাধান্য ; গীতিকবিতার রসমাধুর্য নিয়ে এক-একটি রচনা শিল্পমণ্ডিত হয়ে আত্মপ্রকাশ করে, হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের সংযোগ ঘটিয়ে সাহিত্যের অর্থ সার্থক করে। রচনা মূলত লিরিকধর্মী, শিল্পীর অন্তরের কথা, রচনা একটি 'গদ্য-লিরিক'। ইউরোপীয় রচনা-সাহিত্যের জনক মনটেইনের প্রবন্ধই আদর্শ রচনা। শশিভূষণের বক্তব্যের এই ভাবার্থ।

এমনিভাবে প্রবন্ধসাহিত্যের পরিচ্ছন্ন, রসোত্তীর্ণ শিল্পকর্মকে পৃথক একটি নামে অভিহিত করলে "অলংকার-কৌস্তুভের" কবি কর্ণপুরের 'অসাধারণ চমৎকারিণী রচনা হি নির্মিতি', এই পরিচিত মন্তব্যটি অনেকেরই স্মরণ হবে। শশিভূষণ বোধহয় ধ্বন্যা-লোকের কষ্টিপাথরে যাচাই করে ধ্বনিরসস্মিত সাহিত্যকর্মকেই 'রচনা'-বাচ্য করেছেন, এবং অন্য শ্রেণীর প্রবন্ধকে সাহিত্যের দরবারে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রেখেছেন।

সম্ভবত এ. সি. বেনসন, রবার্ট লিণ্ড ইত্যাদি কিছু ইংরাজি সমালোচকের অনুসরণে বাঙলা প্রবন্ধের বিভাজনের এই উদ্যোগ। এভাবে চিরপরিচিত এই প্রবন্ধ শব্দটির পরিধি-সঙ্কোচন অনেকের কাছেই যুক্তিযুক্ত বলে মনে হবে না। কারণ প্রবন্ধ সেই শ্রেণীর সাহিত্যশাখা যেখানে রসের পরিণতি ততটা নয়, যতটা সিদ্ধান্তের পরিণতি, প্রতিপাদ্যকে সুষ্ঠু-ভাবে প্রতিষ্ঠিত করাই লেখকের মুখ্য উদ্দেশ্য, এবং সেই উদ্দেশ্যকে শিল্পরূপ দেওয়াতেই লেখকের প্রাথমিক সিদ্ধি। কাব্য, নাটক, উপন্যাসের মতো প্রবন্ধও উৎকৃষ্ট, সাধারণ, অপকৃষ্ট ইত্যাদি নানা শ্রেণীর হতে পারে, কিন্তু রসসমৃদ্ধ 'সাহিত্যিক সৃষ্টি' না হলে সে-রচনা কৌলীন্য হারিয়ে শুধু 'প্রবন্ধ' নামে অন্ত্যজ, অপাঙ্‌ক্তেয়, অবমূল্যায়িত হয়ে থাকবে, এ তত্ত্ব বোধহয় বাস্তবসম্মত নয়।

বঙ্কিমচন্দ্রের "লোকরহস্য" বা "কমলাকান্তে"র

প্রবন্ধগুলির মৌল শিল্পরীতি অবশ্যই শশিভূষণ কথিত "রচনা" শ্রেণীর। কিন্তু "বিজ্ঞানরহস্যে"র "গগন পর্যটন", বা "বিবিধ প্রবন্ধে"র "অনুকরণ" ইত্যাদিতে প্রতিপাদ্য বিষয়ের পরিমার্জিত শিল্পরূপ থাকা সত্ত্বেও কি এগুলি প্রবন্ধ হিসাবে গণ্য হবে না? রবীন্দ্রনাথের "বিবিধ প্রবন্ধ" বা "লিপিকা"র প্রতিটি রচনার আলোচনা উৎকর্ষিত, রসসিক্ত, কিন্তু "সাহিত্য" গ্রন্থের "ঐতিহাসিক উপন্যাস" বা "স্বদেশে"-এর "ভারতবর্ষের ইতিহাস" সুবিন্যস্ত, সুলিখিত, পরিশীলিত হলেও ব্রাত্য হয়ে থাকবে, যেহেতু এদের মধ্যে রসের প্রাধান্য নেই?

বিদ্যাসাগরের বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ-বিষয়ক প্রস্তাবগুলি বা বঙ্কিমচন্দ্রের "ধর্মতত্ত্ব", "কৃষ্ণচরিত্র" ইত্যাদি অনেকটা যেন মধ্যযুগের ইউরোপের স্কুলম্যাল পদ্ধতির আধুনিক বাঙলা সংস্করণ। ভাবে, ভাষায়, অঙ্গরূপে এ সমস্তই বর্তমানে ঠিক প্রবন্ধশ্রেণীর রচনা নয়, যেমন নয় ইংরাজি সাহিত্যের লক (Lock)-এর An Essay Concerning Human Understanding বা ড্রাইডেন (Dryden)-এর Of Dramatic Poesy। অপরিমিত আয়তনের তথ্য- ও তত্ত্ব-ভারাক্রান্ত, সূক্ষ্ম যুক্তিতর্কের নিরঞ্জন বৃত্তে আবর্তিত ভিন্ন প্রকৃতির এইসব পুস্তক-পুস্তিকা অবশ্যই আমাদের আলোচনার অন্তর্গত হতে পারে না। কিন্তু হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর "দুর্বাশার শাপ", জগদীশচন্দ্র বসুর "ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে" বা স্বামী বিবেকানন্দের "বর্তমান ভারত" ইত্যাদি পরিমিত আকারের শিল্প-মণ্ডিত রচনাকে সংস্কারমুক্ত প্রতিটি পাঠক প্রবন্ধ নামেই চিহ্নিত করবেন।

এইসব কারণেই আমরা শশিভূষণের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করতে পারি না।

৫

শশিভূষণের গ্রন্থে "রচনা"-নামাঙ্কিত কাব্যাশ্রয়ী, বিষয়ী-গৌরবের প্রবন্ধের স্রষ্টা এবং এইজাতীয় রচনার প্রবাদপুরুষ ফ্রান্সের মনটেইন (Michel de Montaigne 1533-92)। ১৫৮০ সালে Essais নামে দুটি যুগান্তকারী গ্রন্থ ফরাসি ভাষায় প্রকাশ করে তার ভূমিকা (An decteur)-তে ঘোষণা করেন, 'আমার রচনায় আমি নিজেকেই প্রকাশ করি। আমিই আমার পুস্তকের বিষয়বস্তু।'[৪]

এই ফরাসি গ্রন্থ দুটি মূলত লেখকের আত্ম-কথন, নিজের অন্তর উদ্‌ঘাটন, তাঁর বক্তব্যের বিষয়-বস্তু নিজের অন্তরসত্তা। মনটেইনের প্রবন্ধের উপাদান নিজেরই অস্তিত্ব, তাঁর নিজেরই সত্তা নিয়ে গঠিত।, ডবলিউ. এইচ. হাডসনও বলেছেন, তাঁর রচনা আর তাঁর সত্তা একই বস্তু।[৫] আজকের মনোবিজ্ঞানী বলবেন, নিজের দ্বিতীয় সত্তার সঙ্গে এ এক ধরনের কথোপকথন, এবং মনটেইনের নিজের উক্তিতেই এই তত্ত্বের সমর্থন পাওয়া যায়, 'আমি যখন পাঠকের সঙ্গে কথা বলি, তখন আসলে আমি আমারই অপর সত্তার সঙ্গে কথা বলি।'[৬]

সুতরাং এ শ্রেণীর রচনা এক বিশেষ রকমের আত্ম-কথন, নিজের আত্মার সঙ্গে আলাপন। লেখকের মেজাজ অনুযায়ী, তাঁর খেয়াল-খুশির নির্দেশে নিজের দ্বিতীয় সত্তার সঙ্গে একান্ত আলাপচারী। মনটেইনের রচনা তাই চলেছে তাঁর নিজস্ব কল্পনার বিচিত্র পথে, এলোমেলো উদ্দেশ্যহীনভাবে, লাফিয়ে-লাফিয়ে যেন কতকগুলি খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত বিষয়ের ওপর আলোকপাত। পরিণতির স্পৃহা নেই, পরিপূর্ণতার প্রয়োজন নেই। ফল এক অনবদ্য শ্রেণীর নয়নাভিরাম শিল্পবস্তু। হয়তো ইতিহাসখ্যাত ড. স্যামুয়েল জনসন মনটেইনের দিকে দৃষ্টি রেখেই essay সম্বন্ধে তাঁর ক্লাসিক উক্তিটি করে গেছেন: মনের একটি আলগা উচ্ছ্বাস, একটি অসংলগ্ন অসমন্বিত রচনা।[৭] প্রাচীন ফরাসি essai শব্দে যে অসম্পূর্ণতা, যে বন্ধনহীনতার ব্যঞ্জনা, মনটেইনে হালকা মেজাজে নিজের অন্তরের আবরণ উন্মোচনের মধ্যে তারই সুপরিচ্ছন্ন আভাস।

সংগতভাবেই মনটেইনি প্রবন্ধের সগোত্র গীতি-কবিতা বা লিরিক (lyric); উভয়েরই মধ্যে অনুভূতির, অন্তরের গভীরের ঐশ্বর্যের বাণীরূপ। এ শ্রেণীর এক-একটি প্রবন্ধ গীতিকবিতার ধারায় শতদলের সৌন্দর্যে বিকশিত হয়ে ওঠে। এর অবয়বে অপূর্ণতার স্পর্শ, এর সুরে আকাশের বিহঙ্গের কলকাকলির রেশ। বাঙলা প্রবন্ধ শব্দের ধাতুগত অর্থের সরাসরি বিপরীতধর্মী ফরাসি essai, স্রষ্টার রাগে রঞ্জিত।

আসলে essai হল নীরস বুদ্ধির জগৎ ছেড়ে হৃদয়ের ভাবকল্পনার রসলোকে উত্তরণ। এখানে প্রবন্ধকার কবি-প্রকৃতির, ব্যক্তিমানসে তিনি এক প্রকারের কবিই। সুনাম বা গৌরবের আকাঙ্ক্ষায় নয়, অন্তরের অনুভূতি প্রকাশের আবেগেই তাঁর লেখনীধারণ। এ. সি. বেনসনের কথায়, এ প্রবন্ধকার এক প্রকারের কবিই, তবে তিনি ছোটোমাপের কবি। তাঁর রচনার উপাদান সহজ, সরল এবং সাধারণ শ্রেণীর, তার মধ্যে উজ্জ্বলতা কিছু থাকলেও ঐশ্বর্য হয়তো নেই।[৮] বেনসনের এই উক্তিগুলি সুপরিচিত।

আত্মসংবেদনের এই ভূমিকা শুধু সাধারণ কবির নয়, রোমান্টিক প্রকৃতির একটি কবির। তাই এই কবি-প্রাবন্ধিকের সৃষ্টিকর্ম অস্থিতা-স্মিত, আত্মকথন, এবং প্রকারান্তরে তিনি নিজের আত্মার রূপকার।

আজকের সংবাদপত্রের পাতায় বৈচিত্র্য জোগাতে কবি-কবি ভাবে এবং মকশো-করা ভাষায় এক টাইপের চটজলদি প্রবন্ধ লেখার রেওয়াজ হয়েছে। এ প্রবন্ধ যত সহজে লেখা যায়, তার চেয়েও সহজে বোঝা যায় এবং ততোধিক সহজে ভোলাও যায়। কিন্তু মনটেইনের মতো সৃষ্টিশীল প্রবন্ধকারের মনের গহন-গভীরের আঁকাবাঁকা পথের সঙ্গী হওয়া আলো-আঁধারে আচ্ছন্ন শিল্পীর অন্তরের সেই বন্ধুর পথ তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে পরিক্রম করা এত সহজসাধ্য নয়।[৯] আধুনিক ইংরাজি সাহিত্যের বিখ্যাত প্রবন্ধকার হিলেয়ার বেলক্ (Hilaire Belloc) পত্রপত্রিকায় রাশিরাশি তথা-কথিত বিষয়ী-গৌরবের রচনা তো লিখেছেন, কিন্তু চিরায়ত সৃষ্টি তার মধ্যে তিনি কটাই বা করেছেন? ঐশ্বরিক প্রেরণা ফরমায়েসে মেলে না। মনে হয় যেন সত্যিই এক প্রতিভাবান লেখক ভুলপথে পা বাড়িয়ে নিজের শক্তির অপচয়ই শুধু করেছেন।

কিন্তু ঐশ্বরিক প্রেরণা লাভের সৌভাগ্য যার হয়, তাঁর শিল্পসৃষ্টি যুগ- এবং পরিবেশ-নিরপেক্ষ। কামমোহিত বিহঙ্গদম্পতির ঘাতক সেই নিষাদকে অভিশাপ দিতে অজ্ঞান, অনভিজ্ঞ বাল্মীকির অন্তরের কাব্যনির্ঝর স্বতই উৎসারিত হয়ে উঠেছিল। নৈসর্গিক প্রভাবেই জন্ম নিয়েছিল দেবেন্দ্রনাথের "আত্মজীবনী" বা বিভূতিভূষণের "আরণ্যক"। ধোঁয়া-ধুলোয় ঢাকা কলকাতার রাজপথে কোনো এক সন্ধ্যায় পূর্ণিমার চাঁদ বুদ্ধদেব বসুর দিব্যদৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল, রচিত হয়েছিল, "ক্লাইভ স্ট্রীটে চাঁদ" ("হঠাৎ আলোর ঝলকানি")। তারপর বোধহয় অর্ধশতক পার হয়ে গেছে, পরাধীন ভারতের ডালহৌসি স্কোয়ার হয়েছে স্বাধীন ভারতের বি বা দী বাগ, ক্লাইভ স্ট্রীট হয়েছে নেতাজী সুভাষ রোড, ধোঁয়া-ধুলোর আস্তরণ গাঢ়তর হয়েছে অঞ্চলটির আকাশে-বাতাসে। তবু সময়ের আহ্নিক গতিতে পূর্ণিমা আসে, বিবাদীবাগের মাথার ওপরে তিরতির করে কাঁপে আজ দূষিত আস্তরণের ভেতর ঝলসানো একটা তামাটে রঙের রুটি। বুদ্ধদেবের পুরানো কোনো পাঠক হঠাৎ সেদিকে তাকিয়ে বিমনা হয়ে যান, কবেকার পড়ার স্মৃতি জেগে ওঠে, তিনি ছোটো একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বিবাদীবাগ ধরে আবার হাঁটতে আরম্ভ করেন।

ঐশ্বরিক প্রেরণায় রচিত প্রবন্ধের এই পরিচয়। সে প্রেরণা সবার আসে না, আবার যাদের আসে, তাদেরও কি সব সময় আসে? বুদ্ধদেবই বা "ক্লাইভ স্ট্রীটে চাঁদ"-এর স্বাদ-গন্ধের প্রবন্ধ ক-টা লিখেছেন?

ইউরোপের প্রবন্ধ-সাহিত্যে ফরাসি মনটেইনের মুক্তধারার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অনেকটা তাঁরই অনুকৃতিতে কিন্তু বিষয়ী থেকে বিষয়ের গৌরবে সমৃদ্ধ আর-এক ধারা। ফরাসি শিল্পীর essai প্রকাশের

সতেরো বছর পর ১৫৯৭ সালে ইংলনডের বেকন (Francis Bacon 1561—1626) মাত্র দশটি প্রবন্ধের একটি গুচ্ছে আধুনিক ইংরাজি প্রবন্ধের সূচনা করে বলেছেন যে এগুলি বিচ্ছিন্ন কয়েকটি চিন্তার সমষ্টিমাত্র; তাদের অর্থের গভীরতা আছে কিন্তু সবই অবসরবিনোদনের জন্যে লিখিত সংক্ষিপ্ত উক্তির মতো। এগুলি যতই পড়া যাক, চিত্ত যেন ভরবে না, রসনা যেন পরিতৃপ্ত হবে না, পরিমিত লবণযুক্ত সুখাদ্যের মতো এদের আকর্ষণ, আরো পড়তে ইচ্ছে করবে।[১০]

যে-প্রবন্ধ আজ ইংরাজি সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ এবং সমস্ত জাতির গর্ব, তার ঋত্বিক বেকন কিন্তু মূলত ফরাসি মনটেইনের উত্তরসাধক। তাঁরই খণ্ড-ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত "এসের" (essai) অঙ্গরূপ এবং প্রকাশভঙ্গি আত্তীকৃত করে ভাবে, ভাষায়, শিল্প-রীতিতে প্রতিটি প্রবন্ধে স্বকীয়তার স্বাক্ষর রেখেছেন বেকন, এক বিস্ময়কর মনীষীর প্রজ্ঞাঋদ্ধ এক-একটি রচনা, প্রতিটিতে অমৃতের স্বাদ। মনটেইনের শিথিল, অস্মিতধর্মী কথোপকথন-ভঙ্গির পরিবর্তে বেকনে সুসংহত, ঘনপিনদ্ধ, ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অবয়বে যেন সূত্রাকারে পরিবেশিত বাক্‌বৈদগ্ধ্যে পরিপূর্ণ এক-একটি মার্জিত, পরিচ্ছন্ন শিল্পবস্তু।

মনটেইনের বিষয়ী- এবং বেকনের বিষয়-গৌরবের লক্ষণাক্রান্ত ধারার ঐতিহ্যবাহী আধুনিক ইউরোপীয় প্রবন্ধসাহিত্য। ফ্রান্স আর ইংলনডের এই দুই যুগ-নায়কের উত্তরসূরী তাঁদের দেশেই এসেছেন অনেক পরে-পরে, আমাদের মতো একটি অনুন্নত দেশে তার প্রভাব এসেছে স্বাভাবিকভাবেই তারও অনেক পরে। কারণ গদ্যসাহিত্য রচনার উপযোগী ভাষার সৃষ্টি এবং প্রবন্ধের মতো একটি নতুন শাখার প্রয়োজনের অনুভূতি এখানে দেখা দিয়েছে উনিশ শতকের গোড়ার দিকে, তার আগে নয়। বাঙলার আধুনিক সংস্কৃতির ভাণ্ডার সাধারণতই মর্মান্তিকভাবে রিক্ত, ফরাসি বা ইংরাজি সাহিত্যের তুলনায় জ্ঞানবিজ্ঞানের বিভিন্ন দিকে বাঙলায় মৌলিক রচনা এখনো অনেক অপ্রতুল। আমাদের রেনেসাঁসের সূচনাপর্বের লেখক-দের সমকালের পাশ্চাত্য প্রবন্ধের আঙ্গিক ও অঙ্গরূপ সম্বন্ধে বিশেষ কোনো ধারণা ছিল না, সুতরাং তাঁদের প্রথম প্রয়াস মধ্যযুগের ধারার অন্ধ অনুবর্তনমাত্র। কিন্তু ক্রমশ অন্যান্য প্রকৃতির সাহিত্যের মতো প্রবন্ধের মধ্যেও শিল্পীর সচেতনতা এবং তার সঙ্গে স্বকীয়তা প্রকাশ পেয়েছে, কাব্য-উপন্যাসের সঙ্গে সমানতালে প্রবন্ধসাহিত্যও পরিপুষ্ট হয়ে আমাদের রিক্ত ভাণ্ডার পূর্ণ করে চলেছে।

৬

এখন পালাবদলের দিন। বিষয়নিষ্ঠ, গবেষণামূলক প্রবন্ধ এবং পুস্তিকার প্রকাশ যেমন একদিকে বিস্তার লাভ করেছে, অন্যদিকে তেমনি আত্মকথনমূলক নানাপ্রকার রচনাতে প্রবন্ধশাখাটি ঐশ্বর্যময় হয়ে উঠেছে। এরই সঙ্গে এসে যুক্ত হয়েছে অপেক্ষাকৃত হালকা মেজাজের হালকা শিল্পরীতির বিষয়ী-গৌরবের এক বিশেষ প্রকৃতির প্রবন্ধ, যার রমণীয় উপনাম 'রম্যরচনা'। নতুন যুগে নতুন মানুষের চিন্তাধারা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী কাব্য-নাটক-উপন্যাসের মতো প্রবন্ধেরও রূপকল্প পালটাবে, এতে বিস্ময়ের কিছু নেই—কারণ, সাহিত্য তো জীবনেরই প্রতিচ্ছবি। দ্রুতপরিবর্তনশীল আজকের জীবনে নব-পর্যায়ের ভিন্নতর স্বাদগন্ধের এই প্রবন্ধ আমাদের সাহিত্যে আর-এক সংযোজন।

নতুন-নামাঙ্কিত এই রচনায় সব সময় হিরণ্যের দ্যুতি চোখে না পড়লেও এর কিছু প্রতিভাবান শিল্পী নতুন দিগন্তের সন্ধান অবশ্যই দিয়েছেন। যে-কোনো শ্রেণীর শিল্পকর্ম যখন মননশীলতায়, শিল্পসুষমায় পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে, তখন তার নামকরণে কী-ই বা এসে যায়? হয়তো দেখা যাবে, যাকে আমরা আজ সাহিত্যের অঙ্গনে নবাগত মনে করে স্বাগত জানাতে

কুণ্ঠিত হয়ে উঠছি, আসলে সেটি হয়তো কোনো নতুন সৃষ্টি নয়, সেই পুরাতন বিষয়ী-গৌরবের প্রবন্ধের এক আধুনিক রূপ,—সেই চিরপরিচিতের নব-রূপায়ণ, মনে-লাগার মতো নতুন একটি নামে প্রচারিত। দৃষ্টি আরো একটু প্রসারিত করলে হয়তো দেখা যাবে, এই লক্ষণাক্রান্ত রচনা হুতোম, পঞ্চানন্দ, বঙ্কিমচন্দ্রে অনুপস্থিত নয়, এবং এরই পরে রবীন্দ্রসাহিত্যে রম্য-রচনা একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। ১৯০৭ সালে প্রকাশিত মাত্র কুড়িটি রচনার "বিচিত্র প্রবন্ধে"র ভূমিকায় কবি বলেন, 'ইহার যদি কোনো মূল্য থাকে তাহা বিষয়বস্তু-গৌরবে নয়, রচনারসসম্ভোগে।'

কালীপ্রসন্নের "হুতোমে"র সময় থেকে বিংশ শতকের তিনটি দশক পর্যন্ত রম্যরচনা নাম না হোক, ওই আঙ্গিক ও অঙ্গরূপে এই শ্রেণীর নানা রসসিক্ত রচনার আবির্ভাব বাঙলা সাহিত্যে প্রচুর ঘটেছে। কিন্তু বাহুল্যপূর্ণ আড়ম্বরে শাঁখ-ঘণ্টা বাজিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে একে নতুন নামে বরণ করে নেবার কোনো উৎসব তখনো হয় নি। এমনি করেই ধীরে-ধীরে পার হয়েছে শতাব্দীর প্রায় তিনটি দশক। তৃতীয় দশকটি শেষ না হতেই পূর্ব গোলার্ধের পার্ল-হারবারে পশ্চিম গোলার্ধের 'প্রিন্স অব ওয়েল্‌স্' ও 'রিপাল্‌স্' নামে দুটি অপরাজেয় যুদ্ধ-জাহাজ ধ্বংসের সঙ্গে আরম্ভ হয়েছে ভয়াবহ সেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। তারপর যুদ্ধের অন্তিম পর্বে হিরোশিমা আর নাগাসাকি শহরের সংখ্যাতীত মানুষের মৃতদেহ প্রত্যন্ত ইউরোপের আরো অসংখ্য ছিন্নভিন্ন শবের সঙ্গে বারুদের ধোঁয়ায় মিশে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস জমাট করে তুলেছে। সেই চরম হত্যালীলার দিনে, সেই বোমা-গুলি, অ্যাটম বোমা আর গলিত শবের দূষিত বাতাসে ঠাসা পরিবেশে বাঙলা রম্যরচনার জন্ম, তথা আনুষ্ঠানিক অভিষেক। বিষবাষ্পে পরিপূর্ণ ক্রন্দসীর আর্ত যন্ত্রণার নিরসন হয়তো তাতে হয় নি, কিন্তু নীচের পৃথিবীর রুদ্ধশ্বাস মানুষের এক ঝলক মুক্তবায়ুর মতো এই রচনাকে সানন্দে গ্রহণ করেছে দেখে এর শিল্পীরাও নির্মল আনন্দ লাভ করেছেন।

এমনি করেই হয়তো রবীন্দ্রনাথের 'বিচিত্র প্রবন্ধে'র রচনারসসিক্ত, বিষয়ী-গৌরবের সেই প্রবন্ধেরই অঙ্গ-রূপটি নানা হাতে নানাভাবে ব্যাপক চর্চার পর একটি নতুন মন-মাতানো নামে বাঙলা সাহিত্যে কায়েম হয়ে বসেছে। আমাদের সাহিত্যের চল্লিশ-পঞ্চাশের দশক রম্যরচনা এমনি মাতিয়ে রেখেছে, যেন সেই কটালের বন্যায় গল্প-উপন্যাস শাখাদুটি ভেসে যাবার অবস্থা। গল্প-উপন্যাস-প্রবন্ধ ইত্যাদি সবশ্রেণীর সাহিত্যের তিল-তিল ভাগ নিয়ে যে তিলোত্তমার সৃষ্টি, দেখতে-শুনতে যা পরম রমণীয়, যার উপভোগে পরম আনন্দ, তার পরা-বাস্তব প্রাণধর্মের, তার তুরীয় লীলার আকর্ষণ অপ্রতিরোধ্য। এবং আনন্দের বিষয়, প্রথম পর্বে ছাপাখানা থেকে অনেক অমূল্য সম্পদই বের হয়ে এসেছে,—"পথে প্রবাসে", "দেশে বিদেশে", "দৃষ্টিপাত", "কত অজানারে" ইত্যাদি। এগুলি সবই আসলে রম্যরচনাসংকলন, প্রতিটি গ্রন্থই চিরায়ত সাহিত্য।

কিন্তু "রম্যরচনা"—এই শ্রুতিমধুর, দৃষ্টিনন্দন শিল্পবস্তুটির কী পরিচয়? কী এর কুলজিপত্র?

এ সম্বন্ধে কোনো প্রামাণ্য তথ্য আমাদের জানা নেই। শুধু এইটুকু বলা যায়, "বিচিত্র প্রবন্ধে"র উত্তরকালে রবীন্দ্রনাথ সহ আরো অনেক কুশলী শিল্পীর হাতে এমনি হালকা আঙ্গিকের রসসিক্ত রচনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা অপ্রতিহত গতিতে চলেছিল। রবীন্দ্রযুগে বাঙলা সাহিত্যে তখন বসন্তঋতু।

অবশ্য তার অনেক আগেই ইংরেজি সাহিত্যের ভাণ্ডার এমন প্রকৃতির অনেক রত্নেই পরিপূর্ণ। প্রায় আঠারো শতকের গোড়া থেকেই সেখানে "বেল লেটার" (belles lettres) নামে এক শ্রেণীর হালকা টেকনিকের রসসাহিত্য জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। Belles letters কথাটি ফরাসি, অর্থ মনোরম সাহিত্য বা fine letters,—যেমন, কাব্য, নাটক, উপন্যাস ইত্যাদি। তারপর বেল লেটার কথাটির

অবনমন হতে থাকে, তার মানে দাঁড়ায়,—মার্জিত, পালিশ-করা রচনা বা সাহিত্য, এবং বর্তমানে বেল লেটার মানে—যে-কোনো হালকা শিল্পরীতির রস-সাহিত্য। বোধহয় ইউরোপে বেল লেটারের ক্রমশ খুব অবমূল্যায়ন ঘটে থাকবে, তাই ১৮৭৮ সালে হার্বার্ট রীডের মতো বিদগ্ধ সমালোচক বেশ কড়া ভাষায় এর সম্বন্ধে বলেছেন, এটা একটা নীরস, বিস্বাদ বস্তু, ইংল্যানডের পরিবেশে কখনো স্বাভাবিক হবার নয় (that vapid, half-naturalised term, belles letters)।

ওই উনিশ শতকের প্রথমার্ধে কিন্তু ইংরেজি রোমানটিক সাহিত্যের সুপরিণত কালে "ফ্যামিলিয়ার এসে" (familiar essay) ও "পারসোন্যাল এসে" (personal essay) নামে রম্যরচনা গোত্রের প্রবন্ধের রমরমা, এবং গোটা শতাব্দী ধরেই হয়তো ইংল্যানডের জল-হাওয়ার গুণে অসংখ্য প্রতিথযশা শিল্পী শাখাটি পরিপুষ্ট, ঐশ্বর্যময় করে তুলেছেন। যেমন লে হান্ট (Leigh Hunt), হ্যাজলিট (William Hazlitt), চার্লস ল্যাম (Charles Lamb), ই. ভি. লুকাস (E. V. Lucas), রবার্ট লিনড (Robert Lynd) ইত্যাদি। ইংরেজি প্রবন্ধসাহিত্য পৃথিবীর সর্বত্রই এমন পরিচিত আর সমাদৃত হয়ে উঠেছে যে ওই দেশের সমালোচকরা গর্বভরে প্রচার করেছেন, সাহিত্যের একটি শাখা হিসাবে প্রবন্ধ ইংল্যানড থেকেই উদ্ভূত, ইংরেজি সাহিত্যের বিশেষ গৌরবের বস্তু; প্রায় সর্বত্রই প্রবন্ধ একটি ইংরেজি শিল্পবস্তু হিসাবেই পরিচিত এবং স্বীকৃত।[১১]

বিদেশে নানা রূপের, নানা রঙের এমনি শ্রেণীর রচনার ব্যাপক চর্চা এবং শ্রীবৃদ্ধি যখন চলছে, এবং এখানেও পরিমাণ আর বৈচিত্র্যে অনেক কম হলেও সেরূপ চর্চা অব্যাহত, সেই পরিবেশে পরম রমণীয় এই নামটিতে আমাদের সাহিত্যে এর প্রতিষ্ঠা। অনেকের অবশ্য সেদিন মনে হয়েছে, আমাদের প্রবন্ধের মালঞ্চে এ ফুলটি হঠাৎই বুঝি এসে ফুটল!

তা প্রায় পরিচয়হীন, অনেকটা যেন বৃন্তহীন পুষ্পসম রম্যরচনা সেদিন নতুন এক ঘরানা হিসাবেই বন্দিত হয়েছে এবং এরই কল্যাণে বাঙলা প্রবন্ধের সম্পদও অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্তমানে বিদেশী বেল লেটার, ফ্যামিলিয়ার এসে, পারসোন্যাল এসে ইত্যাদি নামগুলি যেমন সেখানে অবলুপ্তির পথে, সেই সঙ্গে তাদের ব্যাপক চর্চাও, এখানে আমাদের দেশেও রম্যরচনার ওই একই ইতিহাস।

কিন্তু আশ্চর্য এই, শাখাটির এত অবদান এবং শব্দটির এত আবেদন থাকা সত্ত্বেও এর প্রকৃত স্বরূপ আজো যেন অস্পষ্টতার কুয়াশায় আচ্ছন্ন, এর সংজ্ঞা এবং রূপকল্প সম্বন্ধে বিশারদদের সামান্য যে মতামতটুকু সংগ্রহ করা যায়, তা-ও অনেক সময় পরস্পরবিরুদ্ধ, সুতরাং বিভ্রান্তিকর।

"ভারতকোষে"র আলোচক প্রবন্ধসাহিত্যকে দুটি শ্রেণীতে ভাগ করে বলেছেন, 'যেসব প্রবন্ধে যুক্তি-মালার বিন্যাস প্রবলতর, সেগুলি বুদ্ধি-সাপেক্ষ; রসানুভূতির আবেদন যেগুলিতে প্রবলতর, সেগুলি রম্যরচনারূপে গণনীয়।'

"রম্য" অর্থে সুন্দর, মনোরম। সংসদ অভিধানে রম্যরচনার অর্থ, 'প্রধানতঃ লঘুচালে লিখিত হাস্য-রসাশ্রিত সুখপাঠ্য রচনা বা গ্রন্থাদি।' অর্থাৎ এই শ্রেণীর রচনা মূলত সুখপাঠ্য, এবং সেই উদ্দেশ্যেই এর প্রকাশভঙ্গিতে লঘুচাল এবং এর অবলম্বন হাস্যরস।

"ভারতকোষে"র প্রতিবেদন অনেকটা জোসেপ সীপলের মতো, মোটামুটি নির্ভরযোগ্য। কিন্তু সংসদ অভিধানের সংজ্ঞা শশিভূষণের ব্যাখ্যার চেয়েও বোধহয় একদেশদর্শী, বাস্তব ক্ষেত্রে এ ব্যাখ্যা প্রয়োগ করা সমস্যাজনক।

"ভারতকোষে"র ব্যাখ্যা অপেক্ষাকৃত নির্ভরযোগ্য হলেও কিন্তু ত্রুটিমুক্ত নয়। যেমন, রসানুভূতির আবেদন প্রবলতর হলেই যদি সে প্রবন্ধ রম্যরচনা

শ্রেণীর হয়, সেই নিরিখে শশিভূষণ যেসব প্রবন্ধকে 'ভাষার পরিপাট্যে, ভাবের গাম্ভীর্যে, সংহতি ও চিন্তার পরিচ্ছন্নতায়' লিখিত বলে 'রচনা' নাম দিয়েছেন, সে-সকলকে রম্যরচনা বলতে হয়। কিন্তু অক্ষয় সরকারের "ভাই হাততালি"র মতো একটি হালকা রসসিক্ত রচনায় 'ভাবের গাম্ভীর্য' কোথায়? আবার সংসদ মতে রম্যরচনা শব্দটির ব্যঞ্জনা যদি 'লঘুচাল' ও 'হাস্যরসাশ্রিত' হয়, তার মধ্যে ভাবের গাম্ভীর্য আসা বোধহয় সম্ভব নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের "একা" (কমলাকান্ত), বা রবীন্দ্রনাথের "শ্রাবণসন্ধ্যা" (শান্তিনিকেতন), যেখানে রসানুভূতির আবেদন প্রবল, সেখানে হাস্যরসের কণামাত্র আবিষ্কার করা যায় না।

লঘুচালে লিখিত হলেই একটি রচনাকে হাস্য-রসাত্মক হতে হবে, সংসদ অভিধানের এ সিদ্ধান্ত কখনও বাস্তবসম্মত নয়। ওপরে উল্লিখিত বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের ওই দুটি প্রবন্ধ ছাড়া বাঙলা, ইংরেজি সাহিত্যে অসংখ্য রচনা আছে যার শিল্পরীতি লঘুচালের কিন্তু আবেদন হাস্যরসাত্মক মোটেও নয়। শংকরের "কত অজানারে" বর্ণনামূলক খণ্ডকাহিনীর এক অপরূপ সংগ্রহ; প্রতিটি আখ্যান লঘুচালে বিবৃত, কিন্তু প্রায় প্রতিটি আখ্যানের আনাচে-কানাচে যে মর্মবেদনার আভাস, যে করুণ রাগিণীর একটানা গমক বিশেষ কয়েকটি কাহিনীর আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত অনুভব করা যায়, হাস্যরসের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর। চার্লস ল্যাম-এর "ড্রীম চিলড্রেন" (Dream Children) এমনি আর-এক লঘুচালে আত্মকথনমূলক প্রবন্ধ, প্রৌঢ়, অকৃতদার লেখকের মানসচিত্র; শ্রীপুত্রকন্যায় ভরা একটি আনন্দময় সাংসারিক জীবনের কল্পনায় রঞ্জিত আলেখ্যের প্রতিটি অনুচ্ছেদ যেন অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বর্ণিত, সমগ্র কাহিনীতে একটি পরিশুদ্ধ বিয়োগান্ত নাটকের সুর। হাস্যরসের আভাস এখানে কোথায়?

রম্যরচনার স্বরূপ অনেকটা অনুভূতিগ্রাহ্য, জীবনের প্রসারিত ক্ষেত্র এর বিচরণভূমি। শিল্পীর বিচিত্রগামী কল্পনামণ্ডিত এমনি একটি পরিবর্তনশীল বস্তুকে সীমাবদ্ধ কোনো সংজ্ঞায় যুক্ত না করে একে লঘুচালে লিখিত একটি সুখপাঠ্য রচনা হিসাবে গণ্য করাই বোধহয় সংগত হবে। রসোত্তীর্ণ বা কালোত্তীর্ণ হয় এই রম্যরচনা লেখনীর জাদুদণ্ডের প্রভাবে, না হলে লঘু-চালের এমন আঙ্গিকের রচনার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি রম্যরচনার আপজাত্যরূপে,—যা একটি সাময়িকপত্রের পৃষ্ঠাপূরণের ক্ষণস্থায়ী পণ্যবিশেষ। সংবাদপত্র-অনুগত, রহস্য-রসিকতা-আশ্রিত যে-কোনো প্রবন্ধই বর্ণাঢ্য রামধনুর মতো মনোহর হতে পারে, কিন্তু তার আবেদন ঘণ্টার মাপের। এ যেন বিদ্যুতের দীপ্তি, পথিকের চোখই ধাঁধায়, পথের দিশা দেয় না, তার দ্যুতি আছে, স্থিতি নেই। পদার্থহীন শিল্পরূপ আর গল্পহীন শিমুল ফুল খুব ভিন্নজাতের বস্তু নয়। দুঃখের বিষয়, সাময়িক-পত্রের আনুকূল্যে রম্যরচনার শিমুল ফুল হওয়ার প্রবণতা অধুনা বড়োই প্রবল।

৭

রম্যরচনার আপজাত্যবিশেষ, পল্লবগ্রাহিতা ও বাচনিক কৌশলে সজ্জিত, সাহিত্যের নামাবলী গায়ে অতি আধুনিক এই বস্তুটির দেশে-বিদেশে কিছু শ্রীবৃদ্ধি বিদগ্ধ পাঠক এবং মননশীল সমালোচকের শঙ্কার কারণ। এটি প্রায়ই কৃত্রিম, ঝকঝকে, কিন্তু প্রাণবন্ত কোনো ব্যক্তিত্বের স্পর্শহীন; আবার কখনো বা আকারে প্রকারে তৃপ্তিদায়ক, রসে রসিকতায় টইটম্বুর, পরিশুদ্ধ আকাশচারণার ফসল। অনেক সময় এক-একটি ষোলো আনাই আসলি শিমুল ফুল, যন্ত্রযুগের চক্রে পিষ্ট, ব্যস্ত, বিপর্যস্ত মানুষের মনোরঞ্জনের জন্যে এর সৃষ্টি। আপিস যেতে-যেতে, আধঘণ্টার বাস বা ট্রেন-জার্নিতে, অথবা কর্মক্লান্ত দেহে বাড়ি ফিরে রাত্রে শোবার আগে ঘুমের দাওয়াই হিসাবে এই শ্রেণীর রম্যরচনা পরম উপযোগী, চরম উপভোগ্য।

প্রবন্ধশাখার সর্বাধুনিক এই খুদে আগন্তুকটি

সাহিত্যের চিড়িয়াখানায় এক বিচিত্র বস্তু—গঠনে, চলনে-বলনে এক স্বতন্ত্র জীব, অনেকটা সেই 'আবোল-তাবোলে'র হাঁসজারুর মতো। আজকের 'ইনি' এ-কূলেও নন, ও-কূলেও নন, কিন্তু এর অন্তর-সত্তা বলতে কিছু না থাকলেও এটি একটি উজ্জ্বল, চটকদার সৃষ্টি। এই শতাব্দীর প্রথম দিক থেকেই নানাজাতীয় পত্র-পত্রিকার প্রসারের সঙ্গে-সঙ্গে বোধহয় এই শ্রেণীর রচনার কিছু বেশি প্রাদুর্ভাব হয়ে থাকবে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাদের 'চুটকি' আখ্যাত করে মন্তব্য করেছেন, 'চুটকি যে মন্দ তাহা বলিতেছি না। অনেক চুটকি অতি সুন্দর, বেশ মনে লাগে। অনেক সময় চুটকিতে বেশ গুণপনাও প্রকাশ পায়। কিন্তু ভাবি চুটকিই কি আমাদের যথাসর্বস্ব হইবে? চুটকির একটি দোষ আছে— যখনকার তখনই, বেশী দিন থাকে না।'

"দ্য মডার্ন এসে" (The Modern Essay) প্রবন্ধে ভার্জিনিয়া উলফ তথাকথিত এই শ্রেণীর রম্য-রচনা সম্বন্ধে বড়ো বিরূপ মন্তব্য করেছেন। পনের শ থেকে দু হাজার শব্দের হালকা, মাঝারি (light middle) মাপের এই বাজারি-পণ্যের নির্মাতা রাম-শ্যাম থেকে যদু-মধু যে-কেউ হতে পারেন। লোক্যাল ট্রেনের যাত্রীদের টুকিটাকি দ্রব্যের যোগানদার হকার আর এই ফরমায়েশি রচনার লেখক অনেকটা সমগোত্রের। তাই এই শ্রেণীর লেখকের মধ্যে একটা যান্ত্রিক সুরের রেশ প্রকট হয়ে ওঠে। মনটেইন-ল্যামের পরিশুদ্ধ 'মুড'র আত্মকথনের স্নিগ্ধতা সেখানে প্রত্যাশিত নয়, সুতরাং স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণের স্পন্দনও বিগত। নির্দিষ্ট ফরমায়েশের বিষয়কে পাঠকের মনে ধরাতে তাঁর প্রাণে একটু পুলক জাগাতে এখানে আছে শুধু একটা চেষ্টাকৃত, পাঁচমিশেলি শৈলীরীতির জৌলুস :

> কদিন ধরেই আকাশটা তৃষ্ণার দিগন্তব্যাপী দরখাস্ত মেলে ধরেছিল, পরশু বিকেলে সেই আপিল মঞ্জুর হল। নীলাঞ্জন ছায়া ভারতীয় ভাষা পরিষদের হলঘরের জানালায় কোমল পর্দা টাঙিয়ে দিল,

আর-একটি নমুনা :

> সারা হপ্তা গম্ভীর হয়ে রইল আকাশটা। মাঝে মধ্যে সন্ধ্যার মুখে সহৃদয়ভাবে বর্ষণ দান করত। সপ্তাহশেষে সেই আকাশের মুখ থমথমে হল আর তার পরই বিপুল অট্টহাস্যের তোড়ে সহবটাকে নাকানি-চোবানি খাওয়াল।

ইউরোপ-আমেরিকার কিছু সাময়িকপত্রের এমনি পল্লবিত রচনার ঢঙ, এমনি রূপক-অলংকারে সজ্জিত কৃত্রিম শৈলীর প্রভাব আমাদের দেশের কিছু লেখক সম্ভবত এড়াতে পারেন না।

এই টাইপের বা সমগোত্রের ইংরাজি প্রবন্ধের রচয়িতা সম্বন্ধে ভার্জিনিয়া উলফের মন্তব্য আমাদের মনে আসবে। তিনি বলেন, হাজারো কাজের সঙ্গে জড়িত এমন লোকের বিষয় বা বিষয়ী-আশ্রয়ের, যে-কোনো শ্রেণীর প্রবন্ধ বসে লেখার সময় কোথায়? সুতরাং ফরমায়েশের চাহিদা মেটাতে তাঁকে প্রবন্ধকার সেজে কলম ধরতে হয়, জীবনের গভীরে যাবার সময়ের অভাবে হালকা, চটকদার কিছু রচনা লিখে ফেলতেই হয়। দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে একটি করে খাঁটি স্বর্ণমুদ্রা বা সভরিন না দিয়ে তিনি প্রতি সপ্তাহেই দিয়ে চলেন একটি করে সেই সবচেয়ে শস্তা মুদ্রা, যার নাম হাফ-পেনি![১২]

এ চিত্ররূপ তো সেই কবেকার, অর্ধ শতকেরও আগের হাফ-পেনি ও সাপ্তাহিক-পত্রের যুগের। শিল্প ও যন্ত্রসভ্যতার প্রসারের সঙ্গে এখন শুধু সাপ্তাহিক নয়, দৈনিক আর তাৎক্ষণিক চাহিদার কাল। এই পরিস্থিতিতে স্বাভাবিকভাবেই একশ্রেণীর জনপ্রিয় শিল্পীর প্রাণসত্তা স্তিমিতপ্রায়, আত্মপ্রত্যয়ের অভাবে তাঁদের প্রবন্ধের ওপর কৃত্রিম জৌলুসের আবরণ। হৃদয়হীন, সময়ের কাঙাল মানুষের তোষণে নিয়োজিত হিলেয়ার বেলকের মতো প্রতিভাবান লেখক টনটন শিল্পবস্তু রচনা করেছেন। কিন্তু তার মধ্যে, দুঃখের বিষয়, অধিকাংশই তো মরচে-পড়া, ক্ষয়ে-যাওয়া হাফ-পেনির অবস্থা, 'সলিড সভরিন' আর কটি?

৮

কিন্তু আশার কথা, প্রবন্ধের এই আপজাত্যগুলি ঐশ্বর্যময় বাঙলা প্রবন্ধশাখার ভগ্নাংশ মাত্র। বর্তমানে কাব্য তো অবক্ষয়ের পথে; দেশ-বিদেশের সমালোচকের মতে, উপন্যাস-ছোটোগল্পের যুগও বিগতপ্রায়। পত্র-পত্রিকার পৃষ্ঠাপুরণের প্রয়োজনে কাব্য-গল্প-উপন্যাসের চাহিদা আর জোগান চলতে থাকলেও কিন্তু গণমানসে মান্ধাতা আমলের শিল্পবস্তু-গুলির প্রতি আকর্ষণে ভাঁটা পড়েছে। নানা তথ্যের নিষ্পেষণে কাব্য একটি নীরস, প্রাণহীন, দুর্বোধ্য শিল্পে পর্যবসিত হয়ে প্রায় আত্ম-অবলুপ্তির পথে। কাল্পনিক ঘটনায় গঠিত গল্প-উপন্যাসের আবেদনও ক্রমশ লক্ষণীয়ভাবে নিম্নমুখী, বিশেষ করে ইউরোপ আর আমেরিকায়। যন্ত্রযুগের মানুষের রূঢ়, নির্মম দৃষ্টিতে প্রাচীন রীতির গল্প-উপন্যাস শুধু গল্প আর উপন্যাসই, সবই অলীক, 'ফিকশান'-মাত্র। সামান্য একছিটে বাস্তবের ওপর ইনিয়ে-বিনিয়ে কল্পনার ইমারত নির্মাণ এখনকার কড়া বাস্তবের দিনে বড়ো বিস্বাদ, বড়ো ক্লান্তিকর, 'ন্যামবি-প্যামবি' বলে ঠেকছে। যুদ্ধোত্তর জগতের পুরোপুরি বাস্তব-ভিত্তিক উপন্যাস, "ননফিকশান নভেল", এমন কি "এসে ফিকশান" (essay fiction) নামে ষোলো আনা খাঁটি বস্তুর দাবি উঠেছে। সাংবাদিকতাধর্মী এই শ্রেণীর নভেল ইউরোপ-আমেরিকার বাজারে মিলিয়ন সংখ্যায় এখন প্রচারিত। সুতরাং আশঙ্কা অমূলক নয়, একদা রসাত্মক কাব্যের বর্তমানে যে ধূসর, শ্মশানযাত্রার দশা, অদূর ভবিষ্যতে হয়তো দেখব, গল্প-উপন্যাসের একই দশা, তারাও একই পথের যাত্রী।

আধুনিক সভ্যতা যেদিন সগর্বে তার অগ্রগতি ঘোষণা করল, সেদিন থেকেই শুরু হল কাব্যের অবক্ষয়। ইরাজ প্রাবন্ধিক মেকলের মোক্ষম আপ্ত-বাক্যটি যে সার্থক হতে চলেছে, আমরা এখন তা পরিষ্কারভাবে উপলব্ধি করছি। আরো বোধ হচ্ছে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিদ্যার বিস্তারের সঙ্গে শুধু কাব্য নয়, গল্প-উপন্যাসও ক্রমশ বন্ধ্যাত্ব প্রাপ্ত হয়। তা নাহলে এমন দুটি দৃষ্টিনন্দন, শ্যামল-সুন্দর সাহিত্য-শাখা দিনে-দিনে বিবর্ণ, নিষ্প্রাণ হয়ে উঠছে কেন? কেন গল্প-উপন্যাস-শিল্পীর মনের কোকনদ আজ মধুহীন হয়ে পড়ছে?

এই হতাশাময় পরিবেশে সর্বত্রই প্রবন্ধসাহিত্যের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যই আশার কথা। একদা সেই অন্তাজ শাখাটি নিজস্ব মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হতে এগিয়ে চলেছে, নৈয়ায়িক চিন্তা-ভাবনায় অন্বিত প্রবন্ধ, কল্পনাস্থিত আত্মকথনের প্রবন্ধ। যদি শিল্প-বিজ্ঞান, সিনেমা-খেলাধূলা প্রভৃতি যন্ত্রসভ্যতার অনুষঙ্গ সাহিত্যের অন্যান্য শাখার অবক্ষয়ের পথ সুগম করেছে, তারা কিন্তু বিষয় এবং অঙ্গরূপের বৈচিত্র্য এনে প্রবন্ধশাখাকে সমৃদ্ধতর করে তুলেছে। প্রবন্ধের বিষয়বস্তু যেমন আজকের বৈচিত্র্যময় জীবনের সর্ব-স্তরে প্রসারিত হয়ে উঠেছে, উপযুক্ত অঙ্গরূপে তাদের প্রকাশ করতে প্রবন্ধশিল্পীকেও তেমনি বিষয়ের উপযোগী আঙ্গিকেরও উদ্ভাবন করে নিতে হচ্ছে।

এমনিভাবে হাঁসজারু-রূপের রম্যরচনার নেতি-বাচক দুর্বলতাটুকু ঢেকে ফেলে, ত্রাত্য অপবাদের অবসান ঘটিয়ে, বর্তমানে বিষয়- ও বিষয়ী-আশ্রিত, এই দুই মৌল অঙ্গরূপের প্রবন্ধ সগৌরবে স্বতন্ত্র একটি শাখা হিসাবে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথে। কাব্যের সমাধি প্রায় সম্পূর্ণ, গল্প-উপন্যাসের জীবনবৃত্ত সম্ভবত সমাপ্ত-প্রায়, সুতরাং আগামী দিন প্রবন্ধ এবং সেই সঙ্গে হয়তো কিছুটা নাটকেরও। সাহিত্যে সৌন্দর্যের চরম উৎকর্ষ আগামী যুগে সেই পরিস্থিতিতে বোধহয় প্রবন্ধকার এবং নাট্যকারই সৃষ্টি করবেন। শিল্পসৃষ্টি বিষয়নিরপেক্ষ, প্রতিভানির্ভর। নতুন-নতুন মননশীল লেখকের আগমনে গতদিনের এই উপেক্ষিত প্রবন্ধ-শাখাটি আগামী দিনে শ্রেষ্ঠ সমাদরের যোগ্য হবে, এ আশা আজকের বাস্তববাদী সমালোচকের।

পাদটীকা :

১. ...the true essay is a composition of moderate length...which deals in an easy, cursory way with the chosen subject. (Encyclopaedia Britannica, 1973).
...a literary composition (usu, prose and short) on any subject. (Concise Oxford Dictionary).
...the fragmentary and consciously unsystematic style...(Cassell, Encyclopaedia of Literature, vol. I).
...In general, it is a composition of moderate length and on a restricted topic. (Joseph Shipley—Dictionary of World Literature).

২. But in point of length, Browne's works certainly do not, with one exception, exceed the limits within which custom has confined the term essay. (The English Essay and Essayists, Hugh Walker).
...he is in soul and substance an essayist from start to finish.—ibid.

৩. ...So form in a work of art is not the structure alone, but all that determines special character ; meaning or expressiveness as well as structure, is a formal element. (Shipley, op. cit.).

৪. c'est moy qua je peins...Je suis moy-measme...livere. (It is myself I print... Myself the matter of my book.—L. Cazamian, A History of French Literature, Oxford, 1966).

৫. ...consubstantial with him. (W. H. Hudson, An Introduction to the Study of Literature).

৬. Quand je parle vons je non parle moi. (When I converse with you, I converse with me.—L. Cazamian, ibid).

৭. ...a loose sally of the mind, and irregular, undigested piece.

৮. The essayist is a lesser kind of poet, working in simpler and humbler materials, more in the gloss of life than in the glory of it.

The essence of the essay is soliloquy.
The essay is the reverie, the frame of mind in which a man says, in the words of the old song, 'says I to myself, says I.'

৯. ...it is a rugged road to follow a poet so rambling as that of the soul, to penetrate the dark profundities of its intricate windings. (Virginia Woolf, 'The Modern Essay' in The Common Reader).

১০. ...dispersed meditations, brief notes set down rather significantly than leisurely, grains of salt which will rather give an appetite than offend with satiety.

১১. The essay as a literary form...is peculiarly English...One of the glories of English Literature. (Encyclopaedia Britannica).
...the essay is regarded almost universally as an English thing. (Birketh, quoted by Cassell, op. cit.).

১২. He must masquerade. He cannot afford the time either to be himself or to be other people. He must skim the surface of thought...He must give us a worn weekly half penny instead of a solid sovereign once a year.

তথ্যসূত্র :

শশিভূষণ দাশগুপ্ত, বাঙ্গালা সাহিত্যের একদিক।
শিবনাথ শাস্ত্রী, রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ।
বুদ্ধদেব বসু, হঠাৎ আলোর ঝলকানি।
সুকুমার সেন, বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য।
অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ ও বাংলা সাহিত্য।
দেশ, সাহিত্য সংখ্যা, ১৩৯১।

Hugh Walker, The English Essay and Essayists.
Virginia Woolf, The Common Reader.
L. Cazamian, A History of French Literature.
W. H. Hudson, An Introduction to the Study of Literature.
S. K. Banerjee, Bankim Chandra : A Study of His Craft.
Elizabeth Dorly ed., English Essays.
Cumberledge ed., Several Essays.
Cassell, Encyclopaedia of Literature, Vol. I.
Encyclopaedia Britannica, Vol. 8 (1973).
Joseph Shipley, Dictionary of World Literature.

অসুখ

রামচন্দ্র প্রামাণিক

মাঝরাতে স্বামীকে ডেকে জাগালাম। এই, শুনছ? আবার চাগিয়েছে—অসুখটা!

ও শুয়ে-শুয়েই বলল, একটা অ্যাসপিরিন খেয়ে নাও। তারপর পাশ ফিরে শুতে-শুতে জিভে আফশোসের শব্দ তুলে বলল, অসুখে-অসুখে জেরবার হয়ে গেল জীবনটা।

কাঁদতে-কাঁদতেই উঠলাম। ছিঁচকাঁদুনি স্বভাব। কী করব! কে আর আছে আমার? ওই তো মানুষটা পাশ ফিরে শুল আর ঘুমিয়ে পড়ল। এক্ষুনি নাক ডেকে উঠবে। বেশি ডাকাডাকি করতেও সাহস হয় না। কে জানে আজও কামপোজ খেয়ে শুয়েছে কি-না।

ঢাউস বিছানার একপাশে পলটু তেরছা হয়ে ঘুমোচ্ছে মিঠুর গায়ে পা তুলে। একটা ঝাঁঝালো গন্ধ উঠছে। কী জানি হিশি করেছে কি-না। ঘরের এই ভ্যাপসা মলিন গন্ধতেই যেন বুকের ব্যথাটা বেড়ে যায়, দম বন্ধ হয়ে আসে।

কিন্তু কী করতে পারি আমি? বিয়ের পর একদিন রাস্তার মোড় থেকে টকটকে লাল গোলাপ কিনেছিলাম একগোছা। রেখেছিলাম ফুলদানিতে মাথার কাছে। ভেবেছিলাম শুতে এসে দেখে চমকে যাবে। ও বাবা, চোখেই পড়ল না ওর! গন্ধও নাকে গেল না! বিছানায় বসে গদির হিসেব দেখতে লাগল। শেষে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাতে বলল, গোরস্থান আর শ্মশান থেকে এনে এসব সস্তায় বিক্রি করে। আর কিনো না। বোঝো, কী কথায় কী বৃত্তান্ত!

কী বলব এমন মানুষকে? আর এমন কপালও হয়? এ কী অসুখ দিলে ঠাকুর, যা মারেও না সারেও না! মানুষটাকেও বা কী দোষ দেব? প্রথম-প্রথম খুব করত। বড়ো ডাক্তার তো বাদ রাখে নি কাউকে। কেউ কিছু ধরতে পারল না। যে ব্যথা সেই ব্যথা। আর এখন ওকেই বা কে ছাখে? আমাকেই বা কে?

ট্যাবলেট মুখে দিয়ে জল খেলাম ঢকঢক করে। দরজা খুলে ঝুলবারান্দায় এসে দাঁড়াই। আঃ! কী হাওয়া! রাত্রি কী শান্ত! সামনের ফুলেভরা নিম-

গাছে সুগন্ধ যেন থম মেরে আছে। ঠাকুর, ব্যথাটা যদি না থাকত। বেঁচে থাকাটা কেন যে এমন কষ্টের হয়ে গেল!

এই অসুখই তো তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে ছেলেবেলা থেকে। বাবা যখন বলল, ছেলে ভালো—তবে কলেজে পড়া শেষ করেনি, পৈতৃক ভুষিমালের ব্যাবসা বড়ো-বাজারে, পয়সা আছে,—মা নেচে উঠল। উঠবেই বা না কেন? এমন রোগগ্রস্ত মেয়েকে পার করা কি চাট্টিখানি কথা! পাখি-পড়া করে শেখাল, জামাই বশে না আসা অব্দি অসুখের কথা বলিস নে খবরদার। ব্যথা হলেও চেপে থাকবি।

বরের সাথে রওনা হওয়ার সময় মা নিয়মমতো আঁচল পেতে দাঁড়াল। মেজো খুড়ি হাতে একবাটি চাল দিয়ে বলল, মায়ের আঁচলে ঢেলে দে। বল্, তোমার ঋণ শোধ করে গেলাম। বলতে-বলতে কেঁদে ফেললাম। মাগো, মা, আমার যে অসুখ আছে। কে জানে আবার তোমার কোলেই ফিরে আসতে হয় কি-না! মা-ও কাঁদছিল। জানি, ওই একই কথা ভেবে।

না, ফিরতে হয় নি। মা সব্বাইকে বড়ো মুখ করে বলে, সুখেন আমার সোনার টুকরো ছেলে। কী দায়িত্ববোধ জামাইয়ের! তা ছাড়া কোনো বদভ্যাস নেই। সিগারেট অব্দি খায় না। কথা তো ঠিকই। এমন মানুষ কটি মেলে? না-ই বা দিল কলেজের পাশ। সবাই কি আর দেবুদার মতো হয়?

দোষ কারো নয়, আমার কপালের। নইলে বিয়ের পর তো ভুলেই গেছিলাম অসুখের কথা। মা যখন জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ রে, এখন আর ব্যথাটা হয়? তখনই তো মনে পড়ল, আরে! ব্যথা তো হয় নি অনেকদিন। মা বলল, তারকেশ্বরে পুজো দিয়ে আসব। মানত করেছিলাম। বাবা মুখ তুলে তাকিয়েছেন। আমার মন বলেছিল, বিয়ের জল পড়লে সেরে যাবে।

মায়ের মন তো ঠিকই বলে। কিন্তু আমার মনে যে পাপ। নইলে এমন স্বামী পেয়েও বুকের সেই ফাঁকা ফাঁকা ভাবটা গেল না? একা মানুষের ব্যাবসা। তার কি বউয়ের আঁচল ধরে থাকলে চলে? সারা দিনে এত টাকাপয়সার লেনদেন, এত লোক ঠকিয়ে নেবার জন্যে মুখিয়ে আছে। তার কি ঘরে বসে দুদণ্ড খোশ-গল্প করার বা দুদিন খুশিমতন ঘুরে বেড়ানোর সময় আছে? আর, ভালোমানুষের কপালেই না শতেক দুর্ভোগ! মুহুরিমশাই তো বলে, কর্তা এমন ভালো-মানুষ বলেই না মা এত সমস্যা। সবই বুঝি, মা। কেন যে তবু মনটা এমন আকুলিবিকুলি করে।

পলটু-মিঠু হওয়ার পর দেখলাম, সেই অসুখটা যেন আবার মাথা চাড়া দিচ্ছে। ঘরে তিষ্ঠোতে পারি নে। শাশুড়ি স্বর্গে গিয়েছে, ননদ বিয়ের পর শ্বশুরবাড়ি। দেওর পটের বিবি বিয়ে করে আলাদা সংসার পেতেছে লেকটাউনে। ব্যাবসা ওর আলাদা প্রথম থেকে, এখন ফুলছে হু হু করে। এ পাড়ায় তার স্ট্যাটাস থাকে না। ফাঁকা বাড়ি আমাকে গিলতে আসে। মানুষটা খেটেখুটে এসে রাত জেগে হিসেব মেলায়। তারপর পাশে পড়ে থাকে ময়দার বস্তার মতো। নাকডাকার শব্দে আমার গা ছমছম করে।

তোমার চোখেও ধুলো দিয়েছি মা, বুঝতে পার নি। বড়োপিসির দেওরের ছেলে দেবুদা আসত মনে আছে? মোটা চশমা চোখে, এখন যে দিল্লীতে থাকে? কেন যে অত মিশতে দিয়েছিলে! সেবারই হঠাৎ বুঝলাম, দেবুদাকে না দেখতে পেলে বড়ো কষ্ট হয়, দেখলে আরো। দেবুদা যখন বলে, সুরো, একগ্লাস জল আন দেখি; কিংবা বলে, দেশলাই আন তো রান্নাঘর থেকে, মামি যেন না জানে; আমার বুক টিপটিপ করে। দেবুদা একদিন আমাকে খেপানোর জন্যে জোর করে ধরে গাল টিপে হাঁ করিয়ে মুখের মধ্যে ঢেলে দিল ওর মুখভরতি সিগারেটের ধোঁয়া। আমার দম তখন বন্ধ হয়ে আসছিল, মা।

সেদিন দুপুরে মেজোখুড়ি আর বীণাদিকে নিয়ে তুমি ঢেঁকিশালে চিঁড়ে কুটছিলে। বিছানায় আড়

হয়ে শুয়ে দেবুদা একটা ইংরেজি বই পড়ছে। কী হাসির বই বুঝি সেটা। পড়ছে আর মিটিমিটি হাসছে বাচ্চা ছেলের দেয়ালা করার মতো। কী জানি কেন, দেবুদার মুখের দিকে তাকিয়ে-তাকিয়ে হঠাৎই আমি কেঁদে ফেললাম।

কান্নার শব্দে মুখ তুলে তাকাল দেবুদা। কী রে সুরো, কাঁদছিস কেন? আমি তাও কাঁদছি মুখ গুঁজে। দেবুদা উঠে এসে থুতনিতে হাত দিয়ে মুখ তোলার চেষ্টা করতে-করতে বলল, কী হল রে? ব্যথা করছে?

বললাম, হ্যাঁ।

কোথায়?

কী জানি কেন, বুকের এক জায়গায় দেখিয়ে বললাম, এখানে। আর ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলাম।

কেন যে বুকে বললাম? আমি কি ভেবেছিলাম দেবুদা হাত ধরে বিছানায় তুলে শুইয়ে দেবে? তারপর আদরভরা গলায় বলবে, কী রে সুরো, কষ্ট হচ্ছে? আর আলতো করে হাত বুলিয়ে দেবে আমার ব্যথার জায়গায়?

দেবুদা কিন্তু এসব কিছুই করল না। বাইরের দাওয়ায় গিয়ে চেঁচিয়ে মা আর মেজোখুড়িকে ডেকে আনল। বলল, সুরোর বুকে একটা ব্যথা করছে। এটা ভালো নয়। এক্ষুনি ডাক্তার দেখানো দরকার।

ডাক্তার বলল, কেমন মনে হয়, মা?

যা মনে হয় বললাম কাঁদতে-কাঁদতে। বুকটা ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। মনে হয় দম বন্ধ হয়ে যাবে।

আর?

বুকের ভেতর ধকধক করে। মনে হয় ঢেঁকির পাড় পড়ছে।

গম্ভীর ডাক্তার আরো গম্ভীর হয়ে বলল, কলকাতায় নিয়ে গিয়ে বড়ো ডাক্তার দেখান।

এসব তাহলে অসুখ? হায় ভগবান, কেন আমাকে এমন অসুখ দিলে? দেবুদা গো, কেন তুমি আমাকে অমন করে ডাকতে? আমার মনে যে পাপ ঢুকল, আর তাই না এমন অসুখ এল!

কলকাতায় বড়োপিসির বাড়িতে থেকেই চিকিৎসার ব্যবস্থা। বাবা আর দেবুদা সঙ্গে নিয়ে হাসপাতাল-ডাক্তার করে। কী হবে ওষুধে? অষ্ট-প্রহরই তো আমার বুকে ঢেঁকির পাড় পড়ছে। আমাকে বাঁচাও দেবুদা, আমি আর ডাক্তারের কাছে যাব না।

মেয়েজামাই নিয়ে মা তারকেশ্বরে পুজো দিয়ে এল। কিন্তু পাপের মন যাবে কোথায়? ঘরে ছটফট করি, বারান্দায় দাঁড়াই। মনে হয় লাফিয়ে রাস্তায় পড়ে ছুটে কোথাও পালিয়ে যাই। কার সাথে যাব? দোকানের কর্মচারী অসিত বলে, আমিই নিয়ে যাই চলুন। সুখেনদার পকেট কেটে গাড়িভাড়াটা যোগাড় করে নেব।

তোমার বউ ঝাঁটা নিয়ে পিটিয়ে দিয়ে যাবে তখন, আমি বলি। ওর তখন বিয়ের দেখাশুনা চলছে।

রাত্রে স্বামীকে বলি, সাতসকালে বেরিয়ে যাও। বাড়িঘর কি পাড়ার লোক দেখবে?

কেন? অসিত বাজার করে দেয় নি? যা দরকার ওকেই বোলো।

যা দরকার ওকেই বলব? কী কথার ছিরি! আমি ঝাঁজিয়ে উঠি।

সব কথা অমন বাঁকিয়ে ধর কেন?

স্বভাব যে। আর, এই তো রাত্রি দশটায় ফিরলে। এটা কি মেসবাড়ি?

ব্যাবসাদার মানুষ, খেটে খেতে হয়। কী করব বলো!

রবিবার তো দোকান নেই। সেদিন বাইরে কিসের কাজ?

আদায়পত্র নেই? সবাই কি বাড়ি বয়ে টাকা দিয়ে যায়?

তাহলে বাপু ব্যবসাদার মানুষের বিয়ে করা উচিত হয় নি। মেসে থাকলেই পারতে।

তুমিও বাপু চশমা-অলা ব্রাইট চোখের কাউকে

বিয়ে করলে পারতে। দশটা-পাঁচটা অফিস করত আর বউয়ের আঁচল ধরে ঘুরত।

বিয়ের পর একদিন গাঁইয়ার মতো বলেছিলাম, আমার পিসতুতো দাদা মোটা ফ্রেমের চশমা পরে। চোখগুলো বেশ ব্রাইট লাগে। তুমিও পর না কেন! সেই খোঁটা দিল। লোকটা কি সহজ?

এইসব ঝগড়াঝাঁটিতে বলাই হল না, বাড়িতে একা-একা ভালো লাগে না গো। পায়ে পড়ি লক্ষ্মীটি, তাড়াতাড়ি ফিরো। কী বলতে গিয়ে কী বলে ফেললাম। কদিন ধরে আধমরা হয়ে আছে মানুষটা। সেলস ট্যাক্সের কী সব গোলমাল চলছে। সেদিনই সকালে উকিলবাবু এক বানডিল টাকা নিয়ে গেছে। মুহুরিমশায় বলে, বাবু যেন কী! টাকা নিতে অফিসারের হাত কাঁপে না, হাত কাঁপে বাবুর! সোফায় বসে মানুষটা যখন টাকা গুনছে, চা দিতে গিয়ে পষ্ট দেখেছি, আঙুলগুলো কাঁপছে।

অসিত এসেছে। দোকান সামলিয়ে বাজার নিয়ে আসতে ওর বেলা হয়ে যায়। তাড়াতাড়ি এখানে দুপুরের খাওয়া সেরে পল্টুর বাবার খাওয়া নিয়ে দোকানে ফেরে। সেদিন খেয়ে সোফায় বসে সিগারেট টানছে। আর বলছে, দাদার মতো ভালোমানুষ নিয়ে কাজ চলে না বউদি। ইনকামট্যাক্সের লোক এসেছে সার্ভে করতে। অন্যেরা একপাশে ডেকে নিয়ে দু মিনিটে মিটিয়ে নিচ্ছে। আর দাদা তাদের খাতাপত্র বোঝাতে লেগে গেল। শেষে মুহুরিমশাই সিন্দুক খুলে ভেতরে ডেকে নিয়ে তবে মেটাল। দাদা এমন ঘামতে লাগল যে আমি ভাবি, স্ট্রোক না হয় শেষে।

ভালোমানুষ না হলে তুইও এমন মাথায় উঠিস! আগে আমার দিকে চোখ তুলে তাকাতে পারত না। এখন পা নাচিয়ে সিগারেট খায়। কে জানে কী বিপদ আবার বাধিয়ে বসেছে মানুষটা। পাশে শুয়ে থাকে, উশখুশ করে। বুঝি, জেগে আছে। তারপর একদিন খেয়াল করলাম, ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার ভরতি ট্যাবলেট। কী ব্যাপার? না, ঘুমের ওষুধ।

বলা নেই, কওয়া নেই, অসিত একদিন রবিবারের সকালে এসে হাজির। বলল, চা খাওয়াও। রান্নাঘরে ঢুকে বলল, একটু ভালো কিছু দিও। মিষ্টি আছে তো ফ্রিজে?

হ্যাঁ। অসিত আজকাল এরকম করে। রান্নাঘরে ঢুকে পড়ে। দেখায় যেন ঘরের লোক।

খানিকক্ষণ পরে একশ টাকার একটা বানডিল নিয়ে চলে গেল। দশ হাজার টাকা।

অসিতের কদর বেড়েছে বুঝতে পারি। বরাবর মুহুরিমশায়ই টাকাপয়সার লেনদেন করে। এই প্রথম অসিতকে দিয়ে এতগুলো টাকা পাঠাল।

ওমা, পরে শুনি কী—এ টাকা মহাজনের জন্যে নয়। অসিত ধার নিল।

সে কী? ধার শোধ করবে কী করে?

করে দেবে। মানুষটা এড়িয়ে যায়।

বিড়া না হৃদয়পুরের কোথায় কোন্ খাপরার বাড়িতে থাকে অসিত। সেখানে জমি কিনবে। এর আগে এক-দুশয়ের বেশি যে আগাম চাইতে সাহস পায় নি, এক ধাক্কায় সে নিল দশ হাজার টাকা?

ও বলে, তুমি এসব ঝামেলায় মাথা ঘামিও না। ঢাকুরিয়ার জমিটায় অসিতকে ভাড়াটে দেখিয়েছি। এখন ও আমাকে ফাঁসিয়ে দিলে ধনেপ্রাণে মরব।

আমি থ হয়ে যাই, তুমি কি পাগল? জমি কিনলে উটকো লোককে ভাড়াটে দেখিয়ে?

আরে, ভাড়াটে না দেখালে অতটা জমি ওই দামে দলিল হয়? তাহলে পুরো টাকাতেই দলিল করতে হত।

করলে না কেন? টাকা তো তোমার কম লাগল না। এসব ঝামেলায় মরতে গেলে কেন?

কী আশ্চর্য। এমন শান্ত মানুষ রুখে প্রায় মারতে এল। পুরো টাকায় দলিল করতে চাইলে জমি নাকি হাতছাড়া হয়ে যেত। আইনই নাকি এরকম। জমির মালিক চেয়েছে অর্ধেক টাকায় দলিল করে বাকি অর্ধেক নগদে নিতে। এতে কী সব ট্যাক্সের সুবিধে

হবে চুপক্ষেরই। আর তাই না-কি অসিতকে ভাড়াটে দেখানো।

ও হরি! তাই! অসিতও তাহলে বুঝেছে এ টাকা ধার নয়। "ঘুষ" কথা মুখে আনতে যার গলা শুকিয়ে যায়, সেই মানুষ নিজের কর্মচারীকে ঘুষ দিল?

না দিয়ে উপায় কী? মুহুরিমশায় বলে। অ্যাকুই-জিশনে নতুন যে অফিসার এসেছে সে টাকা খায় না। এ জমি না-কি সামলানো যাবে না, সরকার নিয়ে নেবে। শুধু তাই নয়। দেনা শুধতে ব্যাবসা-বসতবাড়ি সব না চলে যায়। তারপর কী কাণ্ড যে চলল। কে যে মানুষটার মাথায় ঢুকিয়েছিল জমি কিনে উঁচু ফ্ল্যাটবাড়ি করে বিক্রি করলে দশগুণ লাভ। ঢাকুরিয়ার জমি কিনেছে এককাঁড়ি টাকা ধার করে। প্রতিমাসে সুদ গুনছে। ঘুম হয় না তো কামপোজ খায়। তাতে কাজ না হলে নাইট্রোশন খায়। তাতেও না হলে আছে, আরো কড়া ওষুধ আছে। সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। ডাক্তারে আজ প্রেসারের ওষুধ দেয় তো কাল দেয় শুগারের। শেষে বলল, আপনার ডিপ্রেশন হয়েছে। ওমুকের কাছে যান, অ্যাপয়েনটমেনট করিয়ে দিচ্ছি। গিয়ে দেখি, ওমা, আমি যাব কোথায়? মানুষটাকে পাগলের ডাক্তারের কাছে পাঠিয়েছে গো।

মানুষটাও অসুখে পড়ে গেল। বুক ধকধক করে, মাথা ঘোরে, হাতে-পায়ে বল পায় না। কী অসুখ? কেউ ধরতে পারে না। হাজার বত্তির হাজার পথ্যি। যে কে সেই। আমার অসুখই যেন ফিরে এল ছদ্মবেশে।

সেদিন দুপুরে পলটু স্কুল থেকে ফেরে নি তখনো। মিঠু ঘুমুচ্ছে পাশের ঘরে। নিচের কলতলায় বুঁচির মার বাসন মাজার শব্দ উঠছে। খেয়ে উঠে সোফায় বসে অসিত পকেট থেকে প্যাকেট বের করল, আর সুন্দর একটা লাইটার। নতুন। আগে দেখি নি। যে কেউ বুঝবে, অসিতের হাতে এখন পয়সা আসছে।

বলল, দাদা আজ গদিতে আসে নি।

জানি। সাতসকালে স্নান সেরে নোটের তাড়া পকেটে পুরে ঘামতে-ঘামতে বেরিয়েছে। টেবিলে বসে ভাত নেড়েচেড়ে উঠে গিয়েছে, খেতে পারে নি।

অসিত বলল, আজ অফিসারকে ভেট দিতে হবে, বুঝলে বউদি। সুখেনদার আজ অনেক খসবে।

আমি চমকে উঠি। সেদিন উকিলবাবু আর মুহুরিমশাই এসে অনেকক্ষণ ফিসফাস করেছে। অফিসার বদলি হয়ে নতুন একজন এসেছে। এর আবার নাকি শুধু টাকায় মন ওঠে না। উকিলবাবু বলছিল, আপনি ভাববেন না। সব ব্যবস্থা আমি করব। এসব আজকাল জল-ভাত। কী হল? ঘাবড়ে গেলেন নাকি?

ওঃ! মানুষটা তাই কাল সারারাত ঘুমোয় নি! আমি কখনো ঘুমিয়েছি, কখনো জেগেছি। মুখে তো কিছু বলে না। যেন কোনো কিছুতেই তাপ-উত্তাপ নেই। পাশে শুয়ে থাকে, তবু মনে হয় চিনি নে। আমি যে একা সেই একা।

হঠাৎই আমার কান্না এল। অসিত ভাবাচ্যাকা খেয়ে উঠে এসে বলল, কী হল বউদি? কষ্ট হচ্ছে?

হ্যাঁ।

কোথায়?

কান্না চাপতে-চাপতে কেন জানি নে বুকের ওপর সেই জায়গাটাই দেখালাম।

কিসে যে কী হল, অসিত জোরে নিঃশ্বাস ফেলতে-ফেলতে বউদি বলে জড়িয়ে ধরল। আঃ! সেই সিগারেটের গন্ধ! ছাড়ো, ছাড়ো। তোমার দাঁতে কি ছুরির ধার!

বাচ্চার মা হয়ে শরীর ভারি হয়েছে কত! তাও কেমন অনায়াসে তুলে নিয়ে এল বিছানায়। আর তখনই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ উঠল। বুঁচির মা আসছে।

সেদিন মানুষটা ফিরল একটু রাত করে। ঝড়ের শেষের আকাশের মতো মুখ। শান্ত, কিন্তু মেঘ লেগে আছে এ-কোণে ও-কোণে। তাড়াতাড়ি খাবার তৈরি

করতে বলে বাথরুমে ঢুকল। স্নান করবে।

হায়রে আমার বিড়ি-সিগারেট-না-ছোঁয়া স্বামী। কোন্ হোটেলের কোন্ ঘরে কাকে না কাকে ঢুকিয়ে দিয়ে এসে স্নান করছে। কতক্ষণ ধরে স্নান করলাম তো আমিও। ময়লা কি এত সহজে যায়?

সেদিন রাতে ঘুমের মধ্যে জড়িয়ে ধরে মুখে মুখ দিতেই ও বুঝেছে আমার মুখে সর্দির মতো চটচট করছে কান্না।

কী হল?

ব্যথা করছে। ভীষণ ব্যথা। দম বন্ধ হয়ে আসছে। মাগো!

ভয় পেয়ে লাফিয়ে উঠল ও। বুঁচির মাকে ডেকে তুলল নিচের ঘর থেকে। মালিশ-সেঁক-জল-পাখা। চলল সারারাত। ডাক্তারের পর ডাক্তার এল, ওষুধের ওপর ওষুধ। কিছুতে কিছু হল না। জানি, হবে না।

কী হবে তাও জানি। ঘাড়-মাজা ফাটবে, হাতে পায়ে যেন বল পাব না। ফাঁকা-ফাঁকা লাগবে। মনে হবে পালিয়ে যাই। আর গর্ত থেকে মুখ বাড়াবে পাপ। তারপরই এই ব্যথা জানান দেবে। একা পালানো অত সহজ নয় হে। আমি আছি।

ব্যথা কমে এসেছে। অ্যাসপিরিনে না নিমপাতার ঠাণ্ডা হাওয়ায়—কে জানে! আগামী বেশ কিছুদিন মাছের কাঁটার অস্বস্তির মতো মিলিয়ে যেতে-যেতে জেগে থাকবে আজকের ব্যথার স্মৃতি। তারপর একদিন হঠাৎ ককিয়ে উঠে ডাকব, ওগো শুনছ? আবার চাগিয়েছে। অসুখটা।

পাশ ফিরে শুতে-শুতে ও বলবে, অ্যাসপিরিন খাও। কামপোজভাঙা বিরক্তি ছড়িয়ে বলবে, অসুখে-অসুখে জেরবার হয়ে গেল জীবনটা।

হিতোপদেশ এবং একটি শিশু

ভালোমন্দজ্ঞান কি শেখাব?

মহাশ্বেতা চৌধুরী

রিকু সাধারণ অবস্থার, সাধারণ বুদ্ধির, সাধারণ বাবা-মার একটি সন্তান। তার চারিপাশে দারিদ্র্য, বঞ্চনা, লোভ, অশিক্ষার ছড়াছড়ি। অন্য পাঁচজনের মতো সেও আরও ভাইবোনদের সঙ্গে স্কুলে ভরতি হয়, নিরানন্দ পরিবেশে শিক্ষার নামে জ্ঞানের হজমিগুলি গলাধঃকরণ করে কিছুদিন (এখনও আমাদের দেশে স্কুল-ড্রপআউটের সংখ্যা নগণ্য নয়) ততোধিক অসুখী শিক্ষকের কাছ থেকে। বড়ো শহরের ডিসনে-ল্যানডের ধাঁচে গড়া ঝকঝকে প্রাথমিক স্কুল আর স্বাস্থ্যে-সৌন্দর্যে ঝলমলে হাসিখুশি শিক্ষিকা সবার জন্যে নয়। উচ্চবিত্ত এবং/অথবা উচ্চশিক্ষিত সমাজ-এর মুষ্টিমেয় সন্তানেরাই তার নাগাল পায়। আমাদের রিকু ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের প্রতিনিধি। তার বাসস্থান, খাওয়াদাওয়া, আমোদপ্রমোদ—কোনো-কিছুই আনন্দকর নয়। দিনযাপনের ক্লান্তিতে তার বাবা-মাও শ্রান্ত, সদাই বিরক্ত, সহজেই তাঁদের ধৈর্য-চ্যুতি ঘটে। টিভির পরদায় দেখা হাসিখুশি বাবা-মার মতো সন্তানকে দেখলেই তাঁদের মুখে আলো জ্বলে ওঠে না।

এই পরিবেশের মধ্যে নানা বাধাবিপত্তির মধ্য দিয়ে রিকু "বড়ো" হয়ে ওঠে। অনেক কিছু শিখেও ফেলে—কিছু ভালো, কিছু মন্দও। শেষেরটা পরিমাণে কিছু বেশিই, কারণ মানুষ যা দেখে তার প্রতিফলন চরিত্রে পড়বেই কিছুটা। যে সমাজে দারিদ্র্য, বঞ্চনা, হিংসাদ্বেষ বেশি, সে সমাজে রিকুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। অনেক পণ্ডিত এদের আচরণের ব্যাখ্যা দেন সামাজিক বৈষম্য, অর্থবণ্টনব্যবস্থার বৈষম্যের উল্লেখ করে। "সমাজের শিকার" এ প্রসঙ্গে বহু-ব্যবহৃত একটি বুলি। হত্যাকারী, গুণ্ডা, ধর্ষণকারীরা সবাই—এ ব্যাখ্যায় সমাজব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফসল। ব্যাখ্যা যাই হোক, দুর্নীতি সমাজের পক্ষে ক্ষতিকারক। দুর্বৃত্তের সংখ্যা ক্রমবর্ধনশীল হলে যে-কোনো সমাজ-ব্যবস্থাই টলমল করে—জীবন থেকে শান্তি আর নিরাপত্তা যায় হারিয়ে, রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ বিপদ

ঘনিয়ে আসে। পণ্ডিতদের তাই টনক নড়েছে কী করে আবার অপস্রিয়মাণ মূল্যবোধকে ফিরিয়ে আনা যায়, অসংখ্য পরিণতবয়স্ক রিকুকে সামাজিক মঙ্গলের পথে আবার চালিত করা যায়। উপায় কী? বয়স্ক ব্যক্তিকে হিংসা আর অন্যায়ের পথ থেকে ফেরানোর চেয়ে সহজ হল দুর্নীতির মূলকে কুঁড়িতেই বিনাশ করা। কে না জানে প্রতিরোধ প্রতিকারের চেয়ে কার্যকর? সুতরাং ছোটোবেলাতেই শেখানো ভালো কী উচিত, আর কী অনুচিত। বাবা-মার ওপর ভরসা না রেখে রিকুর মনে স্কুলপাঠ্যের মধ্যেই বীজ পুঁতে দাও ভালো-মন্দের। তবেই সে ক্রমে ক্রমে একটি মঙ্গলফলপ্রসূ বৃক্ষ হয়ে উঠবে, তার ফুলে ফলে সমাজ-জীবনের ডালি ভরে উঠবে। এ প্যাটার্ন নতুন নয়। ক্যাথলিক ধর্মের অনুশাসন তাদের স্কুলপাঠ্যের একটি বিষয়। সেই নিয়মকানুনের পেষণে ক্যাথলিক স্কুলের স্নাতকরা পরবর্তী যুগে শৃঙ্খলাবদ্ধ, ভদ্র নাগরিক হয়ে ওঠে। আশ্চর্যের বিষয়, ব্যক্তিস্বাধীনতার ধ্বজাধারী জন স্টুয়ার্ট মিলও শিক্ষাব্যবস্থায় নৈতিক নিয়ম প্রবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর শিক্ষানীতি যথেষ্ট পেটারন্যালিসটিক, যতদিন শিশু বড়ো না হয় ততদিন ঘরে বাবা-মা, স্কুলে শিক্ষক তাকে নানা শাসনের চাপে গড়েপিটে বড়ো করবে। সেখানে যেন কোনো ফাঁক না থাকে। এইরকম কড়া শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সে যখন পরিণত বয়সে পৌঁছবে, তখন অবশ্য আর কোনো অনুশাসনের প্রয়োজন নেই। শিক্ষাপ্রাপ্ত একজন পরিণতবয়স্ক নাগরিক হিসেবে তখন সে স্বাধীন ব্যক্তি। সর্ববিষয়ে তার অধিকার আর মতই চূড়ান্ত। অবশ্য যতক্ষণ পর্যন্ত না সে অন্যের অনুরূপ স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করে।

সনাতন মূল্যবোধের পুনর্বাসন?

বর্তমান ভারতেও এ ধরনের চিন্তাভাবনা হচ্ছে। আমাদের পূর্ববর্ণিত রিকুকে কী করে সমাজের উপযোগী সুস্থনীতিসম্পন্ন ব্যক্তিতে পূর্ণায়িত করা যায়, তার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থার কথা ভাবা হচ্ছে। হিংসাত্মক মনোভাব, দুর্নীতি, কর্তব্যপরায়ণতার অভাব প্রত্যেকেই উপলব্ধি করছে সমাজের বিভিন্ন স্তরে। সনাতন মূল্যবোধের অবক্ষয়কেই অনেকে আজকের এই অবস্থার কারণ বলে মনে করছেন। আধুনিক জীবনে অপস্রিয়মাণ ন্যায়-অন্যায়বোধকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার উপায় হিসেবে অনেকেই মনে করছেন শিক্ষাকার্যক্রমে নীতিশিক্ষার প্রবর্তন শিশুর সংবেদনশীল মনকে এই অবক্ষয় থেকে বাঁচাতে পারবে। নানা স্তরে আলোচনা-প্রবন্ধ-বিতর্কের মধ্য দিয়ে বিষয়টি নিয়ে চর্চা হচ্ছে। বর্তমান শিক্ষানীতিবিষয়ক "চ্যালেনজ অব এডুকেশন" নামক দলিলেও নীতি-শিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান রয়েছে। প্রশ্ন হচ্ছে, স্কুলপাঠ্যক্রমে নীতিশিক্ষা কার্যকর হবে কিনা, এবং আদৌ নীতিশিক্ষা থাকা উচিত কিনা। দুটি প্রশ্নই আরো অনেক রকম দ্বিধার অবতারণা করে। কার্য-কারিতা সম্পর্কে নানারকম প্রস্তাব করা যায় যাতে এ কার্যক্রম নিশ্ছিদ্রভাবে সফল হয়। এইসব বিভিন্ন প্রস্তাব কিন্তু দ্বিতীয় প্রশ্নটির অবকাশ রাখে না। কারণ, কার্যকর করা যায়—একথা ভাবা মানে ধরে নেওয়া হচ্ছে, নীতিশিক্ষা বাল্যশিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হওয়া উচিত। এ প্রবন্ধে আমি এ দুটি প্রশ্নেরই (এবং তার সম্ভাব্য উত্তর) বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করব। আমার মনে হয়, সমস্যা যদিও আছে, তবু নীতিশিক্ষা কার্যকর করা হয়তো যায়। কিন্তু তাতে শেষ পর্যন্ত লাভের চেয়ে ক্ষতির পরিমাণই বেশি হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রথমে কার্যকারিতার প্রশ্নটিই ধরা যাক। কেননা এটিই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে চিন্তার বিষয়রূপে দেখা দিয়েছে। অর্থাৎ নীতিশিক্ষা পাঠ্যক্রমের সঙ্গে থাকা উচিত—এ মতই বহুলভাবে সমর্থিত মত। কিছুদিন আগে (অগস্ট ১৯৮৬) কলকাতার রামকৃষ্ণ মিশন ইনসটিট্যুট অব কালচার-এর উদ্যোগে কয়েকদিন-

ব্যাপী এক আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হল মূল্যবোধ-শিক্ষার ব্যাপারে। তাতে শিক্ষাবিদ, দার্শনিক, সমাজতাত্ত্বিক অনেকেই যোগ দিয়েছিলেন। আগেই যে কথা বলেছি, আজকের ভারত তথা সারা জগতে অপ্রিয়মাণ মূল্যবোধের প্রবণতায় অনেকে শঙ্কিত বলেই নীতিশিক্ষার অবতারণা ব্যাপারটি প্রয়োজনীয় বলে মনে হচ্ছে। বর্তমান সময়ে মানুষ যদি আগের চেয়ে আরো শান্তিপ্রিয়, কর্তব্যপরায়ণ, সৎ হত, তাহলে নীতিশিক্ষার প্রয়োজন কেউ অনুভব করতেন কিনা জানি না। যাই হোক, সমাজসচেতন সংবেদন-শীল ব্যক্তিমাত্রেই পৃথিবীর হিংসাপরায়ণতা, কর্তব্যে ফাঁকি, ক্ষমতার লোভ ইত্যাদিতে ক্ষুব্ধ, এবং তার দূরীকরণে নানারকম পন্থা অবলম্বনের কথা ভাবছেন। তার একটি প্রস্তাব হল নীতিশিক্ষার প্রবর্তন।

সমস্যার কথাও উঠেছে অনেক। তার মধ্যে প্রধান হল*: শিশুদের ভালোমন্দ শেখানো যাবে কী করে যদি তারা বড়োদের মধ্যে নানারকম অন্যায়, মিথ্যাচার, মিথ্যাভাষণ, প্রতিহিংসা দেখে? চারিদিকে নৈতিক অবক্ষয়ের চিত্র যে সমাজে সেখানে নীতিশিক্ষা দিয়ে শিশুদের "দেবশিশু"তে পরিণত করা মুশকিল বলে মনে করেন কেউ-কেউ।

এই বক্তব্যের অন্তর্নিহিত যুক্তিবত্তা নিঃসন্দেহে গ্রহণযোগ্য। অর্থাৎ একথা অনস্বীকার্য যে সমাজের পরিণতবয়স্ক যেসব ব্যক্তি সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ক্ষমতার অধিকারী, তাঁরা যদি নানারকম নৈতিক-অবনতির প্রতিভূ হন, তাহলে বক্তৃতা উপদেশবাণী নীতিশিক্ষাশাস্ত্রের অন্তঃসারশূন্য বুলি আউড়িয়ে কী করে শিশুদের অন্যায় থেকে দূরে থাকার শিক্ষা দেওয়া যায়? দেওয়া গেলেও সেকথা তারা সহজে গ্রহণ করবে কেন? সনাতন মূল্যবোধের পুনরুত্থান কি আমাদের নৈতিক সামাজিক অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে? সম্ভবত। অন্তত ন্যাশনাল কাউনসিল ফর এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যানড ট্রেনিং-এর কোনো-কোনো ইস্তাহারে তার প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত রয়েছে। তাদের তালিকার একটি দৃষ্টান্ত ধরা হাক। 'পিতামাতার আজ্ঞা পালন বা আনুগত্য' ('filial obedience', তালিকায় ৪৬নং স্থান) এমন একটি শিক্ষণীয়-পালনীয় কর্তব্য। সুনন্দ সান্যাল তাঁর পূর্বকথিত প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে বলেন যে, বিদ্যাসাগরের অন্যান্য চারিত্রিক গুণের মূলে রয়েছে তাঁর এই সনাতনধর্মের প্রতি বিশ্বাস। বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি সর্বজনবিদিত, কিন্তু তাঁর অন্যান্য চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং সামাজিক কার্যাবলীও কারো অজানা নয়। বিলাসহীন অনাড়ম্বর জীবনযাত্রা, সৎসাহস, দয়া, পরোপকারিতা, নারীর সামাজিক অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়াস এবং আরো অনেক অনুরূপ ক্ষেত্রে তাঁর দৃষ্টান্ত অমর হয়ে থাকবে। 'বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি অতুলনীয় ছিল' একথা যেমন সত্য, তেমনি সত্য তাঁর অন্যান্য উক্ত গুণ ও সামাজিক অবদান। কিন্তু তার থেকে প্রমাণিত হয় না যে দ্বিতীয়টি প্রথমটি থেকেই উদ্ভূত। অর্থাৎ 'মাতৃভক্তি' (যা 'filial obedience' বলে NCERT দ্বারা স্বীকৃত) থাকলেই যে 'দয়া', 'পরোপকারিতা', 'সৎসাহস' ইত্যাদি গুণও প্রস্ফুটিত হবে, তা ঠিক নয়। 'মাতৃভক্তি', 'দয়া', 'সমাজসংস্কার', 'নারীশিক্ষার প্রবর্তন' ইত্যাদি সমাবেশ হয়তো হয়েছে বিদ্যাসাগর এক অসাধারণ এবং মহান ব্যক্তি ছিলেন বলে। প্রথমটি থেকে তাঁর মহৎ অবদান নিঃসৃত হয়েছে, একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। বিদ্যাসাগরের মতো মাতৃভক্তি আছে এমন ব্যক্তির যে তাঁর মতো অন্যান্য মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বা সামাজিক অবদান থাকবে, তা ঠিক নয়। আমাদের পূর্বকথিত রিকুর হয়তো বাবা-মার প্রতি বাধ্যতা অতুলনীয়—কিন্তু এও হতে পারে যে তার মতো স্বার্থপর, ভীরু বা মিথ্যাবাদীও সহজে চোখে পড়ে না।

* সুনন্দ সান্যাল Values We Preach (The Statesman, June 9-10, 1984) প্রবন্ধে এই ধরনের অসুবিধার উল্লেখ করেছেন।

নৈতিক সংশয়বাদ নয়

সমাজের বিভিন্ন স্তরে অন্যায়, লোভ, হিংসার প্রভাব দেখে যদি এমন অবস্থায় নীতিশিক্ষা নিরর্থক মনে হয় তাহলে একথা কারো মনে হতে পারে যে শিশুদের "দেবশিশু" করে তোলা তখনই সম্ভব যখন তার চারিপাশে যেসব পরিণতবয়স্ক আছে, অর্থাৎ বাবা, মা, শিক্ষক, নেতা এইসব ব্যক্তিরা নিজেরা ন্যায় বা মঙ্গলের প্রতিমূর্তি হন। অন্যপক্ষে নৈতিক সংশয়-বাদী (যিনি ন্যায়-অন্যায় বিচারের কোনো মানদণ্ড আছে বলে স্বীকার করেন না) প্রশ্ন তুলতে পারেন অন্যদিক দিয়ে। যদি কোনো নৈতিক মানদণ্ডই নিঃসংশয় না হয়, তবে সবার কাছে সমান কোনো নৈতিক মূল্যও নেই। সব আচরণের নৈতিক মূল্যই বিশেষ ব্যক্তি- বা সমাজ-নির্ভর। সুতরাং এঁদের মতে এ কথা বলা যায় যে, নীতিশিক্ষা দেওয়া অসম্ভব। কারণ, কোন্‌টি ভালো আর কোন্‌টি মন্দ তারই কোনো সমাজনিরপেক্ষ বিচার করা যায় না।

এই দুটি বিকল্পই একেদশদর্শী চিন্তার ফল এবং বিভ্রান্তিকর। উভয় ক্ষেত্রেই তথ্যগত জোর নেই। কোনোটি নৈতিকভাবে বাঞ্ছনীয়ও নয়। পূর্ববর্ণিত অসঙ্গতির সমস্যা ছাড়াও আর-একটি সমস্যা হল কী করে ন্যায়-অন্যায়কে বিধিবদ্ধরূপে শিক্ষাক্রমে স্থান দেওয়া যায়। এটা যে শুধু কঠিন সমস্যা তা নয়, নীতিগতভাবেও ঠিক নয়। মূল্য কাকে বলে, তার গভীর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ না করেও একটি অতি সহজ ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে, বিভিন্ন আচরণের প্রতি আমাদের মনোভাবের মাপকাঠি দিয়ে। যে-কোনো নৈতিক ক্রিয়ার (যার ভালোমন্দ বিচার করা যায়) প্রতি আমাদের মনোভাব দু-রকম হতে পারে: সদর্থক ও নেতিবাচক। আমরা সৎসাহস ও কর্তব্যপরায়ণতাকে অনুমোদন করি আর হত্যা কিংবা তঞ্চকতাকে অনুমোদন করি না। এ কথা অনস্বীকার্য যে নৈতিক মূল্য সামাজিক-আদর্শের ওপর নির্ভরশীল—সামাজিক ঐতিহ্যের ধারা বেয়ে তা আমাদের হাতে পৌঁছায়। কিন্তু একথাও ঠিক যে কিছু মূল্য আছে যা নিশ্চিতভাবে 'ভালো' বলে (এবং কিছু ক্রিয়া সমান-ভাবে 'মন্দ' বলে) সব সমাজেই প্রশংসিত (বা নিন্দিত), আর কিছু মূল্য আছে যার নৈতিকতা প্রশ্নাতীত নয়, যা কাম্য কিনা তা সম্বন্ধে সন্দেহের, তর্কের অবকাশ আছে। কর্তব্যপরায়ণতা সব সমাজেই প্রশংসিত, তেমনি হত্যা বা প্রবঞ্চনা নিন্দিত। কিন্তু মাতৃভক্তি বা সতীত্বের নৈতিক মূল্য সেই রকম সন্দেহাতীত নয়।

কী করে মূল্য শিখি আমরা? কোন্ কার্যক্রম আছে যা অনুসরণ করলে মানুষ নৈতিকবোধ শেখার পরীক্ষায় শতকরা একশ পাবে? হায় নীতিবাগীশ সমাজকর্তা! তেমন কোনো 'ক্র্যাশকোর্স' নেই যাতে শিশুরা সহজে ন্যায়ের প্রতীক হয়ে ওঠে। মূল্যবোধ শেখার ধারা অত্যন্ত শ্লথগতিতে চলে—পরিবার, ধর্ম, সংস্কৃতি-শিক্ষার পথ ধরে। এ পথ বিচিত্র আর জটিল, তার দিকনির্ণয় সহজ নয়, অত্যন্ত রহস্যময়। কেউ জানে না একটি বিশেষ শিশু কী রকম ধরনের সামাজিক ব্যক্তিতে পরিণত হবে। তরুণ মন যতই নরম আর সংবেদনশীল হোক, মাথায় আদর্শের হাতুড়ি ঠুকে-ঠুকে সেই পরিণতির দিক আর গতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ করা যায় না।

আচরণের নিয়ন্ত্রণ

সামাজিক নিয়ন্ত্রণবাদের (social determinism) অন্যতম হেতুবাক্য হল 'আমাদের সব আচরণই সমাজ-নির্ভর', সুতরাং আচরণের সামাজিক নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। নীতিশিক্ষাকে পাঠ্যক্রমের অন্তরভুক্ত করার মূলে রয়েছে সামাজিক নিয়ন্ত্রণবাদের এই যুক্তিবাক্য। আজকের চিন্তাধারায় মার্কস-ফ্রয়েড-বর্ণিত তত্ত্বের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। মার্কস-ফ্রয়েড ঐতিহ্যের ধারায় প্রভাবিত বুদ্ধিজীবী, নেতা ও সমাজশাসকরা মনে

করেন সমাজের মঙ্গলের জন্য কী করা উচিত তাই শুধু না, ব্যক্তির নিজের মঙ্গলের জন্য কী উচিত তাও নির্ধারণ করা উচিত সামাজিক / রাষ্ট্রীয় স্তরে। বিধায়ক, শিক্ষাবিদ, সরকারি প্রতিনিধিবর্গ সামাজিক শক্তি হিসেবে ব্যক্তির নানা আচরণকে নানা স্তরে বিশ্লেষণ আর মূল্যায়নের সাহায্যে মঙ্গলের নামে উচিত পথে চালানোর চেষ্টায় ব্যস্ত। দৃষ্টান্ত হিসেবে অ্যাপটিচুড টেসট, পারসন্যালিটি টেসট, ইনটেলিজেনস টেসট এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। এইসব পরীক্ষা কোনোমতেই নির্ভুল বা সর্বদা সুফলদায়ক নয়। বহু ছাত্রছাত্রীই যা করতে বা পড়তে চায় পরীক্ষাগুলি অনুযায়ী দেখা যায় যে সে তার উপযুক্ত নয়, অন্যদিকে যাতে তার অনীহা, দেখা যায় পরীক্ষায় তার ব্যক্তিত্ব/বুদ্ধি/প্রবণতা সেই দিকেই নির্দেশ দেয়।

আমাদের নীতিশিক্ষার প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে, এরকম কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণবাদে অন্ধবিশ্বাসের ফল, আধাবৈজ্ঞানিক মনোভাবের পরিচায়ক। এই মনোভাব মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত স্বাধীন চেতনাকে ছোটো করে দেখে, এ যেন প্রাচীন ধর্মযাজকদের উপদেশবাণীরই নব কলেবরে পুনরুত্থান! যুগ যুগ ধরে ক্রিশ্চান চার্চ এবং আরো অন্যান্য ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান নানাভাবে নৈতিক বিধিনিষেধ প্রচার করেছে, আরোপ করেছে যাতে ব্যক্তি হয়ে ওঠে সেই বিশেষ মতাদর্শের ছাঁচে গড়া প্রতিরূপ। মারণযজ্ঞকে পর্যন্ত ধর্মযুদ্ধের আখ্যা দিয়ে সমর্থন করা হয়েছে। 'Just' এবং 'unjust'-এর ভিত্তিতে যুদ্ধের বিশ্লেষণ এবং নৈতিক প্রশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

টোট্যালিট্যারিয়ান সমাজব্যবস্থায়ও একই ভাবে বিধিনিষেধ আরোপ করা হয় সামাজিক মঙ্গলের নামে। লক্ষণীয় বিষয় হল, এই প্রথাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই মঙ্গলকর! ক্যাথলিক স্কুলগুলির বিধিনিষেধগুলির সঙ্গে নাৎসিবাদের কঠোর অনুশাসনগুলি প্রায় একই পর্যায়ে তুলনীয়। এ কথা প্রায়ই শোনা যায় যে হিটলারের শাসনে এক শৃঙ্খলাবদ্ধ কঠোর পরিশ্রমী জাতির সৃষ্টি হয়েছে জরমানিতে। নইলে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ধ্বংসস্তূপ থেকে তারা এত শীঘ্র আবার পৃথিবীর অন্যতম শিল্পোন্নত দেশ হয়ে ওঠে কী করে? সুতরাং এর ভিত্তিতে বলা যায় না কি যেভাবেই হোক (অর্থাৎ নাৎসিবাদও তার মধ্যে থাকতে পারে) ভারত যদি সবরকম দুর্নীতিকে দূর করতে পারে তাহলে NCERT-প্রবর্তিত চুরাশিটি নীতিশিক্ষার মাধ্যমে বিপুলসংখ্যায় "দেবশিশু" তৈরি করা যাবে? আশা করি আমাদের পূর্বোক্ত হেতুবাক্য থেকে অনিবার্য কিন্তু অবাঞ্ছনীয় এই সিদ্ধান্তকে কেউ কাম্য বলে মনে করবে না। অর্থাৎ, কী করে নীতিবোধ শেখানো যায়, সেটা বড়ো কথা নয়; সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হল কী করে ভবিষ্যৎ আরো সুন্দর হবে—মানুষের পূর্ণতর, শ্রেষ্ঠতর বিকাশ ঘটবে? চারিপাশের মানুষ দুর্নীতিগ্রস্ত না হলেও নীতিশিক্ষাকে বিধিবদ্ধ করে তা হয় না। হয় না, কারণ এ ধারণাটি ভ্রান্ত। কেন ভ্রান্ত তা বোঝা যাবে আরো সহজ, আরো শারীর-তাত্ত্বিক একটি ধারণার সাহায্যে। 'পুষ্টি'র কথা ধরা যাক। অনেকেই এখন খাদ্যমূল্য, ভিটামিন, আয়রন, প্রোটিন, ক্যালরি ইত্যাদি ধারণার সাথে পরিচিত। তবু সঠিকভাবে কি বলা যায় কতটুকু প্রোটিন বা ভালো খাদ্য কতটুকু পুষ্টি জোগাবে? কতটা বলবান করে তুলবে? বিখ্যাত জীবপদার্থ-বিজ্ঞানী নোবেল-বিজয়ী জন একেল্‌স্ (কার্ল পপারের সঙ্গে রচিত তাঁর *The Self and its Brain* গ্রন্থে এর এক মনোজ্ঞ বিবরণ আছে) স্নায়ুতন্ত্রের মতো এক সরল দৈহিক প্রক্রিয়াই কি রহস্যময়ভাবে নিয়মশৃঙ্খলার অতীত হয়ে পড়ে, তা আবিষ্কার করে অবাক হয়েছেন। যদিও খাদ্য ও পুষ্টির (শক্তি) মধ্যে কার্য-কারণ-সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তবু নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন কিভাবে তা কাজ করে। ফুটপাতবাসী দরিদ্র পিতা-মাতার সন্তান কী করে উজ্জ্বল স্বাস্থ্যের অধিকারী হয়, এ ব্যাপার যেমন রহস্য, তেমনি আশ্চর্য ঘটনা হল ধনী-গৃহে প্রাচুর্যের মধ্যে সযত্নে পালিত শিশু

পুষ্টিকর সুষম আহার পেয়েও কী করে রুগ্ন আর দুর্বল হয়। দৈহিক প্রক্রিয়ার ব্যাপারেই যদি নিয়ন্ত্রণবাদ সফলভাবে ব্যাখ্যা দিতে ব্যর্থ হয়, মানসিক বা নৈতিক ব্যবহারের মতো জটিল প্রক্রিয়াকে তাহলে কী করে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে? অর্থাৎ আমাদের নীতি-শিক্ষা যতই পর্যাপ্ত হোক, এবং প্রচারকরা যতই সৎ হোন, তার থেকে কোনো নিশ্চিত ভবিষ্যদ্‌বাণী আমরা করতে পারি না যে পরবর্তী নাগরিকেরা আদর্শ ব্যক্তি হবে। আদর্শ ব্যক্তি গড়ার স্বপ্ন ধরাবাঁধা কোনো রাস্তাতে কখনোই সত্য হবে না। নিয়ন্ত্রণবাদ সত্য হলেও তার থেকে কোনো নৈতিক সিদ্ধান্ত হয় না।

তর্কের খাতিরে যদি একথা মেনে নিই যে নীতি-শিক্ষার মাধ্যমে আদর্শ শিশু তৈরি করা সম্ভব, তবু আদর্শগত একটি প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে যে, নীতিশিক্ষা কি তাদের ওপর আরোপ করা উচিত? এবং তার জন্য কী মূল্য দিতে হবে? দুটি প্রশ্ন অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত আর তাদের উত্তর আরো জটিল নৈতিক প্রশ্নের অবতারণা করে। এ প্রশ্ন দুটির উত্তর খোঁজার আগে এ কথাটি স্পষ্ট হওয়া দরকার যে এ প্রশ্নগুলি ওঠার কারণ হল এই যে, আমাদের লক্ষ্য উন্নততর সমাজ প্রতিষ্ঠা, আনন্দময় ভবিষ্যতের সন্ধান। সেই লক্ষ্যে পৌঁছবার একটি উপায় হিসেবে নীতিশিক্ষার সাহায্যে শিশুমনে মূল্যবোধকে জাগ্রত করা। লক্ষ্য যদি হয় শিশুকে আরো দায়িত্বসম্পন্ন, আরো সংবেদনশীল ব্যক্তিতে পূর্ণায়িত করা—সে কাজে কোনো বিধিবদ্ধ নিয়মে নীতিশিক্ষা শুধু অর্থহীন নয়, অবাঞ্ছিতও।

অর্থহীন

নীতিশিক্ষার প্রয়োজন নেই। কেননা (আগেই বলেছি) মানুষের মূল্যবোধ জাগ্রত হয় ধীরে-ধীরে—ঐতিহ্য, পরিবার, ধর্ম-সংস্কৃতির জটিল জটাজাল বেয়ে। কোনো অতি সরলীকৃত ফরমুলা এই প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে পারে না। পাঠ্যবইয়ে হিতোপদেশ বোঝাই করে গলাধঃকরণ করালেও নয়। আমাদের পূর্ববর্ণিত রিকুর মতো 'টিপিক্যাল' একজন ভারতীয় শিশু ধর্মান্ধতা, সাম্প্রদায়িক ঘৃণা, অর্থনৈতিক বৈষম্য, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের সংঘাত—এইরকম নানা সামাজিক অস্বাস্থ্যের বদ্ধ আবহাওয়ায় বড়ো হয়। বর্ণ-ধর্ম-নিরপেক্ষ স্বচ্ছন্দ সম্প্রীতির মুক্ত পরিবেশে বড়ো হওয়ার সৌভাগ্য ঘটে মুষ্টিমেয় মাত্র কয়েকজনের। একজন গড়পড়তা শিশুর নিরানন্দ জীবনযাত্রায় নীতিবাক্য অর্থহীন ফাঁকা বুলির মতো শোনায়। ধর্মীয় গুরুরা বরং দৈবরোষ, যন্ত্রণাময় পুনর্জন্ম ইত্যাদির ভয় দেখিয়ে অন্যায় বা পাপাচারের বিরুদ্ধে শিক্ষা দিতে পারেন, কিন্তু আজকের আধা-আলোক-প্রাপ্ত শিশুরা তাদের পিতৃপুরুষের মতো স্বর্গনরক, পাপপুণ্য সম্বন্ধে দৃঢ়বিশ্বাসী নয়। কিসের প্রেরণায়, কিসের ভীতিতে তাদের আচরণ মঙ্গলমুখী হবে? তা ছাড়া, শিশুরা ছোটো-ছোটো অভ্যাস, আচরণপদ্ধতি শেখে তার সামাজিক পরিবেশ থেকে। পারিপার্শ্বিক জীবনযাত্রার আনাচে-কানাচে সে খুঁজে পায় মূল্য-বোধের প্রথম পাঠ। জীবন্ত প্রতিবেশের সঙ্গে নিয়ত ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে তার সঞ্জোজাত জীবনবোধ, ভালোমন্দজ্ঞান ক্রমে-ক্রমে ফুটে ওঠে। বইয়ে, গল্পে, কথায় সে খোঁজে নতুনত্ব, তার সজাগচেতনা মনের খোরাক। বল্গাহীন কল্পনার ঘোড়া ছুটিয়ে বইয়ের পাতায় সে যেতে চায় এমন এক রাজ্যে যার দেখা তার সীমাবদ্ধ জীবনে মেলে না। আমাদের লক্ষ্য যদি হয় আরো ভালো "ব্যক্তি"র উন্মেষ (শুধু আরো ভালো "নাগরিক" নয়), তাহলে পুঁথির পাতার নীতিবোধ না শিখিয়ে শিশুদের অফুরন্ত কৌতূহল আর কল্পনাশক্তিকে দিই না কেন আরো বিস্তৃত, আরো স্বাধীন হবার সুযোগ? এ কথা তো কেউ অস্বীকার করবেন না যে বেশির ভাগ হিতোপদেশই নঞর্থক, 'এটা কোরো না' 'ওটা কোরো না'-র নামান্তর। উনবিংশ শতাব্দীর "আলোকপ্রাপ্ত" কট্টর

নীতিবাগীশ দার্শনিক কান্ট্ যে চারটি নৈতিক নিয়মের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন,* সে চারটিই কী করা আমাদের উচিত নয় সে ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা। স্বাধীন কল্পনাশক্তি শিশুমনের বিস্তারে সাহায্য করে, নৈতিক নিষেধাজ্ঞা তাকে প্রতিপদে বাধা দেয়, কল্পনার বিকাশকে খর্ব করে। জ্ঞানবুদ্ধি উন্মেষের পথে বাধা বাঞ্ছনীয়, নাকি, মুক্তবিহার? স্বাধীনতা বলতে আমি সুযোগ-সুবিধাকে বোঝাচ্ছি যা শাসনের শৃঙ্খলে বাঁধা নয়। শিক্ষাক্রমে, পাঠশালায় হিতোপদেশের বাণী অকারণে শিশুর মুক্ত কল্পনার যথেচ্ছ বিকাশকে ভারাক্রান্ত করে। মনে-মনে তার কোথাও হারিয়ে যাওয়ার ডানা যায় ভেঙে। আমেরিকান ইনডিয়ান শিশুদের ওপর যেমন সীমাবদ্ধ মূল্যবোধের পাথর চাপিয়ে তাদের আদর্শ যোদ্ধা করা হত, আমাদের আরো যন্ত্রণাজর্জরিত ভবিষ্যৎ নাগরিকদের তেমনি আদর্শ সামাজিক জীব গড়ে তোলার কারখানা হবে স্কুলগুলো যদি না তাতে কল্পনার, আনন্দের হাওয়াবাতাস লাগে। ওয়াল্ট্ ডিসনের কল্পকাহিনী নীতিবচন দিয়ে শেষ হয় না, কখনো-কখনো হয়তো অর্থহীনও, তবু তা শিশুর বিকাশে সাহায্য করে। কেননা সে তা উপভোগ করে, একাত্মবোধ করে তার স্বপ্নরাজ্যের ছবি দিয়ে। কল্পনাশক্তির মুক্তবিকাশ বুদ্ধির, মনের ক্রমবিকাশে যে সাহায্য করে তা তো দেখাই যায়। পশ্চিমী দেশের স্কুলে দশ-বারো বছর পর্যন্ত শিশুরা কত সহজে কাটায়, যখন আমাদের ছেলেমেয়েরা পুঁথিসর্বস্ব বৈচিত্র্যহীন "সিলেবাস" আর পরীক্ষার চাপে কাহিল। অথচ উচ্চতর শিক্ষায় বা কর্মক্ষেত্রে তারা কত সহজে স্বাধীন প্রোজেক্ট করতে পারে, বিভিন্ন বিষয়ে নিজের মতামত জ্ঞাপন করতে পারে ছোটোবেলা থেকেই। এ শিক্ষা আমাদের স্নাতক শ্রেণীর ছাত্ররাও পায় না।

শিশুরা কল্পনাপ্রবণ—মহাপুরুষের জীবনগাথার চেয়ে উদ্দাম অযৌক্তিক কল্পকথা বা দুঃসাহসী অভিযান তাদের বেশি আকর্ষণ করে। অবশ্য মহাপুরুষদের জীবনীও আকর্ষণীয়ভাবে লেখা যায়। ("লেডি বার্ড" সিরিজের বইগুলোর উল্লেখ এ প্রসঙ্গে করা যেতে পারে।) জাতীয় ঐক্যের কথা বইয়ে, বক্তৃতায় না শিখিয়ে শিশুদের সুযোগ দিই না ভারতের সুদূর প্রান্তে বেড়াবার, যাতে ভিন্ন রুচির, ভিন্ন ধর্মসংস্কৃতি-ভাষার মানুষের সঙ্গে তার সংযোগ ঘটে? সামার ক্যাম্প, কর্মশিবির জাতীয় নানা প্রকল্পের মাধ্যমে যোগাযোগ ঘটুকনা এদেশের বিচিত্র ধর্মসংস্কৃতি ভাষা-ভাষী ছেলেমেয়েদের পরস্পরের সঙ্গে! তাদের নিজের ছোটো গণ্ডী থেকে—গ্রাম বা শহর যাই হোক না কেন—ভিন্ন জায়গায়, ভিন্ন পরিবেশের সঙ্গে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই ভারতের উত্তরসূরীকে পথ দেখাতে পারে বহুর মধ্যে একেকে উপলব্ধি করতে। নানারকম সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান, ছুটিতে অন্য পরিবারের সঙ্গে বসবাস, বিভিন্ন ভ্রমণ-পরিকল্পনা, একসঙ্গে গঠনমূলক কাজ করার প্রকল্প ইত্যাদি শিশুকে তার চেনা গণ্ডীর বাইরেও যে মানুষ আছে—তার সম্বন্ধে সচেতন করবে, তার অন্ধ গোঁড়ামি যাবে কেটে। এ কথা তো সবারি জানা যে ভ্রমণ মানুষের মনকে অনাবিল উদার করে তোলে। আরো নানাভাবে ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে শিশুর কাছে জীবন্ত করে তোলা যেতে পারে। নইলে কেরলের মৎস্যজীবী পরিবারের একটি শিশু কেমন করে কাশ্মীরি ব্রাহ্মণের সঙ্গে ঐক্য বোধ করবে? এই দুটি ভিন্ন সংস্কৃতির মধ্যে পার্থক্য আছে নিশ্চয়ই। পুঁথিগত জাতীয় সংহতির নিছক শুকনো বুলি বিধি-বদ্ধ নীতিশিক্ষা দিয়ে সে ঐক্য বোঝাতে পারবে না।

অবাঞ্ছনীয়

বিধিবদ্ধ নীতিশিক্ষার আরোপ আরো সুদূরপ্রসারী ক্ষতির সূচনা করতে পারে। এতে ব্যক্তিত্বের স্বকীয়তা এবং স্বতঃস্ফূর্ত বিকাশের পথে বাধার সৃষ্টি হয়। স্বকীয়তার অভাব আরো একটি গুরুতর কারণে বিপজ্জনক। কারণটি হল শেষ পর্যন্ত তা গতানুগতিক চিন্তাধারার পৃষ্ঠপোষকতা করে। নতুন ভাবধারার অভাব যে-কোনো সমাজের পক্ষেই অশুভ। স্বাধীন চিন্তাবিদদের অভাব সবরকম সমাজেরই অপূরণীয় ক্ষতি। মুক্তভাবনার হাটে নতুন পসরার অভাব শুধু সংস্কৃতি-গত ক্ষতিই নয়, বিজ্ঞানের জগতেও অপরিমেয় শূন্যতার সৃষ্টি করে। বৈজ্ঞানিক কল্পনা যুগান্তকারী পরিবর্তন আনে স্বকীয় চিন্তার আভায়। যে-কোনো বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার কল্পনাপ্রবণ ব্যক্তিমানসের অমূল্য অবদান।

সামাজিক অগ্রগতির জন্য আদর্শ নাগরিক আবশ্যিক কিন্তু পর্যাপ্ত শর্ত নয়। সনাতন নৈতিকতায় অবিশ্বাসী বহু ব্যক্তির সামাজিক অগ্রগতিতে অবদান রয়েছে। বারট্রানড রাসেল এমন এক আশ্চর্য মানুষ। আরো অনেক ব্যক্তির নাম করা যেতে পারে সনাতন নৈতিক মূল্যে অবিশ্বাস সত্ত্বেও যাঁদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক বা বুদ্ধিজগতে অবদান অপরিসীম। বস্তুত, বহু মহৎ শিল্পী এবং কবির জেহাদই সনাতন মূল্য-বোধের মূলে কুঠারাঘাত হেনেছে। সবাইকে সমান এবং উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা দেওয়া যে-কোনো শিক্ষা-ব্যবস্থার অবশ্য লক্ষ্য। তবে সেখানেই তার ক্ষমতার শেষ। স্বাধীন চিন্তার রাস্তা আমরা সহজ করে দিতে পারি, বৈষম্যহীন সুযোগ-সুবিধার মঞ্চটি সাজিয়ে মাত্র দিতে পারে কোনো বিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান। চরম সিদ্ধান্ত কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক নয়, তা থাক না কেন তরুণমনের সজীব প্রচেষ্টার জন্য। কী ভালো আর কী মন্দ—বিধি দিয়ে নয়—প্রচুর সুযোগ আর খোলা-মেলা আবহাওয়ায় বেছে নিক নতুন মন নিজেই। মূল্য নেই জগতে তা নয়। স্টেইনবেকের (*Grapes of Wrath* রচনায়) জিম কেমির মতো আমি বলছি না যে 'ন্যায় নেই, অন্যায় নেই—পৃথিবীতে শুধু বস্তু আছে'। মূল্য নিশ্চয়ই আছে, কিছু তার তর্কাতীত, কিছু বা তর্কসাপেক্ষ। আদর্শ শিক্ষা (পাঠ্যপুস্তকে নীতিকথা বোঝাই করার চেয়ে বৃহত্তর অর্থে) হবে এমন যাতে ন্যায়-অন্যায় সম্বন্ধে ভবিষ্যৎ নাগরিকদের ঠিকমতো সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপযুক্ত বুদ্ধিমত্তা, স্বকীয়তা বিকশিত হয়। কিন্তু সে সিদ্ধান্ত তাদের নিজেরই হবে, ওপর থেকে চাপিয়ে দিলে বোঝা হয়ে তা মানুষের স্বাধীন ব্যক্তিত্বকে পিষ্ট করবে। সিদ্ধান্তটি যেহেতু স্বাধীন, তাতে ভুল করার ঝুঁকি আছে নিঃসন্দেহে, তবে সে সিদ্ধান্ত তার সক্রিয় চিন্তার ফল, শোনা হিতোপদেশের যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি মাত্র নয়। পেটার-ন্যালিসটিক ব্যবস্থার মূল্য অত্যন্ত বেশি—মানুষের স্বাধীন চিন্তাকে নিয়ে তা ছিনিমিনি খেলে। ন্যায়-অন্যায় ধারণার জন্য সমাজপ্রধান, বিদ্যালয়প্রধানের প্রতি নির্ভরশীল হলে ক্রমে-ক্রমে স্বাধীন বিচারশক্তির ধার কমে যায়, ঠিকমতো মগজধোলাই হলে একেবারে লোপ পেয়েও যেতে পারে। বিচারশক্তিই মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাকে হারানোর ঝুঁকি কম গুরুতর নয়। বিদ্যাসাগর নিশ্চয়ই খুব আদর্শ বা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বড়ো হন নি। নাৎসি বা ফ্যাসিস্ট সমাজে কোনো মহৎ ব্যক্তি ছিলেন না, তা যেমন ঠিক নয়, গণতান্ত্রিক দেশে দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তি নেই, সে কথাও ভুল। অর্থাৎ এমন কোনো সরল পদ্ধতি নেই যাতে আদর্শ নাগরিক তৈরি করা যায়। অন্তত নীতি-শিক্ষাকে পাঠ্য-অন্তরভুক্ত করে না। আমরা শুধু চেষ্টা করতে পারি—পৃথিবী আরো সুন্দর হোক, বা ভবিষ্যতের মানুষ আরো ভালো হোক। কিন্তু হায়! কোনো সমাজকারিগর বিধিবদ্ধ হিতোপদেশ দিয়ে তার সুনিশ্চিত ভরসা দিতে পারে না।

* কান্টের যে চারটি নৈতিক আদেশ পাওয়া যায় তা হল: (১) মিথ্যে কথা বোলো না, (২) হত্যা কোরো না, (৩) চুরি কোরো না, (৪) প্রতিশ্রুতিভঙ্গ কোরো না।

স্বামী বিবেকানন্দের সমাজভাবনা ও তার প্রাসঙ্গিকতা

অমলেন্দু দে

সাম্প্রতিক কালে রামকৃষ্ণ মিশনের পণ্ডিত সন্ন্যাসিবৃন্দ এবং কয়েকজন বিশিষ্ট লেখকের প্রয়াসে বিবেকানন্দ-চর্চার ক্ষেত্রটি খুবই প্রসার লাভ করেছে। তার ফলে বিবেকানন্দের সমাজভাবনা সম্বন্ধে নতুন করে আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। তারই সূত্র ধরে কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হল: (১) সমাজ-তান্ত্রিক ভাবধারার উদ্ভব ও অগ্রগতি: ইউরোপে এবং ভারতে ধর্ম সম্বন্ধে সমাজতন্ত্রীদের মনোভাব; (২) বিবেকানন্দের সমাজভাবনা; (৩) ভারতের বর্তমান সামাজিক-রাষ্ট্রিক গড়নে বিবেকানন্দের চিন্তার প্রাসঙ্গিকতা।

১

বলা বাহুল্য, বিবেকানন্দের অনেক আগেই ইউরোপে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার উদ্ভব হয় এবং ভারতেও এই ভাবধারার অনুপ্রবেশ ঘটে। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই সমাজতন্ত্রবাদ ইউরোপের বিভিন্ন দেশে প্রসারিত হয় এবং সমাজতন্ত্রীরা রাজনৈতিক দল গড়ে তোলেন। তখন প্রধানত দু-রকমের লোকদের সমাজতন্ত্রী বলে উল্লেখ করা হত: একদিকে ছিলেন ইংলনডে ওয়েন-পন্থী ও ফ্রান্সে ফুরিয়েপন্থী ইউটোপীয় মতবাদের সমর্থকবৃন্দ, অন্যদিকে ছিলেন 'পুঁজি ও মুনাফার বিন্দুমাত্র ক্ষতি না করে' সামাজিক অবিচার দূর করার তত্ত্ববিদবৃন্দ। কার্ল মার্কস ও ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস এই দু ধরনের সমাজতন্ত্রীদের মতবাদের ত্রুটিসমূহ উল্লেখ করে সমাজপরিবর্তনের গতিধারা বিশ্লেষণ করেন। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই তাঁরা "বৈজ্ঞানিক" সমাজতন্ত্রবাদের তত্ত্ব বিকশিত করেন। ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে মার্কস-রচিত "ক্যাপিটাল" গ্রন্থের প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হওয়ায় এই তত্ত্বের অর্থনৈতিক ভিতটি সুদৃঢ় হয়। ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "হোলি ফ্যামিলি" নামক গ্রন্থে মার্কস ও এঙ্গেলস বলেন, 'বড় মানুষেরা নন, জনসাধারণই ইতিহাসের প্রকৃত স্রষ্টা'। এই গ্রন্থে তাঁরা এই কথাও বলেন, সমস্ত রকমের শোষণ ও নির্যাতনের অবসানের জন্য একটি শ্রেণী হিসেবে প্রলেতারিয়েত ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করবে। তাঁরা দুজনেই সমাজরূপান্তরে শ্রমজীবী মানুষের ভূমিকার বিশ্লেষণ করেন। তাঁরা এই কথাও স্পষ্ট করে বলেন, 'শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি শ্রমিকশ্রেণীরই নিজস্ব কাজ হতে হবে'। তাঁদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসেই সমাজের রূপান্তর সম্ভব। শ্রমিকশ্রেণীকে 'একটি বাহিনীরূপে' সংঘবদ্ধ করতে তাঁরা দুজনে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। প্রথম আন্তর্জাতিক (১৮৬৩-১৮৭৬) এবং দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক (১৮৮৯-১৯১৪) সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার ব্যাপ্তি ঘটায় এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের এক বৃহত্তর প্রেক্ষাপট তৈরি করে। ইউরোপ এবং আমেরিকার প্রলেতারীয়রা সংঘবদ্ধ হয়। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আইন পাশ করে সাধারণ আট ঘণ্টা কর্ম-দিবস চালু করার দাবি বারে-বারে আন্তর্জাতিকের মঞ্চ থেকে উচ্চারিত হয়।

সমাজতন্ত্রীরা খ্রীষ্টীয় চার্চের ভূমিকার কঠোর সমালোচক ছিলেন। তাঁরা ধর্মকে ধনতান্ত্রিক সমাজের 'রক্ষাকবচ' বলেই মনে করেন। প্রুধোঁ বলেন, ন্যায়বিচার চার্চের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব নয়, বিপ্লবের মধ্য দিয়েই তা অর্জন করা যায়। ওয়েন ধর্মের সমালোচনা করে বলেন, দরিদ্রদের নৈতিক অধঃপতনের সামাজিক কারণসমূহ ধর্ম ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কিছুটা ভিন্ন সুরে কথা বলেন সাঁ-সিমোঁ। তিনি দরিদ্র শ্রেণীর দুরবস্থা লাঘবে ধর্মের ভূমিকা উল্লেখ করে এই আশা পোষণ করেন, খ্রীষ্টীয় চার্চ সমাজতন্ত্র গঠনে সহায়তা করবে। কিন্তু পরবর্তী কালের লুই ব্লাঙ্ক, বাকুনিন, প্রিন্স ক্রুপোটকিন প্রমুখ সমাজতন্ত্রীরা এবং নৈরাজ্যবাদীরা ধর্মের ভূমিকা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং খ্রীষ্টীয় চার্চ সমাজ-তন্ত্র গঠনে সহায়তা করবে, এমন সম্ভাবনা মেনে নিতে পারেন না। মার্কস ও এঙ্গেলস বলেন, 'বর্ধমান প্রলেতারীয় তরঙ্গকে ঠেকাতে' ধর্মকে ব্যবহার করা হচ্ছে। তবে 'পতনোন্মুখ সমাজকে ঠেকা দিয়ে রাখার শক্তি কোনো ধর্মীয় প্রবচনের নেই।' ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দেই মার্কস লেখেন, 'ধর্ম হল জনগণের জন্যে আফিম।' ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত "কমিউনিস্ট পার্টির ইশতেহার" পুস্তিকায় মার্কস ও এঙ্গেলস ধর্মকে 'সমাজচেতনার একটি রূপ' বলে উল্লেখ করেন। ধর্ম হল 'শ্রেণীবিভক্ত সমাজে উপর-কাঠামোর একটি উপাদান'। 'ধর্ম কিভাবে নির্ভর করে সামাজিক সম্পর্ক বিকাশের উপর, সমাজের শ্রেণীগত গড়নের উপর', তা তাঁরা উদ্ঘাটিত করেন। তাছাড়া 'জনগণকে অন্ধ এবং দমন করার উপায় হিসেবে ধর্মের উন্নতি-বিধানে শোষক শ্রেণীগুলোর স্বার্থটা কী' তাও তাঁরা খুলে ধরেন। তাঁরা দেখান, 'ধর্ম কিভাবে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ব্যাহত করছে; ধর্মের ইতিহাস হল বিজ্ঞান-সম্মত চিন্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ইতিহাস'। প্রসঙ্গত তাঁরা উল্লেখ করেন, 'শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে যাজক সম্প্রদায় চূড়ান্ত প্রতিক্রিয়াশীল ভূমিকায় থেকেছে, আর নির্মম লড়াই চালিয়েছে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে।' 'প্রকৃতিবিজ্ঞানের বিকাশ' কি-ভাবে ধর্মীয় এবং ভাববাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে ক্রমাগত ভাঙন ধরায় তার বিশ্লেষণ করে মার্কস ও এঙ্গেলস মন্তব্য করেন, তাঁদের 'বিবেচনায় ধর্মের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সবচেয়ে প্রচণ্ড অস্ত্র হল বৈজ্ঞানিক এবং বস্তুবাদী প্রচার।' কিন্তু তাঁরা নৈরাজ্যবাদী, ব্লাঙ্কি-পন্থী, ড্যুরিং ও অন্যান্যদের মতো ধর্মের বিরুদ্ধে দমন-প্রণালী প্রয়োগের বিরোধী ছিলেন। মার্কস ও এঙ্গেলস মনে করেন, 'ধর্মের উপর নিষেধাজ্ঞা আর নিগ্রহের ফলে ধর্মীয় মনোভাব শুধু প্রবলতরই হতে পারে।...যে-সামাজিক আর রাজনীতিক পরিবেশ ধর্মকে লালন করে সেটাকে দূর না করা অবধি ধর্ম লোপ করা যায় না।' তাঁরা আরও বলেন, 'আর্থ-নীতিক এবং রাজনীতিক মুক্তির জন্য বৈপ্লবিক সংগ্রামের মধ্যে মেহনতি জনগণ ধর্মীয় মত এবং কুসংস্কার থেকে নিজেদের মুক্ত করে। বস্তুবাদী দৃষ্টি-

১০ মার্চ, ১৯৮৮ কলকাতার মৌলানা আজাদ কলেজে Contemporary Relevance of Swami Vivekananda বিষয়ক সেমিনারে আমন্ত্রিত হয়ে লেখক যে ভাষণ দেন তা এখানে প্রকাশ করা হল। এই সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন স্বামী লোকেশ্বরানন্দ।

ভঙ্গিতে তাদের শিক্ষাদীক্ষা দিয়ে আনুকূল্য করতে হয়।' খ্রীষ্টধর্মের প্রতি মার্কসবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল তার একটি পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা এঙ্গেলস-লিখিত "গোড়ার খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাস প্রসঙ্গে" নামক প্রবন্ধে পাওয়া যায়। একেবারে গোড়ার দিককার খ্রীষ্টধর্মের ইতিহাস আলোচনা করে তিনি লেখেন, খ্রীষ্টধর্ম দাসত্ব ও দুঃখ-বেদনা থেকে মানুষের মুক্তির পথ দেখায় 'পরলোকের জীবনে, মৃত্যুর পরে, স্বর্গে; সমাজতন্ত্র এটাকে দেখায় ইহলোকে, সমাজের রূপান্তরের মধ্যে।' মার্কস ও এঙ্গেলস বৈপ্লবিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে নিপীড়িত মানুষের "স্বর্গ" এই মর্তেই প্রতিষ্ঠা করতে চান। উল্লেখ্য এই, গণতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে প্রলেতারীয় পার্টির মূল দাবি ছিল, 'বিবেকের স্বাধীনতা, রাষ্ট্র থেকে চার্চকে পৃথক করা এবং বিদ্যালয়কে চার্চের আওতা থেকে মুক্ত করা।' এই দাবিও করা হয়, ধর্মকে ব্যক্তিগত বিষয় বলেই রাষ্ট্রকে ঘোষণা করতে হবে। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে রাশিয়াতে মার্কসবাদী দল গঠিত হবার পর "ধর্ম" ও "চার্চ" সম্বন্ধে সেখানেও মার্কসবাদীরা এই মনোভাবই ব্যক্ত করেন। ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দে লেনিন মার্কসিস্ট দলে যোগদান করেন এবং ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মার্কসিস্টদের ঐক্যবদ্ধ করে শ্রমজীবী মানুষের মুক্তির জন্য উদ্যোগী হন। অবশ্য আরও পরে তিনি একটি সত্যিকারের মার্কসবাদী দল গঠন করতে সক্ষম হন। এই কথা এইজন্য বলা হল, ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে রাশিয়ান সোস্যাল ডেমক্র্যাটিক লেবর পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হলেও, তখনও এই দল সর্বহারা-কর্তৃক ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটি এড়িয়ে যায় এবং সর্বহারাদের কর্তৃত্ব স্থাপনের বিষয়টিও উল্লেখ করে নি। এমনকি জারতন্ত্র ও রাশিয়ার বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্বহারাদের মিত্র কারা হবে, তার সম্বন্ধেও এই কংগ্রেসে কিছু উল্লেখ করা হয় নি। তাই লেনিন এই দলকে 'প্রকৃত মার্কসবাদী' দল হিসেবে উল্লেখ করেন নি, যদিও তিনি বৈপ্লবিক চিন্তার প্রসারে এই দলের ভূমিকা স্বীকার করেন। তখনই লেনিন সত্যিকারের মার্কসবাদী দল গঠনের জন্য নির্দিষ্ট পরিকল্পনা করেন এবং পরে তা তিনি তাঁর "হোয়াট ইজ টু বি ডান" নামক গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেন। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব ও তার প্রয়োগের উদ্দেশ্যে রাজনৈতিক দল গঠনের এই হল সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

এবার ভারতে সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা সংক্ষেপে উল্লেখ করা যাক। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ভারতে যন্ত্রশিল্পের উদ্বোধন হয়, ভারতে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতিতে শিল্প-উৎপাদনের সূচনা হয়। ১৮৭৩-১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ভারতে ব্রিটিশ মূলধনের অনুপ্রবেশ আরও বৃদ্ধি পায়; ভারতের সঙ্গে ধনতান্ত্রিক জগতের এক বৃহত্তর অঞ্চলের সংযোগ স্থাপিত হয়। এই সময়কালে ভারতের শিক্ষিত ব্যক্তিদের চিন্তাতেও পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। তাঁদের উপর ইউরোপের উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রভাব পড়ে। আর তারও সূচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভকাল থেকে। ইয়ংবেঙ্গল দলের যুবকদের মনে ফরাসি বিপ্লবের সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণী গভীর আলোড়নের সৃষ্টি করে। ছাত্রদের মধ্যে প্রচলিত সামাজিক বিধিব্যবস্থার বিরুদ্ধে মনোভাব জাগ্রত হয়। হিন্দু সমাজে আদর্শগত সংঘাতের ফলে দুটো প্রধান ধারার উদ্ভব হয়: একদিকে রক্ষণশীলতা, অন্যদিকে প্রগতিশীলতা। প্রগতিশীল ধারার আবার দুটো উপধারা ছিল : একটি হল ধর্মনির্ভর উদারনৈতিকতা-মানবিকতা-যুক্তিশীলতা, আর একটি হল ধর্মবিহীন উদারনৈতিকতা-মানবিকতা-যুক্তিশীলতা। প্রথম উপধারাটির প্রবক্তা ছিলেন রামমোহন রায়, আর দ্বিতীয় উপধারাটির প্রবক্তা হলেন ডেভিড হেয়ার ও লুই হেনরি ভিভিয়ান ডিরোজিও। এই দুটির মধ্যে প্রথম উপধারাটিই শক্তিশালী ছিল; রামমোহনের পরে তার প্রভাব আরও বৃদ্ধি পায়। ডিরোজিওর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়

উপধারাটির প্রভাব দ্রুত হ্রাস পায়; "ইয়ংবেঙ্গল" বলে উল্লেখিত তাঁর শিষ্যরা এই ধারাটিকে সজীব করতে প্রয়াসী হন নি। স্বভাবতই ধর্মবিহীন বা ঈশ্বরবিরোধী চিন্তার ধারাটি দুর্বল হয়ে পড়ে, সমাজমানসে তার বিশেষ কোনো প্রভাব থাকে নি। হিন্দু সমাজে রক্ষণশীলদের অস্তিত্ব থাকলেও, ধর্মনির্ভর উদারনৈতিক যুক্তিশীল সংস্কারকদেরও যথেষ্ট প্রভাব ছিল। অন্যদিকে মুসলিম সমাজের আধুনিকীকরণের প্রয়াস ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধকে অবলম্বন করেই চলে। মুসলিম মানসে একই সঙ্গে নানা প্রশ্নের ভিড় জমে। প্যান-ইসলামীয়, জাতীয়তাবাদী, ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আনুগত্যবোধ, ধর্মীয়, উদারনৈতিক, মানবিক, যুক্তিবাদী ইত্যাদি বিপরীতধর্মী নানা চিন্তা মুসলিম মননকে প্রচণ্ডভাবে আলোড়িত করে। মুসলিম মননের উদারনৈতিক, মানবিক ও যুক্তিবাদী উপাদানগুলিকে একটি স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত করা সম্ভব হয় নি বলে ধর্মনির্ভর উদারনৈতিক ধারাটি সজীব হতে পারে নি। ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্যবোধ এই ধারাটির পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করে।

সম্ভবত রামমোহনই প্রথম ভারতীয় যাঁর সঙ্গে ইউরোপীয় সমাজতন্ত্রীদের প্রত্যক্ষ সংযোগ ঘটে। রামমোহনের সঙ্গে ইংলন্ডের সমাজতন্ত্রী রবার্ট ওয়েনের সমাজতন্ত্রবাদ ও ধর্ম নিয়ে তর্ক-বিতর্ক হয়। রামমোহন ওয়েন-প্রচারিত ধর্মবিহীন সমাজতন্ত্রবাদ গ্রহণ করতে পারেন নি। রামমোহন মনে করেন, সমাজতন্ত্রবাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য ধর্মের সমালোচনার প্রয়োজন নেই। তিনি মনে করেন, ধর্মে যে ভালোবাসা ও বদান্যতা আছে তা মানুষের সুখবৃদ্ধি করতে সক্ষম। বেদান্তে বিশ্বাসী রামমোহন সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে এই মনোভাবই ব্যক্ত করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই কয়েকটি উদারনৈতিক সংবাদপত্র শ্রমজীবী জনসাধারণের আন্দোলনের প্রতি 'নৈতিক সমর্থন' জ্ঞাপন করে। কৃষকদের সমস্যা নিয়েও শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যে ভাবনা শুরু হয়। তাঁরা নীলচাষীদের পক্ষ সমর্থন করেন এবং চা-শ্রমিকদের দুরবস্থা লাঘবের চেষ্টা করেন। ১৮৬২-১৯০০ খ্রীষ্টাব্দে শ্রমজীবী জনসাধারণের বহু ধর্মঘট ভারতের বিভিন্ন স্থানে সংগঠিত হয়। স্বভাবতই শ্রমজীবীদের অবস্থার উন্নতির প্রশ্নটিও গুরুত্ব লাভ করে। ইউরোপের শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গেও বুদ্ধিজীবীদের পরিচয় ঘটে। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠিত হবার সংবাদ পেয়ে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ-সম্পাদিত "সোমপ্রকাশ" অভিনন্দনবার্তা প্রেরণ করে। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় "শ্রমজীবী সমিতি" স্থাপিত হয়; শশীপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এই সমিতির প্রতিষ্ঠাতা। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে "ভারত শ্রমজীবী" নামে এই সমিতির একটি মুখপত্র প্রকাশিত হয়। শ্রমজীবী ও নিম্নবর্গের মানুষের দুরবস্থা দূর করবার জন্য এই সমিতি ও মুখপত্র চেষ্টা করে। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে প্রথম আন্তর্জাতিকের কাছে একটি পত্র পাঠানো হয়। তাতে ভারতে প্রথম আন্তর্জাতিকের একটি শাখা স্থাপনের অনুমতি চাওয়া হয়। প্রথম আন্তর্জাতিকের যে সভায় এই পত্রের উত্তর দেওয়া হয় তাতে কার্ল মার্কস সভাপতিত্ব করেন। এই সভা থেকে প্রেরিত পত্রের একটি অংশে বলা হয়: শ্রমিকশ্রেণীর আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই আন্তর্জাতিক গঠিত হয়েছে। এই সংস্থা বিভিন্ন জাতি-গোষ্ঠীর মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করতে এবং শ্রমিকদের তাদের রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকার অর্জন করতে সাহায্য করবে। ১৮৭৫-১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণাচরণ চট্টোপাধ্যায়, রামকুমার বিদ্যারত্ন, দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ চা-শ্রমিকদের দুরবস্থা লাঘবের জন্য আন্দোলন করেন। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত "সাম্য" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়; তিনি ১৮৩৩-১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে "সাম্য" গ্রন্থ লেখেন। তিনি রুশোর মত নির্ভর করেই এই গ্রন্থখানি লেখেন। সম্ভবত ভারতে "সাম্য" বিষয়ে এটিই প্রথম গ্রন্থ; পাশ্চাত্য চিন্তার প্রভাবেই বঙ্কিমচন্দ্র এই গ্রন্থখানি লেখেন।

তিনি এই গ্রন্থে "সাম্যবাদ", "আন্তর্জাতিক" ও ইউরোপের কয়েকজন সমাজতন্ত্রীর নাম উল্লেখ করলেও, মার্কস ও এঙ্গেলস এবং তাঁদের রচনাসমূহের উল্লেখ করেন নি। তিনি যাকে 'প্রকৃত সাম্যবাদ' বলে আলোচনা করেন তার অসঙ্গতি মার্কস ও এঙ্গেলস বিশ্লেষণ করেন। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় তাঁদের মতবাদের কোনো উল্লেখ নেই। তিনি মার্কস-এঙ্গেলস-এর চিন্তাভাবনার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন কিনা তা সুনির্দিষ্ট করে বলা যায় না। পরিচিতি ঘটলেও তিনি হয়তো ইচ্ছা করেই তাঁদের কথা গোপন রাখেন। সম্ভবত তাঁদের নাম থাকলে গ্রন্থখানি প্রকাশের অসুবিধা হত। পরে বঙ্কিমচন্দ্র "সাম্য" গ্রন্থখানি প্রত্যাহার করেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠার পরে ভারতীয় রাজনীতিবিদরা এই সংস্থার সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করেন। ইংলনডে অধ্যয়ন-কালে অরবিন্দ ঘোষ ইউরোপের বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক মতবাদের এবং রাজনৈতিক দলগুলোর গঠনপ্রণালীর সঙ্গে পরিচিত হন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারতে ফিরে এসে জাতীয় কংগ্রেসকে 'জনসাধারণের-সর্বহারাদের' প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার জন্য প্রয়াসী হন।

উল্লেখ্য এই, উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে সমাজ-তান্ত্রিক ভাবধারা প্রবেশ করলেও তা কোনো তত্ত্বগত এবং সংগঠিত রূপ পায় নি। অগ্রসর বুদ্ধিজীবী সমাজ উদারনৈতিক-গণতান্ত্রিক-মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রমজীবী জনসাধারণের দুরবস্থা লাঘবের চেষ্টা করেন; শ্রমজীবী জনসাধারণের আধিপত্য স্থাপনের প্রশ্নটি তাঁদের চিন্তায় গুরুত্ব পায় নি। তাঁদের মধ্যে ব্যতিক্রম ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। তিনি ধর্ম ও সমাজতন্ত্রবাদ সম্বন্ধে বিস্তৃত বিশ্লেষণ করে তাঁর নিজস্ব মত ব্যক্ত করেন। ভারতে তাঁর অগ্রবর্তী ও সমসাময়িক ব্যক্তিদের দ্বারা রচিত পটভূমি এবং ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক ভাবধারা বিবেকানন্দ-মানস গঠনে সহায়ক হয়। কখন বিবেকানন্দ ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হন? খুব স্পষ্ট করে উত্তর দেবার মতো তথ্য না পাওয়া গেলেও খানিকটা অনুমান করা যায়। ছাত্রজীবনে যিনি 'পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান আকণ্ঠ পান' করেন এবং যাঁর মতো ছাত্র সে যুগে জার্মান বিশ্ব-বিদ্যালয়েও 'বিরল' ছিল, তাঁর পক্ষে হয়তো তখনই ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হবার সুযোগ ঘটে। পরে আমেরিকা ও ইউরোপ পর্যটনের সময়ে তিনি বিভিন্ন ধরনের সমাজতন্ত্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং নিজের চিন্তাকে আরও সমৃদ্ধ করেন।

২

অবশ্য প্রথম থেকেই বিবেকানন্দের চিন্তা এক স্বতন্ত্র খাতে প্রবাহিত হয়। যে কয়টি পর্বের মধ্য দিয়ে তাঁর চিন্তার ও কর্মের প্রকাশ এবং ব্যাপ্তি ঘটে তা হল: (ক) ১৮৮৬-১৮৮৭: বরানগরে মঠ স্থাপন ও রামকৃষ্ণ পরমহংসের ভাবনাকে রূপদানের প্রয়াস; (খ) ১৮৮৮-১৮৯৩: বিবেকানন্দের ভারত পর্যটন এবং 'ভারতের দুঃখ দারিদ্রোর ভয়াবহ রূপ' সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা; (গ) ১৮৯৩-১৮৯৭: আমেরিকা ও ইংলনডে বেদান্ত ধর্ম প্রচার এবং উন্নত দেশগুলোর জীবনধারার সঙ্গে পরিচিতি; (ঘ) ১৮৯৭-১৯০২: বিবেকানন্দের সেবা ও শিক্ষাদর্শ প্রচারের প্রধান কেন্দ্ররূপে রামকৃষ্ণ মিশন। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রামকৃষ্ণ পরমহংসের জীবনাবসান হবার পরে বিবেকানন্দ তাঁর গুরুর ভাবনাকে রূপদান করতে অগ্রসর হন। তারপর থেকে ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ জুলাই তাঁর জীবনাবসানের সময় পর্যন্ত তিনি এক নতুন জীবন গড়ার জন্য নিরলস সাধনা করেন। তাঁর পরিচালনায় রামকৃষ্ণ মিশন এই দায়িত্ব পালন করে। বিবেকানন্দ যখন ভারতপর্যটনে বের হন তখনই এই দেশের জনসাধারণের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয়; উচ্চশ্রেণী থেকে নিম্নবর্গের শ্রমজীবী মানুষের

সঙ্গে তাঁর পরিচিতি ঘটে। আমেরিকা ও ইউরোপ পর্যটনের সময়ে তিনি ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার ও বিভিন্ন ধরনের সমাজতন্ত্রবাদের বিষয়ে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। এইভাবেই সমাজসংস্কার সম্বন্ধে বিবেকানন্দের চিন্তার প্রকাশ ঘটে।

বিবেকানন্দের ধর্মসাধনা জীবনবিচ্ছিন্ন আত্ম-কেন্দ্রিক সাধনা ছিল না। তাঁর আধ্যাত্মিক চিন্তার মূল বিষয়বস্তু ছিল মানুষ ও মানুষের সমাজ। তিনি অদ্বৈত-বেদান্ত-নির্ভর মানবসেবার আদর্শ প্রচার করেন। সমাজের আমূল পরিবর্তন করে এক নতুন মানবসমাজ গড়াই ছিল তাঁর ব্রত। বিবেকানন্দ কিছু-কিছু সংস্কার করে প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে অটুট রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর সঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর সমাজসংস্কারকদের পার্থক্য ছিল। তাঁরা সমাজের আমূল পরিবর্তনের কথা না বলে এদিক-ওদিক সমাজের সংস্কার করে সমাজকে পরিচ্ছন্ন করতে চেষ্টা করেন। তাছাড়া যাঁরা আইনের সাহায্যে সমাজসংস্কারের কথা বলেন তাঁদের মতেরও বিবেকা-নন্দ সমর্থক ছিলেন না। তিনি সমাজদেহের মূল রোগ নির্ণয় করে তার চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন। তাঁর মতে, 'হীনম্মন্যতা' হল মূল রোগ। হীনম্মন্যতার জন্যই এমন একটি ভাব মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে যে, আমাদের কিছুই ভালো নয়, পাশ্চাত্যের সবই ভালো। ভারতের সমাজসংস্কারকরা পাশ্চাত্যের দিকে তাকান, তার অনুকরণ করেন। ব্যষ্টি অথবা সমষ্টি উভয় ক্ষেত্রেই এই অনুকরণপ্রিয়তা লক্ষ করা যায়। বিবেকানন্দ মনে করেন, ভারতকে তার নিজের মতোই থাকতে হবে; নিজের শক্তি ও পদ্ধতি অনুযায়ীই ভারত তার সমস্যার সমাধান করবে। ভারত নিজের শক্তি ও ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন নয় বলেই পরের অনুকরণ করছে এবং পরমুখাপেক্ষী হয়েছে। প্রাচীন ঐতিহ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে ভারতবাসীকে আত্মবিশ্বাসী করে তোলাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। ভারতকে তার পুরাতন দিনে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার কথা তিনি কখনই চিন্তা করেন নি। তিনি ভারতকে তার নিজের মতো করেই এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়ে-ছিলেন। জীবনের এই সহজ ও স্বাভাবিক গতিপ্রবাহ সম্বন্ধে তাঁর সচেতন উপলব্ধি ছিল।

বিবেকানন্দের মতে, ভারত ধর্মপ্রাণ দেশ। ধর্ম-চিন্তাতেই ভারতের কৃতিত্ব। এখানে ধর্ম এই শিক্ষাই দেয় যে, 'সর্বভূতে ঈশ্বর বিদ্যমান।' সব মানুষই এক। যা কিছু পার্থক্য লক্ষ করা যায় তা শুধু 'প্রকাশের তারতম্যের' জন্য। কোনো-কোনো মানুষের মধ্যে 'ঈশ্বরের প্রকাশ বেশী', কোনো-কোনো মানুষের মধ্যে কম। কেউ সৎ, বুদ্ধিমান ও কর্মঠ; আবার কেউ-কেউ অসৎ, নির্বোধ ও অলস। কিভাবে তাদের সৎ, বুদ্ধিমান ও কর্মঠ করা যায়? বিবেকানন্দ বলেন, শিক্ষার গুণেই তা করা সম্ভব। তিনি এই কথাও ব্যক্ত করেন, সকল মানুষের মধ্যেই অনন্ত সম্ভাবনা আছে। সেই সম্ভাবনাকে বাস্তবে রূপ দেওয়াই হল জীবনের উদ্দেশ্য। কিন্তু, কিভাবে তা করা সম্ভব? এই প্রশ্নের আলোচনায় বিবেকানন্দ ব্যষ্টি ও সমষ্টির ভূমিকা বিশ্লেষণ করেন। তিনি বলেন, এই সম্ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে হলে ব্যক্তির যেমন সচেষ্ট হওয়া উচিত, তেমনি একই সঙ্গে সমাজের উৎসাহ ও সহানুভূতিও প্রয়োজন। তিনি এমন একটি সমাজের কথা ভাবেন, যেখানে সমাজ এই দায়িত্ব পালন করবে। ব্যষ্টি সমষ্টির জন্য এবং সমষ্টি ব্যষ্টির মঙ্গলের জন্য যথাসাধ্য করবে।

অদ্বৈত-বেদান্তের সূত্র ধরেই বিবেকানন্দ ভারতে 'এক শ্রেণীহীন, বর্ণহীন সমাজ' গড়ার স্বপ্ন দেখেন। এই চিন্তা কোথাও থেকে ধার করা নয়, ভারতের নিজস্ব চিন্তা। অদ্বৈত-বেদান্তেই তা পাওয়া যায়। কিন্তু, এই সমাজ কেমন হবে, এই প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন: 'আমি মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি, এই বিবাদ বিশৃঙ্খলা ভেদ করে ভবিষ্যতের পূর্ণাঙ্গ ভারত বৈদান্তিক মস্তিষ্ক ও ইসলামীয় দেহ নিয়ে মহামহিমায় অপরাজেয় শক্তিতে জেগে উঠেছে।' তাঁরই এই দৃঢ়

ধারণা ছিল, 'বেদান্তের মতবাদ যতই সূক্ষ্ম ও বিস্ময়কর হোক না কেন, ইসলাম ধর্মের সহায়তা ব্যতীত তা মানবসাধারণের অধিকাংশের নিকট, সম্পূর্ণরূপে নিরর্থক।' এই 'দুই মহান মতের সমন্বয়' সাধন করেই তিনি নতুন সমাজ গড়ার কথা বলেন। পৃথিবীতে যে শ্রেণীশাসনের ইতিহাস রয়েছে তা নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণ করে বিবেকানন্দ বলেন, ইতিহাসের আদি অধ্যায়ে ছিল 'ব্রাহ্মণ শাসন', তার-পর এল 'ক্ষত্রিয় শাসন', আরও পরে 'বৈশ্য শাসন', এবার 'শূদ্রের বা কায়িক শ্রমজীবীর শাসনের পালা।' তাঁর ভাষায়, 'এমন এক সময় আসবে, যখন শূদ্রত্ব সহিত শূদ্রের প্রাধান্য হবে। শূদ্রেরা ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের অধিকার পেয়ে শাসন করবে, তা নয়, নিজেদের শূদ্রকর্ম বজায় রেখেই সমাজে একাধিপত্য পাবে। তারই পূর্বাভাস পাশ্চাত্য জগতে দেখা যাচ্ছে। সোস্যালিজম্, এনার্কিজম্, নাইহিলিজম্ সেই বিপ্লবের অগ্রগামী ধ্বজা।' তিনি নিজেকে "সমাজতন্ত্রী" বলে উল্লেখ করেন। তবে তিনি এই পদ্ধতিকে নিখুঁত বলে মনে করেন নি। তাঁর মনোভাব ছিল, 'কিছু না-থাকার চেয়ে' সমাজতন্ত্রের 'দ্বারা কিছু তো পাওয়া যাবে।' তিনি এমন এক রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠন করতে চান যেখানে 'ব্রাহ্মণযুগের জ্ঞান, ক্ষত্রিয়যুগের সভ্যতা, বৈশ্যের সম্পত্তিসারণ-ক্ষমতা এবং শূদ্রের সাম্যের আদর্শ বজায় থাকবে অথচ তাদের দোষগুলি থাকবে না—তাহলে সেটি আদর্শ রাষ্ট্র হবে।' এই কথা বলেই তিনি পরমুহূর্তে একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেন: 'কিন্তু তা কি সম্ভব?' এই প্রশ্নের বিস্তৃত আলোচনা না করে তিনি বলেন: 'সে যাই হোক, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য —এই তিন শ্রেণীর শাসনের পালা শেষ হয়েছে, এবার শেষটির পালা। শূদ্র-শাসন আসবেই আসবে, কেউ তাকে রোধ করতে পারবে না।' বিবেকানন্দ জোর দিয়েই শূদ্রের জাগরণের ও আধিপত্য স্থাপনের কথা বলতেন। 'বিপ্লব ঘটবে', এই বিষয়েও তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। বিপ্লবের মধ্য দিয়েই শ্রমজীবীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হবে। প্রশ্ন হল: কোন্ দেশে ঘটবে এই বিপ্লব? এই বিষয়েও তাঁর সুনির্দিষ্ট মত ছিল। তাঁর কাছে 'পাশ্চাত্ত্য সমাজ নরক বলে' মনে হয়েছে। আমেরিকায় 'মানুষের অধিকার সাম্য রয়েছে' বলে তাঁর ধারণা ছিল। কিন্তু তাঁর 'সে বিশ্বাস নষ্ট হয়ে গেছে। ধনীদের স্বার্থপরতা, বিশেষাধিকার বজায় রাখার চেষ্টা, একনায়কতা, আমেরিকাকে গ্রাস করেছে।' সুতরাং পাশ্চাত্য সমাজের উপর তিনি আস্থা স্থাপন করতে পারেন নি। বিবেকানন্দ বলেন: 'ভাবী অভ্যুত্থান ঘটবে রাশিয়ায় বা চীনে। বলতে পারি না, ঠিক কোথায়। আমাদের শ্রমিক-সমস্যার সমাধান আমাদেরই করতে হবে। কিন্তু কী ভয়ঙ্কর সংক্ষোভ, কী ভীষণ আলোড়নের মধ্য দিয়ে তা ঘটবে! জাতিবর্ণ একাকার হয়ে যাবে।' উল্লেখ্য এই, মার্কস ও এঙ্গেলস ধরে নেন জার্মানি হবে 'ইউরোপীয় প্রলেতারিয়েতের প্রথম মহান বিজয়ের মঞ্চ।' শিল্পে অগ্রসর জার্মানির শ্রমিকশ্রেণী যে কয়টি গুণের অধিকারী ছিল তা হল রাজনৈতিক যোগ্যতা, শৃঙ্খলা, সাহস, উদ্যোগ ও অধ্যবসায়। তা ছাড়া জার্মানিতে শ্রমিক আন্দোলন ইংলন্ডের চেয়েও বেশ এগিয়ে ছিল। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে জার্মানির যে অতুলনীয় অগ্রগতি ঘটে তা লক্ষ করেই তাঁরা এই সিদ্ধান্ত করেন। অবশ্য তাঁরা এই কথাও বলেন, ইউরোপীয় শ্রমিকদের বিজয় 'অর্জিত হতে পারে অন্তত ইংলনড, ফ্রান্স আর জার্মানির সহযোগে।' কিন্তু বিপ্লব জার্মানিতে না ঘটে আগে ঘটল কৃষিনির্ভর রাশিয়ায়, পরে চীনে। ইতিহাসের তুখড় ছাত্র বিবেকানন্দ দু-দেশের গতিপ্রকৃতি লক্ষ করেই এই ধারণা করেন।

বিবেকানন্দ চান ভারতেও শূদ্রের জাগরণ ঘটুক। 'নতুন ভারত বেরুক' বলে তিনি ডাকও দেন। মেহনতি মানুষের হাত ধরেই এই ভারত বেরুবে। তাই তিনি বলেন: 'নতুন ভারত বেরুক, বেরুক লাঙল ধরে, চাষার কুটীর ভেদ করে, জেলে-মালা-মুচি-মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে, বেরুক মুদির

দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে, বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক ঝোড়-জঙ্গল-পাহাড়-পর্বত থেকে।' তাঁর মতে, যারা সহস্র বছর ধরে অত্যাচারিত তারাই এই নতুন ভারত গড়ে তুলবে। তিনি স্পষ্ট করেই বলেন: 'ভারতের ভরসার স্থল জনসাধারণ। মধ্যবিত্ত ও অভিজাতরা শরীরে মনে একেবারে মরে গেছে।' তথাকথিত ভদ্রলোকদের প্রতি তাঁর মনোভাব কী ছিল তাও লক্ষণীয়: 'আজ অর্ধ শতাব্দী ধরে ভারতের নানা স্থানে ঘুরে দেখলাম, সমাজসংস্কারসভায় দেশ পরিপূর্ণ। কিন্তু যাদের রক্তশোষণের দ্বারা "ভদ্রলোক"রা ভদ্রলোক হয়েছেন বা হচ্ছেন, তাদের জন্য একটি সভাও দেখলাম না। কিন্তু বড় মানুষেরা কোন্ কালে কোন্ দেশে কার কি উপকার করেছে? সকল দেশেই বড় বড় কাজ গরীবরা করে।' বিবেকানন্দ বলেন: 'সাধারণ যুক্তিতে শূদ্রশাসন অপ্রতিরোধ্য, কারণ জনসমষ্টির অধিকাংশই শ্রমজীবী —তারা আত্মনিয়ন্ত্রণ করতে চাইলে বাধা দেবার শক্তি কার?' কিন্তু শূদ্রদের 'আত্মশক্তি প্রয়োগের পথে' কতগুলো প্রতিবন্ধকতা রয়েছে। তাদের বিদ্যা নেই, একতা নেই, দৃঢ়তা ও অধ্যবসায়ের অভাব এবং অধিকার-তারতম্য। বিবেকানন্দ মনে করতেন, 'গরিব ও নিম্নজাতির মধ্যে বিদ্যা ও শক্তির প্রবেশ' করাতে না পারলে ভারতকে উন্নত করা সম্ভব নয়। তথাকথিত বড়মানুষ, পণ্ডিত ও ধনী ব্যক্তিরা হলেন 'শোভামাত্র, দেশের বাহার—কোটি কোটি গরিব, নীচ যারা, তারাই হচ্ছে প্রাণ।' এই জনগণকে অবহেলা করাই হল ভারতের জাতীয় 'অবনতির অন্যতম প্রধান কারণ'।

কোন্ পথে এই শূদ্রশাসন প্রতিষ্ঠিত হবে— রক্তপঙ্কিল পথ দিয়ে, অথবা শান্তিপূর্ণ পথে? বিবেকানন্দ চান শান্তিপূর্ণ পথেই এই পরিবর্তন আসুক। "হিংসা" এবং "অহিংসা" বিষয়ে তাঁর মনোভাব ছিল: 'অন্যায় করো না, অত্যাচার করো না, যথাসাধ্য পরোপকার করো, কিন্তু অন্যায় সহ্য করা পাপ, গৃহস্থের পক্ষে; তৎক্ষণাৎ প্রতিবিধান করতে চেষ্টা করতে হবে।···বলবানকে দুর্বলের উপরে অত্যাচার করতে দেখলে অবিলম্বে তাকে চূর্ণ করে ফেলবে। মনে রাখবে, বিদ্রোহে তোমার চির অধিকার।' 'সন্ন্যাসীর অহিংসা সাধারণের জন্যে নয়' বলেই তিনি মনে করেন। উচ্চশ্রেণী স্বেচ্ছায় নিম্নশ্রেণী অর্থাৎ শূদ্রদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দেবে কিনা, তা নিয়েও তাঁর ভাবনা ছিল। বিবেকানন্দ বলেন, ইউরোপ ও আমেরিকার মতো ভারতেও নিম্নজাতি জেগে উঠেছে। উচ্চ জাতিরা তাদের 'দাবাতে পারবে না'। এই অবস্থায় 'নিম্নজাতিদের ন্যায্য অধিকার পেতে সাহায্য করলেই উচ্চজাতিদের কল্যাণ।' আর 'তা না করলে ঘরাঘরি লাঠালাঠি করে উচ্চজাতি ধ্বংস হয়ে যাবে।' 'নিম্নজাতির মধ্যে বিদ্যাদান ও জ্ঞানদান করে তাদের ঘুম ভাঙাতে' উচ্চবর্ণের সচেষ্ট হওয়া উচিত। তা করলে ওরা 'উচ্চবর্ণের উপকার বিস্মৃত হবে না, কৃতজ্ঞ-বোধ করবে।' বিবেকানন্দ স্পষ্ট করেই বলেন, উচ্চ-শ্রেণীরা বিলীন হয়ে যাবে। তাই তাদের কর্তব্য হল 'নিজের সমাধি নিজে খনন করা। যত শীঘ্র এ কাজ তারা করবে, ততই তাদের মঙ্গল। যত বিলম্ব হবে, তারা মার খাবে তত বেশী, তাদের ধ্বংসের রূপ হবে তত ভয়ানক।' সুতরাং ব্রাহ্মণ প্রভৃতি উচ্চবর্ণের কর্তব্য হল অন্যান্য 'সকল জাতির উদ্ধারের চেষ্টা করা।' ব্রাহ্মণরা 'বহু শতাব্দীর শিক্ষা ও সংস্কারের রক্ষক' হয়ে আছে, তাদের তা আজ জনসাধারণের মধ্যে বিলিয়ে দিতে হবে। তারা উত্তরাধিকারসূত্রে যেসব উচ্চ চিন্তার অধিকারী হয়েছে তা তাদের উচ্চ-নীচ সমাজের সর্বস্তরে বিস্তৃত করতে হবে। পূর্বে তারা এই কর্তব্য পালন করে নি বলে 'ভারত সংঘবদ্ধ জাতি ছিল না', ইংরেজরা সহজেই ভারত জয় করতে সক্ষম হয়। বিবেকানন্দের সুদৃঢ় মত ছিল এই, 'জনগণ অধিকার না পেলে জাতি সংগঠিত হয় না।' তাই তিনি 'সর্বসাধারণের মধ্যে জ্ঞান ও অন্য অধিকার

বিস্তৃত' করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেন।

স্বেচ্ছায় ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়ার দৃষ্টান্ত অন্যত্র পাওয়া না গেলেও ভারতে তার সম্ভাবনার কথা বিবেকানন্দ উল্লেখ করেন। অদ্বৈত-বেদান্তের আদর্শ থেকেই তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছন। ভারতের ধর্মমত হল 'সাম্যবাদ'। কোন 'বিশেষ শ্রেণী বা সম্প্রদায় বিশেষ সুবিধা ভোগ করবে' তা অদ্বৈত-বেদান্ত সমর্থন করে না। অদ্বৈত-বেদান্ত সবাইকে 'মূলত এক' বলেই মনে করে। তাই সমাজে 'কেউ বিশেষ সুবিধা দাবি করতে পারে না'। কাউকে যদি সুবিধা দিতেই হয় তাহলে যে অনগ্রসর তাকেই দেওয়া উচিত। সামাজিক জীবনে ভোগ-অধিকারের ক্ষেত্রেও কোনো তারতম্য করা চলবে না। বিবেকানন্দের মতে, ব্রাহ্মণ, মুচি সবাই নিজ নিজ কর্মক্ষেত্রে বড়ো। কোনো কাজ বড়ো, কোনো কাজ ছোটো, এইভাবে নির্দিষ্ট করা যায় না। বিভিন্ন কর্মে নিযুক্ত ব্যক্তিদের চরিত্র অনুযায়ী বিচার হবে তাদের মধ্যে কে বড়ো আর কে ছোটো।

বিবেকানন্দ বলেন: 'কর্ম অনুসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হওয়া সমাজের স্বভাব। সে ভাগ থাকবে, কিন্তু চলে যাবে বিশেষ বিশেষ অধিকার-গুলি।' তিনি এই কথাও বলেন: 'অদ্বৈতবাদের কাজ হল, সকল বিশেষ অধিকারবোধকে ধ্বংস করে ফেলা।' মানুষে-মানুষে 'বাহ্য পার্থক্য' থাকবে, কিন্তু 'বিশেষাধিকারের বিলোপ' ঘটবে। ধনার্জনের শক্তির দ্বারা কেউ 'অসমর্থদের উপর পীড়ন চালাবে, তাদের পদদলিত করবে—এটা নীতিসঙ্গত নয়।' তার বিরুদ্ধেই সংগ্রাম করার কথা বিবেকানন্দ বলেন। তাঁর ভাষায়: 'অন্যকে বঞ্চিত করে নিজে সুবিধা ভোগ করার নামই অধিকারবাদ। এবং যুগ যুগ ধরে নীতিধর্মের লক্ষ্য—এই অধিকারবাদকে ধ্বংস করা। বৈচিত্র্যকে নষ্ট না করে সাম্য ও ঐক্যের দিকে অগ্রসর হওয়াই একমাত্র কাজ।'

'ভারতের আধ্যাত্মিক সম্পদ' থেকে চিরকাল বঞ্চিত হওয়া সত্ত্বেও ভারতের জনসাধারণের মধ্যে এত সততা ও উদারতা রয়েছে দেখে তাদের উপর বিবেকানন্দের আস্থা গভীর হয়। কিন্তু তিনি এই আশঙ্কা ব্যক্ত করেন, শূদ্রজাগরণের ফলে সমাজের নৈতিক মান নেমে যেতে পারে। শূদ্রজাগরণের ফলে জনসাধারণের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য বাড়লেও, শিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটলেও, একই সঙ্গে 'সমাজে অসাধারণ প্রতিভাশালী ব্যক্তির সংখ্যা কমে আসবে।' প্রকৃত-পক্ষে যেখানে 'শূদ্রবিপ্লব ঘটেছে' সেখানেই 'সাংস্কৃতিক মান নেমে গেছে।' ভারতে যাতে শূদ্রশাসনের যুগে এই অবস্থার সৃষ্টি না হয় সেজন্য তিনি সমগ্র দেশের উপর দিয়ে 'একটি আধ্যাত্মিক প্লাবন' ঘটাতে চান। বিবেকানন্দ শূদ্রের উন্নয়ন চাইলেও ব্রাহ্মণের অবনমন কামনা করেন নি। তিনি সবাইকে ব্রাহ্মণত্বে উন্নীত করার কথাই বলেন। তিনি মনে করেন, ধর্মের সারমর্ম উপলব্ধি করতে না পারার জন্যই ভারতে অস্পৃশ্যতা বিরাজ করছে। বর্ণাশ্রমপ্রথা গুণগত না হয়ে জন্মগত হওয়ার ফলে 'দুর্বলের পীড়নের হাতিয়ার' হয়েছে। এই অবস্থার প্রতিকারের কী উপায়? তিনি বলেন, শুধু আইন করে তা করা যাবে না। 'সবার মধ্যে ঈশ্বর বিরাজমান', বেদান্তের এই শিক্ষাকে সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। বেদান্তের এই বাণীকে বাস্তবে রূপ দিতে হবে।

বিবেকানন্দ বেদান্তনির্ভর যে সমাজের কথা ভাবেন তার সঙ্গে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির কোনো দ্বন্দ্ব নেই। বস্তুত, ভারতের প্রকট দারিদ্র্য তিনি বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির সাহায্যেই দূর করতে চান। তাই তিনি পাশ্চাত্য থেকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিতে চান, আর পাশ্চাত্যকে দিতে চান বেদান্ত। পাশ্চাত্যের কর্ম-দক্ষতা আর প্রাচ্যের আদর্শবাদের সমন্বয়ে তিনি এক নতুন জগৎ রচনার কথা বলেন। তিনি দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে বলেন, তার মাধ্যমেই সমগ্র জগতে শান্তি, মৈত্রী ও ঐক্য স্থাপন করা সম্ভব হবে। বিবেকানন্দ এই আশাও ব্যক্ত করেন, এই নতুন পৃথিবী গড়ার ক্ষেত্রে ভারত হবে পথপ্রদর্শক; তাঁর ভাষায় 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ। কিভাবে মানুষ 'পার্থিব ও অপার্থিব সম্পদ' অর্জন করতে পারে তা দেখাবে ভারত। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির সাহায্যে মানুষের জীবনকে স্বাচ্ছন্দ্যময় করতে হবে, একই সঙ্গে অধ্যাত্মবিচার সাহায্যে মানুষের চরিত্রকে মাধুর্যময় করতে হবে। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে যে সুপ্ত 'দেবত্ব' আছে তাকে জাগ্রত করেই তা করতে হবে। একজন ব্যক্তি বুদ্ধ হতে পারলে প্রত্যেকেই বুদ্ধ হতে পারে। বিবেকানন্দের ভাবনায় 'আদর্শ সমাজ' হল সেই সমাজ যেখানে প্রত্যেক মানুষ ভোগের প্রচুর উপকরণ পাবে, একই সঙ্গে সেই সমাজ মানুষকে দেবত্বের দিকে এগুতে সাহায্য করবে।

৩

বিবেকানন্দের 'আদর্শ সমাজ' গঠনের পক্ষে অনুকূল উপাদান ভারতে কতটা পাওয়া যায়? শান্তিপূর্ণ পথে ভারতে কি সমাজরূপান্তর সম্ভব? 'শূদ্রের শাসন' কি প্রতিষ্ঠিত হবে? ১৯৫০ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত ভারতীয় সংবিধান যে ভিত্তিটি স্থাপন করেছে তা থেকে আমাদের ভাবনাকে খানিকটা প্রসারিত করা যায়। সংবিধানে ভারতের সকল অধিবাসীদের জন্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচারের কথা বলা হয়েছে। আইনের কাছে সবাই একই রকম সুযোগ-সুবিধা পাবে; প্রত্যেকের চিন্তার, মতপ্রকাশের ও ধর্মের স্বাধীনতা থাকবে। লঘ্যালঘু, তপশিলী ও অন্যান্য পিছিয়ে-পড়া জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। বিশ্বশান্তি ও মানবকল্যাণের জন্য ভারতীয় প্রজাতন্ত্র দায়িত্ব পালন করবে। এই আদর্শ ভারতীয় সংবিধানের মুখবন্ধে প্রতিফলিত হয়েছে।

সংবিধানের 'নির্দেশমূলক নীতি' কার্যকর না করার জন্য সরকারকে আদালতে অভিযুক্ত করা না গেলেও নির্বাচনের সময়ে নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে সরকারকে কৈফিয়ত দিতে হয়। নির্দেশমূলক নীতিগুলোর গুরুত্ব এই দিক থেকে, সাংবিধানিক উপায়ে ভারতের সমাজ-ব্যবস্থায় রূপান্তর সাধন করার কথা এবং 'সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে'র উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়িত করার কথা সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা হয়েছে। বস্তুত সুপ্রীম কোর্ট নির্দেশমূলক নীতি-গুলোর প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে এবং এই নীতিগুলোর ভিত্তিতে সামাজিক স্বার্থে প্রণীত বিভিন্ন আইনের ব্যাখ্যা ও বৈধতা বিচার করে। তার ফলে নির্দেশমূলক নীতিগুলোর আইনগত গুরুত্ব ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনসাধারণ নিজেদের অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছে, এবং তাদের মনে নতুন আশা-আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত হচ্ছে। সংবিধানে প্রথমে ভারতকে 'সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র' হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৭৬ খ্রীষ্টাব্দে তার সঙ্গে 'সমাজতান্ত্রিক ধর্ম-নিরপেক্ষ' শব্দ সংযোজন করে ভারতকে 'সার্বভৌম সমাজতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ প্রজাতন্ত্র' হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এইভাবে সংবিধানের মাধ্যমে সমাজ-রূপান্তরের পক্ষে সহায়ক পরিবেশ তৈরি হয়।

গত চল্লিশ বছর ধরে ভারতে শিল্পের বিকাশ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি, খাদ্যশস্যের উৎপাদনবৃদ্ধি ইত্যাদির মধ্য দিয়ে 'বস্তুগত সভ্যতার' অগ্রগতি ঘটেছে। তা ছাড়া মূল্যবোধ জাগ্রত করে একটি সংহত সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলারও প্রয়াস চলছে। তা সত্ত্বেও নানা সমস্যা সমগ্র দেশে এক ভয়ানক অস্থিরতার সৃষ্টি করেছে। জনসমষ্টির এক বৃহত্তর অংশের প্রকট দারিদ্র্য, শিল্পে উৎপাদনবৃদ্ধি সত্ত্বেও আয় ও বণ্টনের সমস্যার তীব্রতা, ক্রমবর্ধমান সামাজিক বৈষম্য, সম্প্রদায়গত, ভাষাগত ও অঞ্চলগত বিরোধ, সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার ক্ষতিসাধন জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ভিতটি দুর্বল করে ফেলছে। 'অধিকারবাদ' গণ-উদ্যোগের পথে অন্তরায়ের সৃষ্টি করছে। লোভ ও স্বার্থপরতা সমগ্র জীবনধারাকে সংকটময় করে তুলছে। সর্বত্র এক অস্বাভাবিক পরিস্থিতি বিরাজ করছে। এই অবস্থা থেকে

পরিত্রাণের পথ কোথায়? সাংবিধানিক পদ্ধতিতে কতটা এগুনো সম্ভব? এইসব প্রশ্নের আলোচনায় বিবেকানন্দের সমাজভাবনার উল্লেখ প্রাসঙ্গিক বলেই মনে হবে। সংবিধান যে ভিতটি রচনা করেছে তার ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা অনেক। তা সত্ত্বেও সাংবিধানিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ক্ষমতা দখলের প্রক্রিয়াটি সচল এবং বিচারব্যবস্থা এখনও অকেজো হয়ে পড়ে নি। তাই ত্রুটি-বিচ্যুতি দূর করে সংবিধানের নির্দেশমূলক নীতিগুলোকে কার্যকর করার সম্ভাবনা রয়েছে; আইনের শাসনকে আরও ব্যাপ্ত, সুদৃঢ় করার সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয় নি। উল্লেখ্য এই, সব দলই তো শান্তিপূর্ণ পথে সমাজপরিবর্তনের কথা বলছে, সাংবিধানিক লড়াই করে কেন্দ্র থেকে রাজ্যে অধিক ক্ষমতা অর্জনের চেষ্টা করছে এবং বাম-গণতান্ত্রিক ঐক্য গড়ে কেন্দ্রে নতুন সরকার গঠনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। বারে বারে সংবিধান সংশোধন করে যাতে কেন্দ্রীয় সরকার সংবিধানের মূল আদর্শ বিস্মিত করতে না পারে তার জন্য বিভিন্ন বিরোধী দল থেকে প্রতিবাদ ধ্বনিত হচ্ছে। এইসব তথ্য থেকে বোঝা যায়, সংবিধানের সম্ভাবনা যে নিঃশেষ হয়নি সে সম্বন্ধে সব দলই সচেতন। প্রকৃতপক্ষে এই সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যে তো বেশ দীর্ঘকাল ধরেই বামপন্থী দলগুলো কয়েকটি রাজ্যে সরকার গঠন করতে সক্ষম হয় এবং জনস্বার্থের উপযোগী কার্যক্রম গ্রহণ করে নিম্নবর্গের মানুষের অবস্থার উন্নয়নে সহায়ক হয়। মার্কসবাদীরা বুর্জোয়া রাষ্ট্রিক কাঠামোর মধ্যে সংবিধানসম্মত পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখল করে রয়েছেন, এমন উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত তো ভারতেই মিলছে। ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে লেনিন বলেন, একটি বৃহৎ দেশে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হলে তার পার্শ্ববর্তী ক্ষুদ্র দেশের বুর্জোয়ারা শান্তিপূর্ণভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে পারে, এমন সম্ভাবনা রয়েছে। সব সময়ে এবং প্রতিটি অবস্থায় সশস্ত্র সংগ্রাম হল আন্দোলনের বাধ্যতামূলক পদ্ধতি, এই তত্ত্বও লেনিন বর্জন করেন। প্রতিটি সুযোগ গ্রহণ করে শান্তিপূর্ণ উত্তরণ সাধন করাই 'প্রলেতারীয় বিপ্লবের জন্য বাধ্যতামূলক'। অবশ্য বুর্জোয়ারা কিভাবে বলপ্রয়োগ ও সন্ত্রাস অবলম্বন করছে এবং তারা কিভাবে শান্তিপূর্ণ উত্তরণের পথটি বিঘ্নিত করছে, সে বিষয়ে প্রলেতারীয়দের সচেতন থাকতে হবে। বস্তুত, মার্কসবাদী-লেনিনবাদী চিন্তানায়করা বুর্জোয়াদের প্রবর্তিত হিংসা পরিহার করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন করতে আগ্রহী ছিলেন, কারণ শান্তিপূর্ণ উত্তরণই প্রলেতারীয়দের কাছে সুবিধাজনক। মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) তাঁদের কর্মসূচীতে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে জনগণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করার এবং সমাজতন্ত্রে উত্তরণের কথা বলেন। সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে হলেও শান্তিপূর্ণ পথে সমাজরূপান্তরের সম্ভাবনার বিষয়ে বিবেকানন্দের ভাবনার সঙ্গে মার্কসবাদী তত্ত্ববিদ্‌দের চিন্তার খানিকটা মিল পাওয়া যায়।

সংবিধানে যে আদর্শ ব্যক্ত হয়েছে তার সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করে প্রশাসনব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হয়নি; আমলাতান্ত্রিকতার শক্তি হ্রাস করা হয় নি। জনসাধারণের প্রতি প্রশাসকদের দায়-দায়িত্ব প্রশাসনব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয় নি। পুরনো আমলের ঔপনিবেশিক আমলাতান্ত্রিক কাঠামোকে সম্পূর্ণ বর্জন করে, সদাচারের আদর্শ অবলম্বন করে, প্রশাসনব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করা হয় নি। সুতরাং জনসাধারণের প্রতি দায়বদ্ধ প্রশাসনব্যবস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমেই শান্তিপূর্ণভাবে উত্তরণের পথটি প্রশস্ত হতে পারে। এখানেই বিবেকানন্দ-প্রচারিত সদাচারের আদর্শের গুরুত্ব। এমনকি পার্থিব সম্পদ সুষম বণ্টনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করা গেলেও তা কার্যকর করার জন্য কোনই প্রয়াস লক্ষ করা যায় না। অথচ কত আগে বিবেকানন্দ এই নিয়ে চিন্তা করেন। তাঁর মতো তো এমন স্পষ্ট করে সেই সময়ে এই কথা আর কারও কণ্ঠে শুনতে পাওয়া যায় নি: 'সমাজে

কোন ভোগাধিকারের তারতম্য থাকা উচিত নয়।' তিনি পার্থিব সম্পদ এমনভাবে বণ্টনের কথা বলেন যাতে মানুষের জীবন স্বাচ্ছন্দ্যময় হয়ে উঠতে পারে। বহুধর্ম ও ভাষার দেশ ভারতে বিবেকানন্দ যে 'পরমত-সহিষ্ণুতা' ও 'সর্ববিধ মত স্বীকার' করার শিক্ষা দেন, তার গুরুত্ব বর্তমান পরিবেশে বিশেষভাবে অনুভূত হবে। তিনি 'সকল ধর্মই সত্য' বলে বিশ্বাস করতেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই নিজ-নিজ ধর্মের প্রতি অনুগত থেকে অন্য ধর্মের প্রতি মানুষের মনে শ্রদ্ধার ভাব জাগ্রত করতে চেষ্টা করেন, প্রতিটি মানুষের মধ্যে 'সুপ্ত দেবত্ব'কে বিকশিত করতে প্রয়াসী হন। মানুষকে 'নিম্নতর সত্য থেকে উচ্চতর সত্যে' পৌঁছনোর পথটি নির্দিষ্ট করেন। তিনি 'সদাচারে' ও 'আধ্যাত্মিকতায়' কোনো পার্থক্য করেন নি। তাঁর ভাষায় 'মানুষের সেবায় ও ভগবানের পূজায় কোন পার্থক্য নেই।' তিনি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্ব স্বীকার করে ভোগের উপকরণের সঙ্গে দেবত্বের উপকরণের সমন্বয়ে নতুন সমাজ গঠনের কথা বলেন। সাম্প্রতিককালে ভারতের পরিকল্পিত অর্থনীতির উদ্দেশ্য, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রতি গুরুত্ব, শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ গড়ে তোলার প্রয়াস ইত্যাদির মধ্যে বিবেকানন্দের চিন্তার খানিকটা প্রতিধ্বনি পাওয়া গেলেও তা কার্যকর হচ্ছে না; এখনও সমাজের বৃহত্তর অংশ অজ্ঞানতা ও প্রকট দারিদ্র্যে নিমজ্জিত। বর্তমান আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থায় যেসব উচ্চবর্গের মানুষরা কর্ণধার হয়ে বসে আছেন তাঁদের উপর ভরসা রাখার জায়গা কোথায়। বিবেকানন্দ নিজেও এইসব বড়োলোকদের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ ব্যক্ত করেন। যেসব বড়লোক দরিদ্রদের 'পিষে টাকা রোজগার করে জোঁকজমক' দেখিয়ে বেড়ায় তাদের তিনি 'পামর' বলেন। আর ভারতকে শ্মশানে পরিণত করার জন্য ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বলিষ্ঠ মনোভাব ব্যক্ত করেন। বিবেকানন্দের সময়কালের সঙ্গে বর্তমান সময়কালের নানা দিক থেকে পার্থক্য থাকলেও ভারতের বর্তমান অবহেলিত নিষ্পেষিত মানুষগুলোর দিকে তাকালে বিবেকানন্দের ভাষাতেই কি সংবেদনশীল ব্যক্তিরা প্রচলিত ব্যবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্য করবেন না?

কারা এই ব্যবস্থা ভেঙে নতুন সমাজ গড়ার পথ দেখাবেন? বিবেকানন্দ বলেন, 'খাঁটি চরিত্র', 'সত্যকার জীবন' ও 'দেবমানবই' পথ দেখাবেন। অসংখ্য খাঁটি মানুষের সম্মিলিত প্রয়াসে সমাজটাকে পালটাতে হবে। শত-শত বুদ্ধ তৈরি করে ভারতের অগণিত পদদলিত মানুষকে উদ্ধার করতে হবে। তিনি বলেন: 'অনন্ত প্রেম ও করুণাকে বুকে নিয়ে শত-শত বুদ্ধের আবির্ভাব প্রয়োজন।' 'বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য' আত্মনিবেদিত প্রাণের প্রয়োজন। অনেক কাল আগে লক্ষ-লক্ষ পদদলিতের পরিত্রাতারূপে বুদ্ধের আবির্ভাব ঘটেছিল। বিবেকানন্দের দৃঢ় প্রত্যয় ছিল, বুদ্ধের মতো অসংখ্য বুদ্ধ ভারতে তৈরি হবে। তার ফলেই ভারত এগিয়ে যেতে পারবে, অন্য সবাইকে ভারত পথ দেখাবে। তাই তাঁর কণ্ঠে শোনা যায় 'এবার কেন্দ্র ভারতবর্ষ'। এ কি নিছক ভাববাদী কল্পনা? উনিশ শতকের শেষে ও বিশ শতকের প্রায় অর্ধাংশ জুড়ে বিবেকানন্দের প্রভাবে ভারতের আত্মপ্রতিষ্ঠার সংগ্রামে বহু আত্মত্যাগী মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল, একটি প্রবল তরঙ্গমালা ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে সৃষ্টি হয়েছিল। তা হয়তো পূর্ণ পরিণতির দিকে এগিয়ে যেতে পারে নি। আবার হয়তো অদূর ভবিষ্যতে দরিদ্র-পদদলিতদের জন্য অসংখ্য বুদ্ধের আবির্ভাব এই ভারতেই ঘটবে, যাঁরা তাদের মুক্তির পথ দেখাবেন। তাঁরাই প্রচলিত ব্যবস্থাটি ভেঙে ফেলবেন, নতুন সমাজ গড়ে তুলবেন। 'মহাতরঙ্গ আসছে'—বিবেকানন্দের এই ঘোষণা তাই নিছক কল্পনা বলে মনে হবে না, বিশেষ করে সংকট-জর্জরিত ভারতের বর্তমান পরিস্থিতির কথা ভাবলে।

মনে প্রশ্ন জাগবে, কারা বিবেকানন্দের ভাবনা অনুযায়ী সমাজরূপান্তরের দায়িত্ব পালনে সক্ষম শত-

শত বুদ্ধ তৈরি করবেন? বিবেকানন্দের আদর্শের অনুগামী রামকৃষ্ণ মিশন ও অন্যান্য কিছু প্রতিষ্ঠান এই দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। কিন্তু সমগ্র ভারতের প্রেক্ষাপটে তাঁদের প্রভাব কতটুকু আমাদের জীবনধারায় পড়ছে? কত কাল লাগবে বিবেকানন্দের 'আদর্শ সমাজ' ভারতে প্রতিষ্ঠিত করতে? এই প্রশ্নের আলোচনায় ভারতের গণতান্ত্রিক ও বামপন্থী দলগুলোর, বিভিন্ন সংস্থার ও ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হয়। সকলের সমবেত প্রয়াসে সংবিধানের ত্রুটিগুলো অপসারিত করে সংবিধানের মৌল আদর্শগুলোকে বাস্তবে রূপ দেবার উদ্যোগ গ্রহণ করে এবং আধ্যাত্মিক-সাংস্কৃতিক আন্দোলনের প্রবাহ সৃষ্টি করে ভারতীয় জনমানসকে নতুন চেতনায় উদ্দীপ্ত করতে পারলে এই ভারতই এক নতুন সমাজ গঠনের পথ প্রদর্শন করতে পারে। এই সম্ভাবনার কথা লঘু করে ভাববার কারণ নেই।

একটি দৃষ্টান্ত দিয়ে আলোচনার বিরতি টানছি। ভারতীয় সংবিধানে সরকারকে গ্রাম পঞ্চায়েত গঠনের নির্দেশ দেওয়া হয়। এই গ্রাম পঞ্চায়েতকে এমন সব ক্ষমতা দেওয়া হয় যাতে তা 'স্বশাসিত সরকারি কেন্দ্র' হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারে। এই 'পঞ্চায়েতিরাজ' স্থাপন করে সর্বনিম্ন স্তরে গণউদ্যোগ বৃদ্ধি করা, বিভিন্ন সরকারি পরিকল্পনা কার্যকর করা এবং গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থাকে সমৃদ্ধ করা সম্ভব ছিল। তাতে জনসাধারণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাকে উন্নত করা সহজ হত। কিন্তু বাস্তবে তা হয় নি। তার ফলে অবস্থা পর্যালোচনা করার জন্য কয়েকটি পর্যবেক্ষক টিম ও কমিটি গঠন করা হয়েছে। তাদের রিপোর্টে পঞ্চায়েতকে সাংবিধানিক ক্ষমতা দেওয়ার এবং পর্যাপ্ত অর্থ দেওয়ার কথা বলা হয়েছে। উদ্দেশ্য হল সাধারণ গ্রামীণ মানুষকে উন্নয়নমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করা। দুর্ভাগ্যবশত এইসব কমিটি ও টিমের সুপারিশ কার্যকর করার বিশেষ প্রয়াস লক্ষ করা যায় না। পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রন্ট সরকার এইসব সুপারিশের প্রেক্ষাপটে পঞ্চায়েত রাজ আইনের সংশোধন করে গ্রামপঞ্চায়েতের নির্বাচনব্যবস্থা করে কোনো-কোনো ক্ষেত্রে সাফল্যলাভ করেছেন। পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েতের নির্বাচিত সংস্থাসমূহে তিন-চতুর্থাংশ সদস্য নিম্ন ও মধ্যবর্গের গ্রামের সাধারণ মানুষ; তার ফলে গ্রামীণ জীবনে ধনী-জোতদার ও জমিদারদের প্রভাবে যথেষ্ট হ্রাস পেয়েছে। বাড়তি জমি বণ্টনে ও 'অপারেশন বর্গা' প্রথায় গ্রাম পঞ্চায়েতের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত সব সমস্যা সমাধান করে গ্রামীণ জীবনকে সুষ্ঠুভাবে গড়ে তুলছে, এই দাবি কেউ করছে না। কিন্তু নির্বাচিত পঞ্চায়েতব্যবস্থাকে ও তার উপরে ক্ষমতা অর্পণকে একটি সঠিক পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করা যায়। এই পঞ্চায়েতের সঙ্গে যদি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের ও সৎ ব্যক্তিদের সংযোগসাধন করে পঞ্চায়েতের কর্মসূচী কার্যকর করার সচেতন প্রয়াস হয়, তাহলে বর্তমান সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই গ্রামীণ জীবনকে রূপান্তরিত করা সম্ভব। ভারতের প্রতি গ্রামেই দু-একজন বুদ্ধ পাওয়া যাবে। তাঁদের এই কাজের সঙ্গে যুক্ত করার সচেতন প্রয়াস করা প্রয়োজন। এখানেই পঞ্চায়েতকে কেন্দ্র করে ব্যষ্টি ও সমষ্টি পরস্পরের সহায়ক হিসেবে কাজ করবার সুযোগ পাবে, সচেতন-সংবেদনশীল মানুষ গড়ে তোলা সহজ হবে। শত-শত বুদ্ধ তৈরির ক্ষেত্র হতে পারে এই পঞ্চায়েত। বিবেকানন্দ 'সদাচার' ও 'আধ্যাত্মিকতা'র সম্মিলনে যে 'আদর্শ সমাজ' গঠনের স্বপ্ন দেখেন, গ্রাম পঞ্চায়েত তাতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে পারে। আর তা সাংবিধানিক পদ্ধতিতেই সম্ভব। এমন কি সংবিধানে উল্লেখিত আরও কয়েকটি ক্ষেত্রকেও একই উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যায়। বস্তুত, ভারতের বর্তমান আর্থ-সামাজিক গড়নের দিকে তাকালেই বিবেকানন্দের সমাজভাবনার প্রাসঙ্গিকতা উপলব্ধি হয়। ব্যক্তির সততার উপরে তিনি যে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন তার প্রয়োজনীয়তা আমাদের জীবনধারায় যে

অপরিসীম, তা বলাই বাহুল্য। ব্যক্তির মুক্তির প্রশ্ন নিয়ে ফ্রিডরিখ এঙ্গেলসও গভীরভাবে চিন্তা করেন। তাঁর "অ্যানটি-ড্যুরিং" গ্রন্থে এই বিষয়ে আলোচনা পাওয়া যায়। এই গ্রন্থে এঙ্গেলস লেখেন: 'Society cannot free itself, unless each individual is freed' (প্রতিটি ব্যক্তি মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সমাজ নিজেকে মুক্ত করতে পারে না)। সম্প্রতি চীনেও 'সমাজতান্ত্রিক আধ্যাত্মিক সভ্যতা' গড়ার জন্য 'ব্যক্তির মুক্তি'র প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বিবেকানন্দের সমাজভাবনাতেও তার উপাদান পাওয়া যায়। খাঁটি মানুষরাই সুস্থ-সবল-সমাজ গঠনে সহায়ক হতে পারে বলে তাঁর দৃঢ় প্রত্যয় ছিল। এই খাঁটি মানুষ গড়ার দায়িত্ব পালনে বিবেকানন্দের দিকে আমাদের তাকাতে হবে।

"প্রায়শ্চিত্ত" ও বাঙলার কৃষকের মৌল অধিকার রক্ষার প্রসঙ্গ

কান্তি গুপ্ত

১৯২২ সালে প্রকাশিত "মুক্তধারা" নাটকের সঙ্গে সকলেরই অল্পবিস্তর পরিচয় আছে। এই নাটকের ধনঞ্জয় বৈরাগীও অপরিচিত নয়। নিসহায়, নিরুপায় মানুষের সপক্ষে চলমান ধনঞ্জয়ের লক্ষ্য, সংগ্রাম নিশ্চয়ই! কিন্তু, দূর থেকে, নেতার ভিড় সত্তা নিয়ে নয়—লোকসাধারণের একজন হয়েই। শিবতরাইয়ের মানুষ উত্তরকূটের সাম্রাজ্যবাদী অপচেষ্টার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে আপন শক্তির ওপর নির্ভর করে। আপনাকে বুঝে নিয়ে আপনাকে রক্ষার দায়িত্ব নেবে। অপরের ভাবনা, অপরের নির্দেশের দাসত্ব স্বীকার করে নয়।

ধনঞ্জয় তো রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। সুতরাং শিক্ষিত বুদ্ধিমান উচ্চাভিমানী এমন কাউকে নেতা বানিয়ে নয়, লোকসাধারণ অগ্রসর হোক আপনাকে ভরসা করেই—এরকম ভাবনায় ধনঞ্জয়-অঙ্কন থেকে স্রষ্টা ভ্রষ্ট হন নি। ধনঞ্জয় চরিত্রটি আমাদের জানায় যে, লোকসাধারণের নেতা বনে অপরের সম্মান বয়ে বেড়াতে সে গররাজি। লোকসাধারণের সম্মানকে নিম্ন করা তার ধাতে নয় না। নেতার সঙ্গে লোকসাধারণের সম্পর্ক হয়ে দাঁড়ায় মহাজন আর খাতকের। স্থদস্বরূপ মহাজনকে যা দিতে হয়, তা মৃত্যুর বাড়া! আত্মসম্মান।

এসব কথা, "মুক্তধারা"তে ধনঞ্জয়ের আচরণ, কথোপকথন, গান অনুসরণ করলেই অনুভূত হয়। বানানোর প্রয়োজন নেই। "মুক্তধারা" থেকেই দেখে নেওয়া যেতে পারে।

ধনঞ্জয়। আমারে পেয়ে আপনাকে হারাবি? এত বড়ো লোকসান মেটাতে পারি এমন সাধ্য কি আমার আছে? বড়ো লজ্জা পেলুম।

ধনঞ্জয়ের লজ্জার কারণটি সুস্পষ্ট। শিবতরাইয়ের মানুষ ওকে দেবতা বলে জেনেছে। তাতে, ওরা 'আসল দেবতা পর্যন্ত পৌঁছল না।' ভিতর থেকে যিনি ওদের চালাতে পারতেন, বাইরে থেকে ধনঞ্জয় তাকে রেখেছে ঠেকিয়ে। ধনঞ্জয়কে পুজো দিয়ে ওরা অন্তরে-অন্তরে দেউলে হতে চলল। সে দেনার দায় যে ধনঞ্জয়ের ঘাড়ে পড়বে, দেবতা ছাড়বেন না।

ধনঞ্জয়ের কথাগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে "লোকহিতে" রবীন্দ্রনাথের গল্পে। "লোকহিত" লেখা হয়েছিল "প্রায়শ্চিত্তে"র পরে, ১৯১৪ সালে।

'পরের ভাবনা ভাবা তখনই সত্য হয়, পর যখন আমাদিগকে ভাবাইয়া তোলে। অন্যগ্রহ করিয়া ভাবিতে গেলে কথায় কথায় অন্যমনস্ক হইতে হয় এবং ভাবনাটা নিজের দিকেই বেশি করিয়া ঝোঁকে।'

ধনঞ্জয়ের আবির্ভাব "মুক্তধারা"র তেরো বছর আগে, ১৯০৮ সালে। "মুক্তধারা"র তেরো বছর আগে রচিত হয়েছিল "প্রায়শ্চিত্ত" নাটক। অতঃপর ধনঞ্জয় রয়ে গেছে ১৯২৯ সালে, "পরিত্রাণ" নাটকেও। "মুক্তধারা"য়, বৃহত্তম পটভূমিকায় ধনঞ্জয় শিবতরাইয়ের মানুষের সঙ্গে। "প্রায়শ্চিত্তে" মাধবপুরের কৃষক প্রজাকুলের পক্ষে। "পরিত্রাণ" তো "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকেরই রূপান্তর। সুতরাং মাধবপুরের প্রজাদের সঙ্গে ধনঞ্জয়ের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয় নি।

"প্রায়শ্চিত্ত" নাটকের অবলম্বন "বউঠাকুরানীর হাট" (১৮৮১-৮২) উপন্যাস। নাট্যকার লিখেছেন, 'নাটকটি প্রায় নতুন গ্রন্থের মতোই হইয়াছে।' "বউঠাকুরানীর হাটে" ধনঞ্জয় অনুপস্থিত। "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকে প্রতাপাদিত্যের সংসার-জীবন বর্ণনা প্রসঙ্গে সমান্তরাল অগ্রসর হয়েছে প্রতাপাদিত্যের রাজত্বের অরাজক অবস্থা। মাধবপুরের প্রজাদের অভাব-অভিযোগের কথা। মাধবপুরের প্রজাকুলের প্রসঙ্গ, ধনঞ্জয়-প্রসঙ্গ "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকের ঘটনাবেগের অঙ্গীভূত এবং অপরিহার্য অংশ। ধনঞ্জয় নাটকের টাইপ-চরিত্র নয় বা ড্রামাটিক রিলিফের উপাদান রূপেও ব্যবহৃত হয় নি। তাহলে, বৈরাগী সেজে একতারা নিয়েই তাকে মঞ্চে বিহার করতে হত। "প্রায়শ্চিত্তে" ধনঞ্জয় সংযোজিত হল নাটকের মূল রেখাঙ্কের সঙ্গে। নাট্যকারের দাবি, 'নতুন গ্রন্থের মতো হইয়াছে'—মেনে নিতেই হয়। ধনঞ্জয় আবির্ভূত হয়েছে নাট্যকারের বিশেষ মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত।

"প্রায়শ্চিত্তে"র ধনঞ্জয় চরিত্র নিয়ে বিশ্লেষকজন নানাবিধ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। কেউ-কেউ 'মহাত্মা গান্ধীর পূর্বাবতার'কে লক্ষ করেছেন। ধনঞ্জয়ের আন্দোলনধারাটি 'টলস্টয়ের নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধ নীতির প্রতিবিধান' রূপে অনুমিত হয়েছে। ১৯০৮ সালের ধনঞ্জয় সম্পর্কে আলোচনায় ১৯২১ সালের অসহযোগ আন্দোলনের মহান স্রষ্টা গান্ধীজীর কথা মনে পড়া অস্বাভাবিক নয়। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আমাদের এ সুযোগ দিয়েছেন, 'সত্যের আহ্বান' প্রবন্ধে।

'মহাত্মা গান্ধী এসে দাঁড়ালেন ভারতের বহু কোটি গরিবের দ্বারে—তাদেরই আপন বেশে এবং তাদের সঙ্গে কথা কইলেন তাদের আপন ভাষায়। এ একটা সত্যকার জিনিস, এর মধ্যে পুঁথির কোনো নজির নেই।, ...'মহাত্মা তাঁর সত্যপ্রেমের দ্বারা ভারতের হৃদয় জয় করেছেন, সেখানে আমরা সকলেই তাঁর কাছে হার মানি। এই সত্যের শক্তিকে আমরা প্রত্যক্ষ করলুম, এজন্য আজ আমরা কৃতার্থ।'

কিন্তু, ধনঞ্জয় আর গান্ধীজী যে সম্পূর্ণ আলাদা, এই একই প্রবন্ধে সে কথাও সজোরেই প্রকাশ পেয়েছে, অনুচ্চারিত থাকে নি।

'মহাত্মা'জির কণ্ঠে বিধাতা ডাকবার শক্তি দিয়েছেন, কেননা তাঁর মধ্যে সত্য আছে; অতএব এই তো ছিল আমাদের শুভ অবসর। কিন্তু তিনি ডাক দিলেন একটিমাত্র সংকীর্ণ ক্ষেত্রে।'

রবীন্দ্রচেতনায় প্রতীক্ষা ছিল : 'আয়ন্ত সর্বতঃ স্বাহা, তারা সকল দিক থেকেই আসুক।'

'দেশের অন্তঃকরণকে সকল দিক থেকে পূর্ণ উদ্যমে জাগতে হবে। তাতে দেশের লোকের জিজ্ঞাসাবৃত্তি যেন সর্বদা নির্মল ও নিরভিভূত থাকে, কোনো গূঢ় বা প্রকাশ্য শাসনের দ্বারা সকলের বুদ্ধিকে যেন ভীরু এবং নিশ্চেষ্ট করে তোলা না হয়।'

১৯০৮ সালের ধনঞ্জয়ের স্রষ্টা গান্ধীজীর মধ্যে ধনঞ্জয়কে দেখতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ধনঞ্জয়ের পরিসর আরো ব্যাপক, বিস্তৃত। আশাহত হতে হয়েছিল বইকি!

তলস্তয়ের সঙ্গে ধনঞ্জয়ের তুলনা-প্রসঙ্গ নিষ্প্রয়োজন। কেননা, "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকের মধ্যে এরকম নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের কথা কখনোই ব্যক্ত হয় নি। তুলনামূলক প্রসঙ্গ শ্রদ্ধেয় আলোচকের দ্রুত সিদ্ধান্তের ফসল। "প্রায়শ্চিত্ত" নাটক থেকে, বিষয়টি বুঝে নিতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা গেল।

প্রতাপাদিত্য। সেই ধনঞ্জয় বৈরাগী তো মাধবপুরে থাকে?

মন্ত্রী। আজ্ঞে হাঁ!

প্রতাপাদিত্য। সেই বেটাই তো যত নষ্টের গোড়া। ধর্মের ভেক ধরে সেই তো যত প্রজাকে নাচিয়ে তোলে। সেই তো প্রজাদের পরামর্শ দিয়ে খাজনা বন্ধ করিয়েছে।

অথবা,

(প্রজা) ৩। বাবা, আমরা রাজাকে গিয়ে কী বলব?

ধনঞ্জয়। বলব আমরা খাজনা দেব না।

৩। যদি শুধোয় কেন দিবি নে?

ধনঞ্জয়। বলব ঘরের ছেলেমেয়েকে কাঁদিয়ে যদি তোমাকে টাকা দিই তাহলে আমাদের ঠাকুর কষ্ট পাবে। যে অন্নে প্রাণ বাঁচে সেই অন্নে ঠাকুরের ভোগ হয়; তিনি যে প্রাণের ঠাকুর। তার বেশি যখন ঘরে থাকে তখন তোমাকে দিই—কিন্তু ঠাকুরকে ফাঁকি দিয়ে তোমাকে খাজনা দিতে পারব না।

৪। বাবা, একথা রাজা শুনবেন না।

ধনঞ্জয়। তবু শোনাতে হবে। রাজা হয়েছে বলেই কি সে এমন হতভাগা যে ভগবান তাকে সত্য কথা শুনতে দেবেন না? ওরে জোর করে শুনিয়ে আসব।

প্রতিরোধের সক্রিয়-নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে আলোচনা ঘোঁয়াশা করে লাভ নেই। "প্রায়শ্চিত্তে" ধনঞ্জয় এসেছে মাধবপুরের প্রজাকুলকে নিয়ে, বঙ্গদেশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে (১৭৯৩) প্রণীড়িত কৃষককুলের অধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে রবীন্দ্রনাথের কথা জানাতে।

১৭৯৩ সালের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রসঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন, 'প্রজাদের চিরকালের স্বত্ব একেবারে লোপ হইল। প্রজারাই চিরকালের ভূস্বামী; জমীদারেরা কস্মিন কালে কেহ নহেন—কেবল সরকারী তহশীলদার। কর্ণওয়ালিস যথার্থ ভূস্বামীর নিকট হইতে ভূমি কাড়িয়া লইয়া তহশীলদারকে দিলেন।.....ইংরাজ-রাজ্যে বঙ্গদেশের কৃষকদিগের এই

প্রথম কপাল ভাঙ্গিল। এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত বঙ্গদেশের অধঃপাতের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মাত্র—···কর্ণওয়ালিস প্রজাদিগের হাত পা বান্ধিয়া জমীদারের গ্রাসে ফেলিয়া দিলেন—জমীদার কর্তৃক তাহাদিগের প্রতি কোন অত্যাচার না হয় সেইজন্য কোন বিধি ও নিয়ম করিলেন না।' (বঙ্কিমচন্দ্র, বঙ্গদেশের কৃষক)

এর বিরুদ্ধে কিন্তু কৃষককুল নীরব থাকে নি। উনিশ শতকের ইতিহাস, লিপিবদ্ধ করেছে, চব্বিশ পরগনার ওয়াহাবি বিদ্রোহ, ফরিদপুর জেলার ফারায়েজি বিদ্রোহ, সাঁওতাল বিদ্রোহ, নীলচাষীদের বিদ্রোহ, পাবনা ও বগুড়ার বিদ্রোহ। ১৭৯৩ সাল থেকে ১৮৫৯ সাল পর্যন্ত জমিদারের স্বেচ্ছাচারের যুগ। কৃষক-বিদ্রোহের ফলে ১৮৮৫ সাল প্রজাস্বত্ব আইনে প্রজাদের রক্ষার ব্যবস্থা হল বটে, কিন্তু নিরন্ন নিঃসহায় কৃষককুল পড়ে রইল পূর্ববৎ অবস্থায়। সে একই তিমিরে।

রবীন্দ্রনাথ যখন পিতাকর্তৃক আদিষ্ট হয়ে শিলাইদহ, কালিগ্রাম, পতিসর, সাহাজাদপুরে (উত্তরবঙ্গ, বর্তমান বাংলাদেশ) এসেছেন তখন সিরাজগঞ্জের কৃষক-আন্দোলন স্তিমিত (১৮৭২-৭৩)। বঙ্গদেশের কৃষকদের পক্ষে দণ্ডায়মান ভদ্রলোকের ভারতবর্ষের কোনো ভদ্রলোকের সাক্ষাৎ পাওয়া দুর্লভ। এর কারণটি রবীন্দ্রনাথের "লোকহিত", "সত্যের আহ্বান" প্রভৃতি প্রবন্ধেই আমরা জেনেছি।

'একদিন যখন আমরা দেশহিতের ধ্বজা লইয়া বাহির হইয়াছিলাম তখন তাহার মধ্যে দেশের অংশটা প্রায় কিছুই ছিল না, হিতের অভিমানটাই বড়ো ছিল।'

'পোলিটিকেল নেতারা ইংরেজি-পড়া দলের বাইরে ফিরে তাকান নি, কেননা তাঁদের দেশ ছিল ইংরেজি-ইতিহাস-পড়া একটা পুঁথিগত দেশ। সে দেশ ইংরেজি ভাষার বাষ্প রচিত একটা মরীচিকা, তাতে বার্ক গ্লাডস্টোন ম্যাটসীনি গারিবাল্‌ডির অস্পষ্ট মূর্তি ভেসে বেড়াত। তার মধ্যে প্রকৃত আত্মত্যাগ বা দেশের মানুষের প্রতি যথার্থ দরদ দেখা যায় নি।'

জমিদার হিসাবে রবীন্দ্রনাথ কৃষক-প্রজাদের সঙ্গে কাটিয়েছেন ১৮৯৯ সাল থেকে দীর্ঘ বারো বছর। জমিদার হিসাবে তাঁর কর্মের ইতিহাস স্বাক্ষর দেয়—কী বিস্তৃত বিপুল পরিসরে সে কর্মোদ্যোগ পরিচালিত হয়েছিল। গভীর শ্রদ্ধায় জানিয়েছেন, 'মানুষের পরিচয় খুব কাছে এসে মনকে জাগিয়ে রেখেছিল।' জমিদারত্রাসিত বঙ্গভূমিতে তাঁর সকর্মক জীবন সেদিনের ভদ্র-শিক্ষিত বঙ্গসন্তানের কাছে স্বপ্নপ্রায়। সেসব কথা লিপিবদ্ধ করেছেন বিদগ্ধমণ্ডলী তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে।

'চাষাদের সঙ্গে co-operative-এ চাষ করা, ব্যাঙ্ক করা, মহাজনের হাত থেকে প্রজাদের রক্ষা করা, বৃদ্ধ বয়সের সংস্থান করা, রাস্তা করা, বাঁধ বেঁধে দেওয়া, জলকষ্ট দূর করা, পরস্পরকে সহায়তাসূত্রে আবদ্ধ করা, এমন কত কাজ।' শুধু নিজের কর্মোদ্যোগ নয়, অপর জমিদারদের তিনি সনির্বন্ধ আহ্বান করেছেন। এই সময়ই আহ্বান জানিয়েছেন, 'পল্লীসচেতন' হতে নগরবিলাসী জমিদারদের। দারিদ্র্য-ক্লিষ্ট প্রজাদের অর্থে উৎসব-বিলাসে জীবন-যাপনকারী জমিদারদের প্রতি কী ঋতীব্র ধিক্কার।

জমিদাররূপে প্রজাদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের নিবিড় ঘনিষ্ঠতার কথা ছড়িয়ে আছে একান্ত ব্যক্তিগত ডায়েরি "ছিন্নপত্রাবলী"তে। প্রজাদের তিনি দেখেছেন, 'আপনার লোক' হিসাবে।

'আহা, এমন প্রজা আমি দেখিনি—এদের অকৃত্রিম ভালোবাসা এবং এদের অসহ্য কষ্ট দেখলে আমার চোখে জল আসে।·····বাস্তবিক এরা যেন আমার একটা দেশজোড়া বৃহৎ পরিবারের লোক। এই সমস্ত নিঃসহায় নিরুপায় নিতান্ত নির্ভরপর সরল চাষাভূষোদের আপনার লোক মনে করতে বড়ো একটা সুখ আছে। এরা যখন কোনো একটা অবিচারের কথা বলে আমার চোখ ঝাপসা হয়ে আসে—অন্ধ ছলে আমাকে সামলে নিতে হয়।'

এই সজল হৃদয় নিয়েই ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন,

'আমি যদি আমার প্রজাদের একমাত্র জমিদার হতাম তাহলে আমি এদের খুব সুখে রাখতুম এবং এদের ভালবাসায় সুখে থাকতুম।'

এদের প্রতি এই ভালোবাসা থেকেই প্রকাশ করেছেন কাব্যে,

'বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা, সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়োই দরিদ্র শূন্য বড়ো ক্ষুদ্র বদ্ধ অন্ধকার।'

বাস্তব পৃথিবীর এই দুঃখ কবিকে যন্ত্রণায় বিদ্ধ করেছিল। পত্রে লিখেছেন মানবের এই চরম লাঞ্ছনার কথা।

'এত কষ্ট এত অনারাম মানুষের কী করে সয় আমি ভেবে পাইনে—এর উপরে প্রতি ঘরে ঘরে বাতে ধরেছে পা ফুলেছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বর হচ্ছে, পিলেওয়ালা ছেলেগুলো অবিশ্রাম ঘ্যান ঘ্যান করে কাঁদছে, কিছুতেই তাদের বাঁচাতে পারছে না—একটা একটা করে মরে যাচ্ছে। এত অবহেলা অস্বাস্থ্য অসৌন্দর্য দারিদ্র্য বর্বরতা মানুষের আবাসস্থলে কিছুতেই শোভা পায় না। সকল রকম ক্ষমতার কাছেই আমরা পরাভূত হয়ে আছি—প্রকৃতি যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, রাজা যখন উপদ্রব করে তাও সয়ে থাকি, এবং শাস্ত্র চিরকাল ধরে যে সমস্ত উপদ্রব করে আসছে তার বিরুদ্ধেও কথাটি বলতে সাহস হয় না।'

মানবের এই পরাভবের অপমান থেকে রক্ষাকল্পেই যেন রবীন্দ্রনাথ সংকল্পবদ্ধ হয়েছিলেন, 'এ দৈন্য-মাঝারে, কবি,/ একবার নিয়ে এসো স্বর্গ হতে বিশ্বাসের ছবি।' "এবার ফিরাও মোরে" কবিতায় আহ্বান করেছিলেন, কৃষককুলকে। কিন্তু তাঁর আহ্বান কৃষকদের কাছে পৌঁছে দেবার কোনো সংগঠন সেদিন তৈরি হয় নি। বরাভয়মন্ত্র অশ্রুতই রয়ে গেল। প্রতাপাদিত্যের রাজত্ব থেকে বহু দূরে দাঁড়িয়ে যে জমিদার, কলকারখানার মালিক, উচ্চবিত্ত সম্প্রদায় 'নিরুপায়িক দেশপ্রেমের চর্চায়' মগ্ন ছিলেন তারা রবীন্দ্রনাথের বরাভয়মন্ত্র স্থলিত কণ্ঠে ব্যবহার করেছেন স্থল-কলেজের প্রাঙ্গণে; রাজনৈতিক মঞ্চে শুনিয়েছেন বাহবা কুড়োতে।

অকৃত্রিম শিল্পীকে থেমে থাকলে চলে না, তাঁকে সাহিত্যিক কর্তব্য পালন করতেই হয়। সাহিত্যিকের ধর্মবুদ্ধি কর্মবুদ্ধি সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্তব্যবুদ্ধির অধীন। বায়ুলেশহীন লৌহনিবাত প্রকোষ্ঠে বসে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সাহিত্যের জগৎ সৃষ্টি করেন নি। "এবার ফিরাও মোরে" কবিতার একটা সুস্পষ্ট রূপ দানে তাঁকে ফিরে আসতেই হল ১৯০৮ সালের "প্রায়শ্চিত্তে"।

দীর্ঘ বারো বছর নিজে জমিদার থাকার সময় তিনি তো দেখেছেন যে, ১৮৮৫ সালের প্রজাস্বত্ব আইন প্রজাদের রক্ষা করতে পারছে না। দেখেছেন, 'স্বক্ষকরূপী ভক্ষক' জমিদারের সর্বগ্রাসী ক্ষুধা। 'শ্বাপদ-মানুষ'রূপী জমিদারদের পাওনা না মেটাতে পারলে কৃষকদের জমি, ফসল ক্রোক হয়, কয়েদ হতে হয়। আর তা ওড়াতে মহাজনের দ্বারস্থ হয়ে কী ভাবে সর্বস্বান্ত হয়ে চলেছে প্রজাকুল। তাঁর 'সেই পরিপূর্ণ ভক্তির সরলতায় সুন্দর', 'বিধাতার শিশুসন্তানের মতো—নিরুপায় দরিদ্র চাষী প্রজাদের' দুঃখ নিবারণের জন্য তিনি দিন গুনছিলেন। পথ খুঁজছিলেন নিশ্চয়ই। হয়তো চেয়েছিলেন প্রতিরোধ শুরু হোক আবার। খাজনা বন্ধ করার কথা হয়তো ভেবেছিলেন। কিন্তু তা শুনছে কে? কেই বা শোনাবে কৃষকদের, তাঁর এই মর্ম-কথা? দেশের ভদ্রসমাজ 'লোক-সাধারণকে লোক বলিয়া নিশ্চিতরূপে গণ্য করে না।'

প্রসঙ্গক্রমে স্মরণীয় যে, জমির ওপর জমির মালিকানা খতম করে কৃষকদের হাতে জমির মালিকানা তুলে দেওয়া, কিংবা সর্বপ্রকার সামন্ততান্ত্রিক শোষণ থেকে কৃষকদের মুক্ত করা এসব সনদ উত্থাপিত হয়েছিল 'বঙ্গীয় প্রাদেশিক কৃষক সভায়' ১৯৩৬ সালে। কৃষকদের সংগঠিত সভার অধীনে নিয়ে আসার কাজ প্রকৃতপক্ষে শুরু হয় ১৯২৫ সালে উত্তর-বঙ্গের (বর্তমান বাংলাদেশ) বগুড়ায় 'প্রজা সমিতি' গঠন করে।

১৮৯৭ সালে রবীন্দ্রনাথ কৃষকদের আহ্বান করেছিলেন,

'মুহূর্তে তুলিয়া শির একত্র দাঁড়াও দেখি সবে,
যার ভয়ে তুমি ভীত, সে অন্যায় ভীরু তোমা চেয়ে,
যখনি জাগিবে তুমি তখনি সে পালাইবে ধেয়ে;
যখনি দাঁড়াবে তুমি সম্মুখে তাহার, তখনি সে
পথকুক্কুরের মতো সংকোচে সভয়ে যাবে মিশে।'

এই একই সুর নিয়ে এল ধনঞ্জয়। কৃষকের যুগ্যাপী অর্থনৈতিক অধিকার রক্ষার আয়োজনে রবীন্দ্রনাথ বাঙলা সাহিত্যের প্রাঙ্গণে এনে দাঁড় করালেন মাধবপুরের প্রজাকুলকে আর তাদের সংগ্রামী অভিযাত্রী 'ধনঞ্জয়কে।

প্রতাপাদিত্য। ···মাধবপুরের প্রায় দুবছরের খাজনা বাকি —দেবে কিনা বলো।

ধনঞ্জয়। না মহারাজ, দেব না।

প্রতাপাদিত্য। দেবে না এত বড় আস্পর্ধা!

ধনঞ্জয়। যা তোমার নয় তা তোমাকে দিতে পারব না।

প্রতাপাদিত্য। আমার নয়!

ধনঞ্জয়। আমাদের ক্ষুধার অন্ন তোমার নয়। যিনি আমাদের প্রাণ দিয়েছেন এ অন্ন যে তাঁর, এ আমি তোমাকে দিই কী বলে?

প্রতাপাদিত্য। তুমিই প্রজাদের বারণ করেছ খাজনা দিতে?

ধনঞ্জয়। হাঁ মহারাজ, আমিই তো বারণ করেছি। ওরা মূর্খ, ওরা তা বোঝে না—পেয়াদার ভয়ে সমস্তই দিয়ে ফেলতে চায়। আমি বলি, আরে আরে, এমন কাজ করতে নেই—প্রাণ দিবি তাঁকে প্রাণ দিয়েছেন যিনি। তোদের রাজাকে প্রাণহত্যার অপরাধী

কবিস নে।

কৃষকদের বাঁচার প্রশ্নে কৃষকদের আজন্ম মৌল অধিকার প্রসঙ্গটি লিপিবদ্ধ হয়েছে "প্রায়শ্চিত্তে"। এই "প্রায়শ্চিত্ত" নাটক অবলম্বনে ১৯২৯ সালে "পরিত্রাণ" শীর্ষক নাটক রচনা করেছেন। মাঝে, ১৯২২ সালে সৃষ্টি হয়েছে "মুক্তধারা" নাটক। সকল নাট্যরূপেই নানাবিধ পরিবর্তন দেখা গেছে। কিন্তু, ধনঞ্জয়ের প্রজাদের খাজনা বন্ধ করে দেওয়ার পরামর্শ এবং রাজার সম্মুখে খাজনা না দেবার আস্পর্ধার সংলাপ অংশের সামান্য পরিবর্তন হয় নি কোথাও।

কেননা, কৃষককুলের সপক্ষে রবীন্দ্রনাথ, "প্রায়শ্চিত্ত" নাটকে জমির ওপর কৃষকের আজন্ম অধিকার স্থাপনের কথা উত্থাপন করেছিলেন। এবং তিনি বিশ্বাস রেখেছিলেন,

'অধিকার চেয়ে নিতে হবে না, অধিকার সৃষ্টি করতে হবে। কেননা মানুষ প্রধানত অন্তরের জীব, অন্তরেই সে কর্তা।'

বামপন্থী সাহিত্যচেতনা

বিপ্লব মাজী

বের্টোল্ট ব্রেশট কমিউনিস্ট ইশতেহারকে কবিতায় রূপান্তরিত করতে চেয়েছিলেন। এই ইশতেহারটির মধ্যে এমন সঞ্জীবনী-শক্তি আর বৈপ্লবিক মানসিকতার আগুন আছে, যা আজো পৃথিবীর লক্ষ-লক্ষ মানুষের রক্তে বিপ্লব আর বামপন্থীচেতনার জন্ম দিয়ে থাকে। পৃথিবীর যে ভাষাতেই তা অনূদিত হোক, তার মধ্যে সাহিত্যের এমন গুণ আছে যার মধ্যে দুনিয়ার লক্ষ-লক্ষ লাঞ্ছিত নিপীড়িত মানুষ নিজেদের দুঃসহ জীবন বদলে ফেলার, নিজেদের আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবি দেখতে পেয়েছেন। কমিউনিস্ট ইশতেহারের মধ্যে যদি মানুষকে স্বপ্ন দেখানোর মতো সাহিত্যগুণ না থাকত—তা কখনই বিপ্লবীদের হাতিয়ারে পরিণত হতে পারত না। মার্কস ছিলেন গ্রীক সাহিত্যের একজন মনস্ক পাঠক। তিনি নিজে কবিতা লিখতেন; যে কবিতার অনেকগুলিই জেনিকে নিবেদিত প্রেমের কবিতা। শুধু তাই নয়, মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন বালজাকের লেখার মধ্যে মার্কস-এঙ্গেলস পেয়েছিলেন অনেক বৈপ্লবিক উপাদান। তলস্তয়ের লেখার মধ্যে লেনিন পেয়ে যান 'রুশ বিপ্লবের দর্পণ'। অন্যদিকে, মায়াকোভস্কি রুশ বিপ্লবের চারণকবি হওয়া সত্ত্বেও লেনিনের মনে হয়েছিল পুশকিনের কবিতার শিকড় হৃদয়ের অনেক গভীরে প্রবেশ করে। বিপ্লবের প্রয়োজনে রুশ জনগণের কাছে মায়াকোভস্কির কবিতার তাৎক্ষণিক বিরাট মূল্য থাকলেও, পুশকিনের কবিতার মূল্য রুশ জনগণের কাছে চিরায়ত। এর থেকে এটুকু অন্তত বোঝা যাচ্ছে, লেখক কী লিখছেন? তাঁর লেখার মধ্যে বিপ্লবের কোন্ উপাদান নিহিত, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে একটি দেশের সমাজজীবন কী ভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে? তাঁর লেখা সমাজের কোন্ শ্রেণীর মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিনিধিত্ব করছে তার ওপর নির্ভর করছে সাহিত্যের বামপন্থী সীমারেখা।

মার্কসবাদ একটি বিজ্ঞান। এই বিজ্ঞান কোনো-কিছুর স্থিরতায় বিশ্বাস করে না। মানুষ, আর মানুষের সৃষ্ট যে সমাজ—তাও নিয়ত পরিবর্তনশীল। প্রতিদিন আমাদের সমাজ আর সমাজজীবন বদলে যাচ্ছে। মানুষ সবকিছুকে যেমন বদলাচ্ছে, মানুষ তেমনি নিজেও বদলে যাচ্ছে। এভাবেই মানবসভ্যতার ইতিহাস তার নির্দিষ্ট লক্ষ্যপথে নিজস্ব সঞ্চারপথ ধরে এগিয়ে চলেছে। সাম্প্রতিক কালে পৃথিবীর অধিকাংশ দেশে বামপন্থী আন্দোলনগুলির মধ্যে স্ববিরোধিতার ঝোঁক লক্ষ করা যাচ্ছে। মার্কসীয় ধ্যান-ধারণার চলমান স্রোতকে তাঁরা তাঁদের নিজস্ব ধ্যানধারণা চিন্তা-ভাবনা অনুযায়ী কোনো ক্ষেত্রে প্রাতিষ্ঠানিক, কোনো ক্ষেত্রে যান্ত্রিক চিন্তাধারায় রূপান্তরিত করতে চলেছেন। রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পেলে তো কথা নেই, রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে না পেলেও—তাঁরা বামপন্থী আর দক্ষিণপন্থী সাহিত্যের সীমা-রেখা যখনি টানতে উদ্যত হয়েছেন—তা বামপন্থী সাহিত্য আন্দোলনের গতিকে দুর্বার করে তোলার পরিবর্তে মন্থর করেছে। নিজেদের চতুর্দিকের দেয়াল ভাঙার পরিবর্তে তাঁরা নিজেদের চারপাশে দেয়াল তোলাতে তৎপর হয়েছেন। একই আন্দোলনের সহযোদ্ধাকে ভালোবাসার পরিবর্তে ঘৃণা দিয়ে ঠেলে দিয়েছেন দূরে, সমাজের আপামর জনসাধারণের স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে দলীয় স্বার্থের সংকীর্ণ কানাগলিতে টেনে নিয়ে যেতে চেয়েছেন এক-একটি বৃহত্তর আন্দোলনের সম্ভাবনাকে। সুদূরপ্রসারী দৃষ্টির পরিবর্তে তাৎক্ষণিক দলীয় লাভের রক্তমাংসহীন পরিসংখ্যান তাঁদের কাছে এত বড়ো মনে হয়েছে যে সাম্প্রতিক কালে এদেশে বা অন্য দেশে বড়ো কোনো বামপন্থী সাহিত্য আন্দোলনের ঢেউ আমাদের চোখে

পড়ে নি। রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা না থাকার ফলেই এক সময় নিজেদের চারপাশে তোলা নিজেদের দেয়ালেরই দমবন্ধ বাতাসে সবার নাভিশ্বাস উঠেছে। আর এভাবেই বিভিন্ন বামপন্থী দলের রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতা শ্রমিকশ্রেণীর বৈপ্লবিক আর বামপন্থী চেতনাকে সমাজের মূলস্রোতধারা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। যার ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বামপন্থী শিল্প আর সাহিত্যের আন্দোলন। আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পরস্পরের ঘনিষ্ঠ কাছে আসা শিল্পী-সাহিত্যিকরাও সরে গেছেন একে অন্যের থেকে দূরে। সময়ের গতিশীল ঢেউয়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে এক সময় দেখা গেল বামপন্থী সাহিত্য সম্পর্কে যেসব সংজ্ঞা আর সূত্র রাজনৈতিক নেতারা বেঁধে দিয়েছিলেন তার সঙ্গে জনগণের ভাবনা-চিন্তার কোনো যোগ নেই। লাইনবন্দী গুচ্ছ-গুচ্ছ অক্ষররাশির মধ্যে আর যাই থাক—জীবন নেই।

বামপন্থী শিল্প-সাহিত্য আন্দোলনের পুরোহিত যে নেতারা হন—তাঁরা অধিকাংশ সময়েই দলীয় নেতাদের মনোনীত প্রার্থী হন। নিজেদের যোগ্যতার পরিবর্তে নেতাদের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি হিসেবেই তাঁরা সাহিত্য-আন্দোলনে নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা হাতে পান। এঁরা নির্ভর করেন এঁদের বিশ্বাসভাজন শিল্পী-সাহিত্যিকদের ওপর। ফলে একটা খোলামেলা হাওয়া, দুরন্ত স্রোত তৈরি হবার পরিবর্তে সেই দেয়াল তোলার খেলা শুরু হয়ে যায়। দলীয় নেতারা ভাবেন শিল্পী-সাহিত্যিকরা সংবেদনশীল মানুষ, তাঁদের মধ্যে বৈপ্লবিক চেতনার অভাব থাকলেও, রাষ্ট্রক্ষমতা দখল নেবার জন্য তাঁদের পাশে রাখতে হবে। কারণ তাঁরা এটা ভালোই বোঝেন, শিল্পী-সাহিত্যিকদের সম্পর্কে জনসাধারণের মনে এক ধরনের ভালোবাসার কুসংস্কার আছে। আপাতত ওঁরা শুধু পাশে থাকুন, রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে এলে তখন রাতারাতি সব বদলে দেওয়া যাবে। বদলে যে দেওয়া যায় না, তার প্রমাণ বিপ্লবের সত্তর বছর পরে সোভিয়েত ইউনিয়নে গ্লাসনস্তের আবহাওয়া তৈরি করতে হচ্ছে। পেরেস্ত্রোইকার মধ্য দিয়ে সবকিছু আবার জনজীবনের মূলস্রোতের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে হচ্ছে। অথচ সোভিয়েত ইউনিয়ন সব-চেয়ে অগ্রসর সমাজতান্ত্রিক দেশ।

এরকম একটি ধারণা আমাদের দেশে দীর্ঘদিন প্রচলিত: কমিউনিস্ট পার্টিগুলির কার্ডহোলডার যাঁরা, তাঁদের সঙ্গে ওঠ-বস করেন যে-সব শিল্পী-সাহিত্যিকরা—তাঁরাই একমাত্র বামপন্থী; তাঁরাই বামপন্থী সাহিত্য-আন্দোলনের অগ্রণী যোদ্ধা। কিন্তু অভিজ্ঞতা বলে অন্য কথা। পার্টিকার্ড-হোলডার হওয়া সত্ত্বেও দেখা যায়, একজন শিল্পী বা সাহিত্যিকের আচার আচরণে প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব; সেই মনোভাবের প্রতিফলন ঘটছে তাঁর সৃষ্টিকর্মে। অথচ, এবং যেহেতু তিনি একজন কমিউনিস্ট নেতার বন্ধু, যেহেতু তিনি অনুগ্রহ করে প্রতি বছর পার্টিকার্ডটির নবীকরণ করেন (তাঁর প্রতি ধার্য লেভি দিন বা না দিন)—অতএব তিনি একজন মস্ত বড়ো বামপন্থী সাহিত্যিক। বামপন্থী সাহিত্য আন্দোলনে এরকম "বামপন্থী" চেতনার লোকজনের ভিড়ই এমন বেশি। শুধু আমাদের দেশে নয়, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও। যার ফলে জনসাধারণ ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না, বামপন্থী সাহিত্য-আন্দোলনে যদি এরকম লোকের ভিড় বেশি হয়—তাদের আন্দোলনের নীতিশাস্ত্রটি কী? একটা আদর্শ, একটা মূল্যবোধ নিশ্চয়ই আছে; কিন্তু মূল্যবোধের প্রকাশ তাঁরা অনেক সময়ই বিকৃতভাবে দেখতে পান। ফলে জনগণের মূলস্রোত থেকে অনিবার্য বিচ্ছিন্নতা। বামপন্থী সাহিত্য-আন্দোলন দানা বাঁধার ভিত্তি খুঁজে পায় না। আদর্শ আর লক্ষ্য থাকলেই তো সবকিছু হয়ে যাবে না, তা কার্যকর করার জন্য যে কাঁধ-গুলি চাই, সে কাঁধগুলিই পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন।

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সাফল্য আর গতিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আর মূলধনীরা যখন সমাজের সর্বস্তরে সস্তার নাচ-গান, যাত্রা ও পরনো-সাহিত্য ঢুকিয়ে দিচ্ছে, যখন শিল্পী-সাহিত্যিকদের সৃষ্টিকর্মগুলিকে তারা পণ্যে রূপান্তরিত করছে, বিজ্ঞাপনকে হাতিয়ার করে বিভিন্ন প্রচার-মাধ্যমের সাহায্যে মানুষের রুচিবোধকে যখন ক্রমাগত নিম্নগামী আর হালকা করে তুলছে, তখন সে পথ থেকে জনগণকে সরিয়ে আনার জন্য বামপন্থীরা কোনো বিকল্প সৃষ্টি করতে পারছেন না। জনগণকে একটা জিনিসে "না" করলে, জনগণ তার বিকল্প "হ্যাঁ"-টি কী, তা খুঁজবে। আর সেই বিকল্পটি তাদের না দিতে পারলে অন্ধকারের সাহিত্যেই তারা নিজেদের অস্তিত্ব বিপন্ন করবে। এখানেই এসে যায় বামপন্থী শিল্পী আর সাহিত্যিকদের একটা সামাজিক দায় এবং দায়িত্ববোধ। আমরা চোখের সামনে দেখতে পাই—যেসব মানুষ বামপন্থীদের মিছিলে, সভায় যান, দাবিদাওয়ার বিভিন্ন আন্দোলনে যোগদান করেন, নেতাদের কাছ থেকে সুস্থ শিল্প-সংস্কৃতি সম্পর্কে বক্তৃতা শোনেন - তাঁরাই বুরজোয়া পত্রপত্রিকা, পরনো পত্রপত্রিকার বড়ো খদ্দের। বামপন্থী

পত্রপত্রিকার মধ্যে "বিরক্তিকর একঘেয়েমি এবং যান্ত্রিক বিবৃতি" ছাড়া অন্যকিছু খুঁজে পান না। এখানেই এসে যাচ্ছে ভাষার একটা বড়ো ভূমিকার কথা। অধিকাংশ বামপন্থী পত্রপত্রিকায় ভাষার সাহিত্যগুণের অভাব দেখা যায়। লেখকদের সৃষ্ট চরিত্রগুলোকে মনে হয় নিষ্প্রাণ ছকে বাঁধা, এবং তারা শেষ পর্যন্ত কী করবে তা সবার জানা। শিল্পের রহস্যময়তা সেখানে অনুপস্থিত, জীবনের রক্তমাংসের স্পন্দন সেখানে সেই, নেই কমিউনিস্ট ইশতেহারের মতো প্রাঞ্জল আর স্বচ্ছ ভাষা। ফলে মূলধনীদের নিয়ন্ত্রিত প্রাতিষ্ঠানিক পত্রপত্রিকা বামপন্থী আন্দোলনে বিশ্বাসী জনসাধারণ ব্যাপকভাবে কেনেন। সেইসব পত্রপত্রিকার বিষয়বস্তু যাই হোক, তার সৌন্দর্য অনেক বেশি, তার ভাষার মোহিনী শক্তিও বেশি, এবং বাজারের স্বার্থে এমন কিছু বিষয়বস্তু প্রাতিষ্ঠানিক পত্রপত্রিকায় থাকে—যা অন্তত তার পাঠক-পাঠিকাদের কাজে লাগে। এভাবেই, যে অন্ধকারের বিরুদ্ধে বামপন্থীদের লড়াই, সেই অন্ধকারই তার রহস্যময়তা দিয়ে একটু-একটু করে জনসাধারণকে গ্রাস করে, বৈপ্লবিক আন্দোলন থেকে তাদের দূরে সরিয়ে নিয়ে যায়, বিপ্লব সম্পর্কে তাদের মনে নানা ভয়-ভীতি ঢুকিয়ে দেয়।

আমরা যারা সাম্যবাদে বিশ্বাস করি, যে-কোনো সমাজ-ব্যবস্থার অর্থনীতিই সেই সমাজব্যবস্থার সমস্যা বা সাফল্যের মূল কারণ বলে মনে করি,—সেই আমরা যদি আমাদের পথটাই একমাত্র আলোর দিকে যাওয়ার পথ, অন্যদের পথগুলো কেবলই অন্ধকারের দিকে গেছে বলে নিজেদের এক সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির শিকার করে তুলি—তা সাহিত্য আর সংস্কৃতির বৃহত্তর আন্দোলনের পথটাই রুদ্ধ করে দেয়। পৃথিবী জুড়ে এখন এমন সব ঘটনা চোখের সামনে ঘটে চলেছে, তা আমাদের অভিজ্ঞতাকে এমন সব অভাবনীয় ঘটনায় সমৃদ্ধ করে তুলছে যে আমাদের পথটাই একমাত্র পথ, তা আমরা বলতে পারি না। নিঃসন্দেহে আমাদের হাতিয়ারটি—মার্কসবাদ—একটি পরীক্ষিত হাতিয়ার। কিন্তু হাতিয়ারটি কারা ব্যবহার করছে, তারা ব্যবহারের উপযুক্ত কিনা, ভুলভাবে তারা ব্যবহার করছে কিনা ?—এসব দিকও আমাদের ভেবে দেখতে হবে। মার্কসবাদের অপব্যবহার কি হচ্ছে না ? হচ্ছে। আবার ক্যাথলিক চার্চের মতো গোঁড়া ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলি কি লাতিন আমেরিকার মুক্তিসংগ্রামের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠছে না ? হচ্ছে। কিন্তু লাতিন আমেরিকার বামপন্থী আন্দোলন সেখানকার বামপন্থী সাহিত্য-আন্দোলনকে যেভাবে প্রভাবিত করছে, আমাদের দেশে সেই একইভাবে করবে না। সোভিয়েত ইউনিয়নের গ্লাসনস্তের হাওয়ায় আমরা যদি গা ভাসাই—আমরা ভুল করব। কারণ আমাদের সামাজিক পরিস্থিতি অন্যরকম, আমাদের জন-গণের ঐতিহ্য আর মূল্যবোধ অন্যরকম। নিজের দেশের গভীরে যদি না আমাদের বামপন্থী মানসিকতার শিকড় পৌঁছয়, আমাদের সৃষ্টির আন্দোলন এদেশের জনগণের হৃদয়ে কখনো পৌঁছতে পারবে না।

একমাত্র সৃষ্টির আন্দোলনই আমাদের মধ্যে বৈপ্লবিক, বামপন্থী চেতনার জন্ম দিতে পারে। সৃষ্টির আন্দোলনের পথেই আমরা পেতে পারি প্রাতিষ্ঠানিক এবং পণ্যসর্বস্ব সাহিত্য-সংস্কৃতির বিকল্প মঞ্চ। প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে আমরা যদি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলি তা আমাদের গতিকেই রুদ্ধ করে। অথচ ক্ষমতা হাতে পেলেই এই কাজটিই আমরা করে আসছি। আর প্রতিষ্ঠান মানেই সেখানে প্রবেশ করবে সংক্রামক রোগের মতো অসংখ্য অবক্ষয়ী চিন্তাভাবনা।

শ্রমিকশ্রেণীর সচেতন অংশকে নিয়ে বৈপ্লবিক পার্টি যে সৃষ্টির আন্দোলন গড়ে তুলবে তার লেখক / লেখিকাদের শ্রমিক বা কৃষকদের মধ্য থেকেই উঠে আসতে হবে—এ-রকম কোনো কথা নেই, বা কেউ-কেউ যদি উঠেও আসেন, তাঁদের সৃষ্টিকর্মের মধ্যে বামপন্থী চেতনার প্রকাশ ঘটবে —এরকম আশা বাস্তবে না-ও পরিণত হতে পারে। বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির বিস্ময়কর আবিষ্কার ঘটে চলেছে। অদূর ভবিষ্যতে বড়ো-বড়ো প্লান্ট, কলকারখানা সাইবারনেটিকস নিয়ন্ত্রণ করবে, রোবট চালাবে। "শ্রমিকশ্রেণী" শব্দটিই হয়তো আক্ষরিক অর্থে একমাত্র বইয়ে নির্বাসিত হবে। এরকম পরিস্থিতিতে বিপ্লবের নেতৃত্ব কারা দেবে ? নিশ্চয়ই রোবটরা নয়। এর প্রতিফলন সাহিত্যে কী-রকম হবে ? এসব প্রশ্ন আজ পৃথিবী জুড়ে দেখা দিচ্ছে। প্রথাগত ভাবনা-চিন্তার দিন ফুরিয়ে আসছে।

যে দেশের শতকরা সত্তর জন মানুষ নিরক্ষরতার অন্ধকারে ডুবে আছেন, এবং শতকরা এক-আধজন মানুষ সাহিত্য নিয়ে ভাবনাচিন্তা করেন—সে দেশে শ্রমিক, কৃষকের বাড়িতে সাহিত্যের পাঠক / পাঠিকা, বিশেষ করে বামপন্থী চেতনা-সম্পন্ন হয়তো দেখা যাবে না—কিন্তু সেইসব নিরক্ষর পাঠক/ পাঠিকারা বামপন্থী-চেতনাসম্পন্ন সাহিত্যের রসাস্বাদ গ্রহণ করতে পারবে না—এ ধারণা ভুল। ভাষা, এবং সেই

ভাষাকে উপযুক্ত মাধ্যমের সাহায্যে জনসাধারণের মধ্যে পৌঁছে দেওয়া এ ব্যাপারে এক বিরাট ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের 'ও আমার দেশের মাটি' গানটি একটি জাতির নবজন্ম ঘটিয়ে দিল। নাৎসি আক্রমণে ফ্রানস যখন ক্ষতবিক্ষত, আরাগঁ লিখলেন "আয়নার সামনে এলসা"। আপাতদৃষ্টিতে এটি একটি প্রেমের কবিতা হলেও, এই কবিতাটি ফরাসি জনগণের নাৎসি-বিরোধী আন্দোলনের হাতিয়ার হয়ে উঠল। আন্দালুসিয়ার প্রকৃতি এবং জিপসিদের নিয়ে লোরকা যেসব কবিতা বা গান রচনা করলেন 'জিপসি গাথা'য় তা ফ্রাঙ্কোর মূর বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করার সময় স্পেনের জনগণের মুখে-মুখে ফিরল বিপ্লবের অনুপ্রেরণা হয়ে। রুশ জনগণের দেশপ্রেমের যুদ্ধে (দ্বিতীয় মহাসমর) ফ্রনটে লড়াইরত সৈনিকদের পকেটে পাওয়া যেত তলস্তোয় ও দস্তয়েভস্কির উপন্যাস, সিমোনভের "প্রতীক্ষায় থেকো" কবিতা। মারকিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে দেশের মুক্তির লড়ায়ের সময় ভিয়েতনামীদের স্মৃতিতে ধরা থাকত হো-চি-মিনের কবিতা। এরকম আরো অসংখ্য উদাহরণ দেওয়া যায়। সাহিত্য—তার বিষয়বস্তু যত জটিলই হোক, তা সঠিকভাবে প্রকাশ করলে সাধারণ মানুষ তার নিহিত অর্থ বুঝতে পারেন। পাবলো নেরুদার এরকম অভিজ্ঞতা একবার হয়েছিল। একবার তাঁকে না জানিয়েই সান্তিয়াগোর ভেগা মারকেটের ইউনিয়ন হলে বক্তৃতা দেবার জন্য আনা হল। নিদারুণ শীতের মধ্যেও সেখানে প্রায় পঞ্চাশজন মজুর তাঁর জন্য অপেক্ষা করছিল। নেরুদা ভেবে পেলেন না, হতভাগ্য ঐ মানুষগুলির সামনে কী বক্তৃতা দেবেন। পকেটে ছিল "হৃদয়ে আমার স্পেন" কবিতা-বইটি—সেইটি খুলে পড়তে শুরু করলেন, যদিও স্বয়ং নেরুদাও জানতেন, কবিতার সমস্ত জায়গা যে-কোনো মনস্ক কবিতা-পাঠকের কাছেও কঠিন মনে হতে পারে। নেরুদা ভেবে-ছিলেন কয়েকটি কবিতা পড়েই বিদায় নেবেন, কিন্তু দীর্ঘ এক ঘণ্টা তাঁকে একের পর এক কবিতা পড়ে যেতে হল এবং কবিতাপাঠশেষে মজুরদের কাছ থেকে পেলেন উষ্ণ অভিনন্দন। একজন তো সবার পক্ষ থেকে বলেই ফেলল, এর আগে আর অন্যকিছুই তাদের এত বিচলিত করতে পারে নি। তারপর দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে কান্নায় ভেঙে পড়ল; অন্যেরাও ফ্যাসফ্যাস করে কাঁদছে—। এ ঘটনা থেকে নেরুদা বুঝতে পেরেছিলেন, জীবনের নানা অভিজ্ঞতায় প্রাজ্ঞ, নিরক্ষর মজুরেরাও হয়ে উঠতে পারেন সাহিত্যের শ্রোতা বা পাঠক সাধারণ মানুষ শুধু সহজ সরল লোক-সংগীত, লোকচিত্রকলা বা পটের গান বোঝে—আমাদের এ ধারণা ভুল। সেইভাবে পৌঁছে দিতে পারলে তাঁরাও যে-কোনো জটিল সাহিত্যের রস গ্রহণ করতে পারেন। পিকাসোর গ্যেনিকা ছবির অর্থ যেভাবে বুঝেছিলেন পৃথিবীর সাধারণ মানুষ। এসব ঘটনা থেকে এও বোঝা যায় —শুধু বিপ্লবের জন্য লিখিত কবিতাই বামপন্থী-চেতনাসম্পন্ন কবিতা নয়, যে-কোনো সৃষ্টিকর্ম, তার মধ্যে যদি মানবিক কোনো গুণ বা দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিফলন ঘটে, তা আপামর জনসাধারণের সম্পত্তি বা হাতিয়ার হয়ে ওঠে। এর বিপরীত ঘটনাও দেখা যায়। "বিপ্লবী", "বামপন্থী" বা "কমিউনিস্ট" নামে চিহ্নিত অনেক লেখকের রচনায় এমন সব চরিত্র ও ঘটনার আমদানি দেখা যায় যা প্রতিবিপ্লবী বা দক্ষিণ-পন্থীদের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। তারা ওইসব লেখকদের প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তাধারাগুলিকে পাদপ্রদীপের সামনে এনে এমন জোরালো প্রচার চালায় যা জনগণকে বামপন্থী আন্দোলন সম্পর্কে বিরূপ করে তোলে; জনগণ দিশেহারা হন; বুঝতে পারেন না প্রকৃত বামপন্থী সাহিত্য বলতে তাঁরা কোন্ রচনাটিকে বেছে নেবেন।

শহর যদি আজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে দ্রুত গ্রামের লোকায়ত শিল্প ও সংস্কৃতিকে গ্রাস করে নেয়, আর পণ্যসভ্যতার সংস্কৃতি ও চিন্তাভাবনা গ্রামের মানুষের রক্তে ঢোকাতে থাকে—তার বিরুদ্ধে সৃষ্টির আন্দোলনই হতে পারে লড়াই করার একমাত্র হাতিয়ার; সেই আন্দোলন পরিচালনার নতুন-নতুন মঞ্চ থেকেই উঠে আসতে পারে বিকল্প শক্তি। কিন্তু এ-দেশের বামপন্থীরা (নেতারা) রাজ-নৈতিক দিক থেকে এত শতধা বিভক্ত এবং জনগণের ভাবনাচিন্তা থেকে এত দূরের মানুষ যে তা সহজে হবার নয়। চারের দশকে প্রগতিশীল আন্দোলনের একটা মঞ্চ তৈরি করা গিয়েছিল—কারণ, সৃষ্টির আন্দোলন তখন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে একসূত্রে গাঁথা ছিল; বামপন্থীরাও ছিলেন জনগণের মূলস্রোতের মধ্যে সম্পৃক্ত। ফলে চারের দশকে বামপন্থী সাহিত্য-আন্দোলনের একটা বিপ্লবী চরিত্র তৈরি হয়েছিল। এ ধরনের সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী মঞ্চ এখনো তৈরি করা যায়; কিন্তু প্রধান অন্তরায় হয়ে ওঠে যে-কোনো আন্দোলনকেও ভাগ-বাঁটোয়ারা করে নেবার জন্য তৎপর বামপন্থী দলগুলির রাজনৈতিক চরিত্র। তা ছাড়া, আন্দোলনের নেতৃত্বে যেসব ব্যক্তিরা আসেন

তাঁরা ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন এবং আত্মত্যাগের পরিবর্তে ব্যক্তিগত লাভক্ষতির হিসেব নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। যার ফলে, গোটা আন্দোলনটাই সুবিধেবাদী মধ্যবিত্ত মানসিকতার মৃগয়াক্ষেত্র হয়ে ওঠে।

এ দেশে বামপন্থী সাহিত্যচেতনা বলতে যা বোঝায় তা আমাদের কাছে স্পষ্ট না হয়ে ওঠার বড়ো একটি কারণ এ দেশের বামপন্থীদের বামপন্থী সাহিত্য আন্দোলন সম্পর্কে কোনো স্পষ্ট নীতি বা বক্তব্য নেই। ফলে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন, মূলবোধের ভাঙন সব সময়ই ঘটে। বামপন্থীরা মনে করেন কিসের বিরুদ্ধে, কার বিরুদ্ধে লড়াই তা তাঁরা জানেন। কিন্তু বিভিন্ন সভাসমিতিতে তাঁরা যেসব কথা বলেন বাস্তব ঘটনার সঙ্গে তার কোনো মিল বা সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যায় না। নেতার বক্তৃতা শুনে একজন ক্যাডার যাদের এবং যেসব লেখাকে সুস্থ সংস্কৃতির শত্রু ভাবছে, কদিন বাদে সবিস্ময়ে দেখছে সেইসব শত্রুদের সঙ্গে নেতাদের দহরম মহরম, সেই সমস্ত রুচিহীন বইয়ে নেতাদের বাড়ির বুক-সেলফ ভরে উঠছে। আজ যে লেখক বা যাঁর লেখাকে তাঁরা প্রতিক্রিয়াশীল বলছেন, আগামী কাল তাঁকেই মহান বিপ্লবী বলে মঞ্চে ঘোষণা করছেন। ফলে নিজেদের স্মৃতি আর অভিজ্ঞতা থেকে সাধারণ মানুষ বুঝতে পারেন না বামপন্থী হওয়ার মাপকাঠি কী। বামপন্থী নেতাদের ঘন-ঘন সুবিধেবাদী অবস্থান বামপন্থী জনসাধারণের মনেও সুবিধাবাদের বীজ বুনে দিচ্ছে, বামপন্থী আন্দোলনগুলিও তাই সুবিধেবাদী আন্দোলন হয়ে উঠছে, সেসব আন্দোলনের কোনো বৈপ্লবিক চরিত্র থাকছে না। ফলে জনগণ লড়াই করবেন কার বিরুদ্ধে? কোনো নীতিহীন আন্দোলন হাল-বিহীন জাহাজের মতো অনিদিষ্ট পথে ঘুরতে থাকে। এরকম পরিস্থিতির মধ্যে বামপন্থী সাহিত্য-আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে না।

এদেশে বামপন্থী আন্দোলনের আরো একটি বিপদ, রাজনৈতিক কারণেই এদেশের যে-কোনো আন্দোলনের নেতৃত্ব থাকে অর্থ নৈতিক ও সামাজিক দিক থেকে সমাজের অগ্রসর শ্রেণীর হাতে। এঁরা সাধারণত "উঁচুজাত" থেকে আসেন, এবং বংশপরম্পরাজাত সম্পর্কে সাধারণ মানুষের কুসংস্কারকে কাজে লাগিয়ে নেতৃত্বে থাকেন। শুধু তাই নয়। এঁদের নিরাপদ অর্থ নৈতিক অবস্থান এঁদের নেতৃত্বে থাকতে সাহায্য করে। যতদিন না সারা দেশ জুড়ে প্রায় প্রতিটি গ্রাম আর শহরে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে, শিল্পোন্নয়নের দ্রুত উন্নতি ঘটে, এদেশের সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়া কিছুতেই বিদায় নেবে না। আর যতদিন সামন্ততান্ত্রিক আবহাওয়া থাকবে, জাতপাতের বিচারও থাকবে। এর থেকে কী কমিউনিস্ট কী অ-কমিউনিস্ট, কেউ মুক্ত নন। এদেশের কমিউনিস্টরাও পইতে রাখেন, পুরুত ডেকে বাড়িতে ঠাকুরদেবতার পুজো করেন বা মসজিদে নামাজ পড়তে যান, ছেলেমেয়েদের বিয়ে-শাদির ব্যাপারে ঠিকুজী-কোষ্ঠী মিলিয়ে দেখেন, এবং মা-কালীর পুজো সেরে মিছিলে মিটিঙে যোগ দিতে যান। এরকম সামন্ততান্ত্রিক-বামপন্থী চেতনা কী করে দেশের বামপন্থী আন্দোলনকে সমৃদ্ধিশালী করতে পারে? রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিই যেখানে স্বচ্ছ নয়, রাজনৈতিক মূল্যবোধ সেখানে কী করে গড়ে উঠবে? মূল্যবোধ গড়ে না উঠলে বৈপ্লবিক চেতনাই বা জন্ম নেবে কী করে? ফলে কুসংস্কার, জাতপাতের বিচার সাহিত্যের লেখক / শিল্পী হওয়ার ব্যাপারেও বিরাট ভূমিকা পালন করবে। বাঙলা সাহিত্যের হাজার বছরের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে—এই হাজার বছর জাতপাতের বিচার আমাদের সাহিত্যে কী ভূমিকা পালন করেছে। আঙুলে গোনা দু-একজন বাদ দিলে—লেখকেরা প্রধানত উঠে এসেছেন সমাজের উচ্চশ্রেণী, উচ্চবিত্তের লোকজনের মধ্য থেকে। ফলে আমাদের যা কিছু শিল্প সাহিত্য ও সংস্কৃতির বোধ উচ্চশ্রেণীর লোকেদের দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। তাঁরা যে মূল্যবোধ গড়ে দিয়েছেন—সেই মূল্যবোধের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা সাহিত্যের ইতিহাস পর্যালোচনা করেছি। তাঁদের ধ্যানধারণা, চিন্তাভাবনা এবং সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতার শিকার আমরা হয়েছি। ফলে শ্রমিক-কৃষকের মধ্য থেকে কোনোদিন কোনো লেখক উঠে আসেন নি। যাঁরা উঠে এসেছেন তাঁদের লোকায়ত শিল্পী বলে দূরে সরিয়ে রেখেছি; বরাবরই মনে করে এসেছি লোকায়ত শিল্পীরা নীচু শ্রেণীর, নাচু জাতের। তাঁদের অস্তিত্ব নির্ভর করছে—উচ্চশ্রেণীর প্রশংসা বা নিন্দের ওপর। এমনকি মুসলিমরা, যাঁরা আমাদের সঙ্গে প্রায় আট-ন-শো বছর ঘর করছেন—তাঁদের থেকেই বা কদিন লেখক / শিল্পীকে উঠে আসতে দেখেছি? এভাবেই আমরা আমাদের জাতীয় চেতনাকে পঙ্গু আর দুর্বল করেছি। আমরা ভারতীয় বলে কোনো জাতি নই—আমরা কেউ হিন্দু, কেউ মুসলমান, কেউ বৌদ্ধ, কেউ ক্রিশ্চান। শুধু এই পরিচয় নয়—আমরা কেউ ব্রাহ্মণ, কেউ কায়স্থ, কেউ বৈশ্য, কেউ শূদ্র। এর-পরেও আছে গোত্রের ভাগ। বিভিন্ন স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী ভরতির ফর্ম লক্ষ্য করলে দেখা যায়—বেশির ভাগ বাবা-মা-ই জাতি হিসেবে নিজেকে ভারতীয় বলে পরিচয় না দিয়ে ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, মাহিষ্য, সোনারবেনে, তিলি ইত্যাদি ইত্যাদি বলে পরিচয় দিচ্ছেন; এইসব বাবা-মা-দের মধ্যে উচ্চ-শিক্ষিতেরাও আছেন।

এদেশের ঐতিহ্য, এদেশের মধ্য দিয়ে প্রবহমান মানব-সভ্যতার সমাজসচেতন বিশ্লেষণ আমরা কখনো করি নি। সব সময়েই বিদেশীদের চোখ দিয়ে নিজেদের দেশের পরিস্থিতি বোঝার চেষ্টা করেছি। ফলে আমাদের অনেক সিদ্ধান্তই হয়েছে কৃত্রিমতায় ভরা। পরিস্থিতির মূল্যায়নে থেকে গেছে সীমাবদ্ধতা। সমাজের মূল স্রোতোধারা থেকে মাঝে-মাঝেই আমরা অন্যত্র সরে গেছি। আমাদের এই বিচ্ছিন্নতাই আমাদের বৈপ্লবিক এবং বামপন্থী আন্দোলনকে করেছে ক্ষতিগ্রস্ত, আমাদের বামপন্থী চেতনাকে করেছে দুর্বল আর বিপর্যস্ত।

আমাদের সমাজব্যবস্থায় একজন মানুষের সঙ্গে অন্যান্য মানুষের সম্পর্ক, সামাজিক নানা ঘটনার মধ্যে তার সক্রিয় ভূমিকা, সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবি সাহিত্যে ফুটিয়ে তোলার জন্য একজন লেখককে শ্রমিক-কৃষকের মধ্য থেকে উঠে আসতে হবে—এরকম চিন্তা-ভাবনা আমাদের চিন্তার স্বাধীনতাকেই সীমাবদ্ধ করে দেয়। শ্রমিক-কৃষকের মধ্য থেকে লেখক-শিল্পীরা উঠে এলে তাঁদের জীবনসমৃদ্ধ অভিজ্ঞতার কথা আমরা পেতে পারি। কিন্তু সাহিত্য তো শুধু অভিজ্ঞতার নির্যাস নয়—তাকে শিল্প হয়ে উঠতে হবে। আর এই শিল্প হয়ে ওঠা নির্ভর করে নিজের ভাষাটিকে তিনি কত গভীর-ভাবে আয়ত্ত করেছেন তার ওপর। মার্কসবাদের জনক মার্কস-এঙ্গেলস শ্রমিক-কৃষক ছিলেন না; মার্কসবাদের প্রয়োগে যিনি প্রথম অকটোবর বিপ্লবের মধ্য দিয়ে সাফল্য লাভ করেন সেই লেনিন শ্রমিক বা কৃষক ছিলেন না। সাম্রাজ্যবাদবিরোধী যুক্তফ্রন্টের তত্ত্ব যিনি রচনা করেন সেই জর্জি দ্রিমিতফ শ্রমিক বা কৃষক ছিলেন না। একজন লেখক বা শিল্পী তিনি সমাজের যে স্তর, যে শ্রেণী থেকেই আসুন তিনি কী লিখছেন? কী ভাবে লিখছেন? এবং জনসাধারণের সঙ্গে কিভাবে সংযোগ স্থাপন করছেন, তাঁর রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি, সামাজিক মূল্যবোধ, জনসাধারণের জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে—লেখকের সমাজচেতন বামপন্থী মানসিকতা; এই মানসিকতাই তাঁর মধ্যে বামপন্থী চেতনার জন্ম দেয়।

বামপন্থী আন্দোলনের স্রোতে যে সাহিত্য জন্ম নেয়—তাই বামপন্থী বা অ্যানটি-এস্টাবলিশমেনট সাহিত্য—এ-রকম ধারণা সংকীর্ণ ধারণা। সাহিত্য যেভাবেই সৃষ্টি হোক আমাদের দেখতে হবে তা প্রকৃতই সাহিত্য হয়ে উঠছে কিনা? তার তাৎক্ষণিক মূল্য নিশ্চয়ই থাকে কিন্তু চিরায়ত কোনো মূল্য আছে কিনা? জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা জানি একটা ভালোবাসার গান, একটি সত্যিকার ভালো ছবি, একটি মানবিকবোধসম্পন্ন চলচ্চিত্র, একটি বিমূর্ত শাস্ত্রীয় সংগীতও অনেক সময় বিপ্লবের প্রেরণা হিসেবে কাজ করে, বিপ্লবে ঝাঁপিয়ে পড়ার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করে—কিন্তু এইসব সৃষ্টিকর্মের শিল্পীরা হয়তো বুর্জোয়া ধ্যানধারণায় বিশ্বাস করেন। সবকিছু সত্ত্বেও এ কথা বলা যায়, বামপন্থী আন্দোলনগুলিই বামপন্থী সাহিত্যচেতনার জন্ম দেয়। বামপন্থীদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি যত স্বচ্ছ হয় সেই চেতনা তত গভীরতা লাভ করে। ততই তা জন-সাধারণকে প্রভাবিত করে।

সংসদীয় গণতন্ত্রের রাজনীতি বামপন্থী আন্দোলনগুলির যে ক্ষতি করছে, তার জন্যে বামপন্থী জনগণকে সর্বতো-ভাবে দায়ী করা চলে না। এর জন্যে দায়ী এ-দেশের বামপন্থী নেতৃত্ব। আসলে দেশের পুঁজিপতিশ্রেণী, আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ—এদের বিরুদ্ধে আমরা কিভাবে লড়াই করব, কিভাবে শত্রুশিবিরে ভাঙন ধরাব—সে সম্পর্কে আমাদের স্বচ্ছ কোনো রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি নেই। অনেক সময়েই যান্ত্রিকভাবে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রয়োগ আমরা ঘটিয়ে থাকি। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন-নতুন সাফল্যে পৃথিবী যে জটিল অধ্যায়ের মধ্যে প্রবেশ করেছে—তার বিরুদ্ধে মার্কসবাদকে আর পুরোনো প্রথায় হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। বামপন্থী চেতনার জোয়ার নতুনভাবে জনসাধারণের মধ্যে জাগিয়ে তোলার জন্য আমাদের প্রথাগত দৃষ্টিভঙ্গির আমূল পরিবর্তন ঘটাতে হবে। জনগণের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন করে কোনো ঘটনাকেই আর আমাদের দেখা চলবে না। বামপন্থী চেতনা জনস্রোতের মধ্যে সম্পৃক্ত আছে। তাকে জাগিয়ে তোলার, তাকে স্বপ্ন দেখানোর রাস্তায় নিয়ে যেতে পারে একমাত্র সৃষ্টির আন্দোলন, নব-জীবনের গান, সমাজের সর্বত্রই জীবনের উৎসব।

শিবকুমার জোশী ও "সোনল ছায়"

গৌরী ধর্মপাল

[প্রখ্যাত গুজরাতি সাহিত্যিক শিবকুমার জোশী জন্মগ্রহণ করেন গুজরাতের অম্‌দাবাদ শহরে ১৯১৬ সালে। অতি সম্প্রতি তাঁর মৃত্যু হয়েছে আমাদের এই কলকাতা শহরে—১৯৮৮ সালের ৪ঠা জুলাই। এই কৃতী সাহিত্যিকের উপর বিস্তারিত আলোচনা প্রকাশ করার ইচ্ছা পোষণ করি। এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হল গৌরী ধর্মপালের একটি সংক্ষিপ্ত আলোচনা। এটি আসলে একটি ভাষণ। ১৯৮৫-র ৩রা মার্চ ভারতীয় ভাষা পরিষদে শিবকুমার জোশীর উপন্যাস সোনল ছায় (সোনালি ছায়া)-এর বাঙলা অনুবাদের মুক্তিসভায় অনুবাদিকা হিসাবে শ্রীমতী ধর্মপালের ভাষণের কিছু অংশ হল এই আলোচনা। সম্পাদক]

সব লেখকই চান, তাঁর লেখা অনেকের মধ্যে ছড়িয়ে যাক। বহু হবার কামনা, বসুধাকুটুম্বিতার কামনা—যাকে বেদের কবি বলেছেন 'সর্বতাতি', সবার মধ্যে ছড়িয়ে যাওয়া—সাহিত্যিকের স্বভাবধর্ম। সেই ছড়িয়ে যাওয়ার একটা প্রধান মাধ্যম হল অনুবাদ। 'বড়িল' বন্ধু প্রসিদ্ধ গুজরাতি লেখক শিবকুমার জোশীর সেই স্বপ্ন যে সার্থক করতে পেরেছি, তার জন্য আমি কৃতার্থ। গুজরাতি সাহিত্যমণ্ডলের সুবর্ণমহোৎসব সমিতি ও বুক ট্রাস্টের যৌথ উদ্যোগে বইটি প্রকাশিত হয়েছে। এঁদের এবং ভারতীয় ভাষা পরিষদকে ধন্যবাদ জানাই। আজকের এই সভায় অনেক দূর থেকে কষ্ট করে যাঁরা এসেছেন সেই পাঞ্জাবসিন্ধুগুজরাটমারাঠাদ্রাবিড়উৎকলবঙ্গকে আমার কৃতজ্ঞ নমস্কার।

ছোট্টবেলা থেকে জানি ভারতবর্ষ এক। যুক্তি দিয়ে নয়, বুদ্ধি দিয়ে নয়—জানি বোধ দিয়ে, অনুভব দিয়ে, হৃদয় দিয়ে। হঠাৎ শুনলুম, দেখলুম, ভারতবর্ষ দুই। তারপর—ভারতবর্ষ তিন। এখন দেখছি ভারতবর্ষ চার পাঁচ দশ বিশ একশো। কিন্তু—

ঘটে যা তা সব সত্য নহে, কবি তব মনোভূমি……।
উত্তরে হিমালয় দক্ষিণে কুঁয়ারী
পশ্চিমে গুর্জর পুবে বং-বিয়োরী
গিরি নদী জনপদে চিত্রবিচিত্র
প্রকৃতির হাতে গড়া মহামানচিত্র।
ওড়িয়া আসামী খাসী তেলুগু ও তামিলে
মৈথিলী-সাঁওতালী—মিলে আর অমিলে
অদ্ভুত খেলা এক। এক নয়, তবু এক
লাখো-রঙ রামধনু—চোখ থাকে, চেয়ে দেখ,
মেলে দেখ।

অশনে বসনে আচারে ব্যবহারে রুচিতে স্বভাবে বিদ্যায় বুদ্ধিতে অভিজ্ঞতায় দৃষ্টিভঙ্গিতে প্রতিটি মানুষই তো আলাদা। এমন কি দুজন মানুষের ভাষা পর্যন্ত আলাদা। দুই বাঙালি কি এক বাঙলা বলে? মা দাদা বউদি শান্তি সুব্রতা আমি—আমরা কি এক বাঙলা বলি? দুই গুজরাতি কি এক গুজরাতি বলে? প্রত্যেকের শব্দের পুঁজি, শব্দপছন্দ, কথার বাঁধুনি, কথার ঢঙ আলাদা—এক হয়েও আলাদা। কিন্তু এই-সমস্ত আলাদা পাপড়ির মতো এক হয়ে ঘিরে আছে যে ফুলটিকে, তার নাম হৃদয়। সেখানে শুধু মানুষ কেন, শুধু ভারতবর্ষ কেন, সমস্ত পৃথিবীই এক। সাহিত্য এই হৃদয়েরই ভাষা। তাই তা সর্বজনবোধ্য।

রাজনীতিকরা নারদস্বভাব। তাঁরা দুজনের অনৈক্যের দিকটা, গরমিলের দিকটা উশকে খুঁচিয়ে, কোনো-কোনো সময় বানিয়ে, ঝগড়া বাধিয়ে মজা দেখেন, মজা লোটেন। কী সে মজা, সে তাঁরাই জানেন। সে মজার চোটে আমাদের বুক ফুঁড়ে দীর্ঘশ্বাস উঠছে, আমাদের মায়ের বুক চিরে রক্ত-গঙ্গা বইছে।

কবিরা সাহিত্যিকরা বাল্মীকিস্বভাব। তাঁরা সবার ঐক্যের দিকটা, মিলের দিকটা উজলে তুলে আমাদের নিয়ে চলেন একটা বড়ো-মিল মহা-মিলের দিকে, যার মধ্যে সমস্ত বিভেদ বৈচিত্র্য হয়ে ঐশ্বর্য হয়ে ঝলমল করছে।

"সোনল ছায়" অনুবাদ করার সময় আমার কাছে কয়েকটি কথা বড়ো হয়ে দেখা দিয়েছিল। ভূমিকায় কিছুটা বলেছি সে-কথা। এক হল, ভারতের প্রতিটি ভাষাই ভারত-ভূমির এক-একটি শব্দরূপ। প্রতি ভাষার সাহিত্য সেই শব্দ-রূপের অরূপ অমৃতনির্যাস। হৃদয়মনবুদ্ধির অন্তম রহস্য থেকে শুরু করে রীতিনীতি আচারব্যবহার রান্নাভাঁড়ারের যাবতীয় খবর সবই ধরা রয়েছে ওই অমৃতের স্বাদে গন্ধে। ভারতবর্ষকে জানতে হলে চিনতে হলে ওই অমৃত খেতে হবে। দিশী ভাষা শিখতে হবে। আড়ি করে বসে থাকলে চলবে না।

দ্বিতীয় কথাটি হল গুজরাতিরা আমাদের থেকে অনেক অনুবাদ করেছেন। আমরা প্রায় কিছুই করি নি। পান্নালাল পটেলের "মড়েলা জীব" বা মিলিত আত্মা (অর্থাৎ আত্মার মিলন) বইটি "জীবী"-নামে অনুবাদ করেছেন প্রিয়রঞ্জন সেন। এ ছাড়া আর কোনো উপন্যাসের অনুবাদ হয় নি, ছোটোগল্প নাটক সামান্য হয়ে থাকলেও। এ কী অভদ্রতা!

তার প্রায়শ্চিত্ত আমার সাধ্যমত আমি করেছি এবং করছি।

তৃতীয় কথাটি হল, লেখক শিবকুমার ভাই বাঙলাকে বাঙালিকে বাঙলার সংস্কৃতিকে এবং কলকাতাকে যথার্থই ভালোবাসেন। আর তিনি "সোনল ছায়ে" একটি কথা বলেছেন, যেটা আমাদের সবারই মনের কথা—আমি তো নিজেকে অবাঙালি মনে করি না। আমি তো ভারতীয় নাগরিক। ভারতের যে-কোনো কোনায় আমার থাকার অধিকার আছে।…এ-সমস্ত ক্ষেত্রে সচেতন মানুষেরা যদি আত্মসমর্পণ করে, তাহলে দেশটা একেবারে গোল্লায় যাবে না? আবার যেসব গুজরাতি কলকাতাতেও শুধু গুজরাতি হয়েই থাকতে চান, 'কলকাতার ঘটনাপ্রবাহের সঙ্গে', মানুষ সমাজ এবং সংস্কৃতির সঙ্গে কোনো সম্পর্ক না রেখে, তাঁদেরও তিনি কটাক্ষ করতে ছাড়েন নি।

আর-একটা কথা, যেটা আজকের দিনে সমস্ত চিন্তাশীল ভারতীয়ের কাছেই জরুরি। তিনি ভালো সংস্কৃত জানেন, এবং তাঁর লেখার মধ্যেও সংস্কৃতের সুবাস ছড়িয়ে দেন যখন তখন। "সোনল ছায়ে"র মধ্যেও তিনি উদ্ধৃত করেছেন মহাকবি ভবভূতির সেই বিখ্যাত শ্লোক—

ব্যতিষজতি পদার্থান্ আন্তরঃ কোঽপি হেতুঃ……।
ভালবাসা দেখে না তো বাইরের কোনো দোষগুণ
পরস্পরে বাঁধে কোনো অন্তর্গূঢ় গভীর কারণ।
সূর্যের উদয় হলে পথ ফুটে ওঠে তো আপনি
চাঁদের উদয়ে গলে গলে পড়ে চন্দ্রকান্ত মণি।

অথবা মানুষ-সম্বন্ধের অনিত্যতা সম্পর্কে রামায়ণে মহা-নাস্তিক জাবালির সেই নির্মম উক্তি—

যথা কাষ্ঠং চ কাষ্ঠং চ সমেয়াতাং মহার্ণবে।
সমেত্য তু ব্যপেয়াতাং কালমাসাদ্য কঞ্চন॥
মহাসমুদ্রে ভাসতে ভাসতে দুটি কাঠ
কাছাকাছি এসে পড়ে।
ছাড়াছাড়ি হয়ে কখন আবার ভেসে চলে যায় দূরে॥

৮৫-র তেসরা মার্চ—মনে হয় এই তো সেদিন—ভারতীয় ভাষাপরিষদে শিবকুমার জোশীর উপন্যাস "সোনল ছায়" (সোনালি ছায়া)-এর বাঙলা অনুবাদের মুক্তিসভায় অনুবাদিকার বক্তব্যের কিছু অংশ ছিল ওই। উপন্যাসটি হিন্দি তামিল মৈথিল ও সিন্ধিতে এবং সংক্ষেপে মারাঠিতে অনুবাদ হয়েছে আগেই। ওই সভায় ওই প্রত্যেকটি ভাষার পক্ষ থেকে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন বিদগ্ধজনেরা। হিন্দি ও সিন্ধি আলোচক-দ্বয়ের নাম ভুলে গেছি। দ্বিতীয়জন শ্রীশিক্ষায়তনের অধ্যাপিকা ছিলেন। মৈথিল অনুবাদ সম্পর্কে বলেছিলেন অনুবাদিকা ড. অণিমা সিং, মারাঠি অনুবাদ সম্পর্কে ড. প্রভাকর মাচওয়ে। বাঙলা অনুবাদ সম্পর্কে বলেছিলেন ড. শুভেন্দুশেখর মুখোপাধ্যায়।

শিবকুমার জোশী : সংক্ষিপ্ত জীবনপঞ্জী

বাঙলাদেশে না জন্মগ্রহণ করেও যাঁরা বাঙলার জলমাটি, তার মানুষ, ভাষা আর সাহিত্যকে ভালোবেসেছেন, শ্রদ্ধেয় শিবকুমার জোশী তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি ১৯১৬ সালে আমেদাবাদে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সংস্কৃতে অনার্স নিয়ে বি-এ পাশ করে শিবকুমার নিতান্ত ব্যবসার কারণেই কলকাতায় আসেন ১৯৩৭ সালে। ব্যবহারিক জীবনে বস্ত্রব্যবসায়ে ব্যস্ত থেকেও মননের ক্ষেত্রে সাহিত্যাচারী হয়ে ওঠেন। তিনি বাঙলা সাহিত্যের রসাস্বাদনে ব্রতী হন। বলতে গেলে ১৯৫০-এ "মুক্তি-প্রসূন" নামের একটি রেডিও-নাটক লেখার থেকেই শুরু হয় তাঁর সাহিত্যজীবন। বিশেষত তিনি নাটক রচনা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা দেখান। ছয়টি একাঙ্কিকা, পঁচিশটি নাটক লেখার পাশাপাশি কলকাতা আর বোম্বাইতে গুজরাতি আর হিন্দি নাটক করেছেন এবং এইসূত্রে তিনি সফল নাট্যপরিচালকও। "সুবর্ণরেখা" নাটকের জন্য ১৯৬৪-তে সঙ্গীতনৃত্যনাটক একাডেমি পুরস্কার পান। নাটক ছাড়া তিনি পনেরোটি ছোটোগল্প, ছাব্বিশটি উপন্যাস, ছয়টি অনুবাদ (বাঙলা থেকে গুজরাতিতে), দুটি ভ্রমণ-বৃত্তান্ত রচনা করেন। তিনি সুদীর্ঘ সাহিত্যসাধনার জন্য ১৯৭০-এ গুজরাতি সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার 'রণজিতরাম সুবর্ণচন্দ্রক' পেয়েছিলেন, বঙ্গীয়ভাষা প্রসার সমিতি থেকে পেয়েছিলেন সভাপতির স্বর্ণপদক। শিবকুমার ভারতীয় ভাষাপরিষদপশ্চিম-বাঙলা PEN ও গুজরাতি সাহিত্য পরিষদের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। দেশে যেমন, বিদেশেও তেমন বিভিন্ন সেমিনারে আমন্ত্রিত হবার সম্মান পেয়েছিলেন। ১৯৮১-তে করাচীতে গুজরাতি সাহিত্য-প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব তাঁর উপর অর্পিত হয়েছিল। শিবকুমার জোশী ১৯৮৮-র ৪ঠা জুলাই দেহত্যাগ করেন।

বিদ্যাসাগর : ব্যক্তি ও ব্যক্তিত্ব— 'বাংলাদেশ'-এর চোখে

সন্তোষকুমার অধিকারী

ড. সুকুমার সেন বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে একদা আমায় বলেছিলেন, এ যুগের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নামই তাঁর সর্বাগ্রে স্মরণে আসে। অনুরূপ উক্তি করেছিলেন প্রমথনাথ বিশীও। শ্রীবিশী উপরন্তু বলেছিলেন, 'বাঙালি বিদ্যাসাগর-বিস্মৃত জাতি।' প্রথম উক্তিটি সম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয় অভিমত, অর্থাৎ শ্রী বিশীর বিক্ষোভ—যে, বাঙালি বিদ্যাসাগর-বিস্মৃত' জাতি—বিষয়ে মনে হয়, কেউ দ্বিমত হবেন না। এ কথার সমর্থনে উল্লেখ করতে পারি, "বিদ্যাসাগর স্মারকগ্রন্থে"র সম্পাদক গোলাম মুরশিদ গ্রন্থটির ভূমিকা লিখতে গিয়ে যে কথাগুলি বলেছিলেন, তা থেকে দু-একটি পংক্তি। মুরশিদ সাহেব লিখেছিলেন,—

'বিদ্যাসাগরের সার্ধ-শততম জন্মবার্ষিকী এবার বাঙালীরা দুভাবে উদ্‌যাপন করলো। একদল বিদ্যাসাগরের প্রস্তরমূর্তি বিচূর্ণ করে ; অন্যদল আরো নির্দয়ভাবে—পরিপূর্ণ ঔদাসীন্য প্রদর্শন করে। অথচ বাঙালী ও বাঙালীর নবজাগৃতির জন্যে বিদ্যাসাগর যে অতুলনীয় কর্মযোগের পরিচয় দিয়েছেন, মহাকালের পরিপ্রেক্ষিতে তা বেশিদিনের কথা নয়।'

ইতিহাসের যাঁরা ছাত্র, তাঁদের স্মরণে থাকা উচিত যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগ পর্যন্ত ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজ এক অবর্ণনীয় বিকৃত, ম্রিয়মাণ অবস্থায় নিমজ্জিত ছিল। (উল্লেখ্য—Dr. R. C.Majumdar—Glimpses of Bengal in the Nineteenth Century।) অশিক্ষা, অজ্ঞতা আর অন্ধবিশ্বাসের হাত থেকে উদ্ধার করে দেশ এবং সমাজকে যাঁরা নবজাগরণের পথে নিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। তাঁর বিশাল কর্মযজ্ঞের কেন্দ্র ছিল কলকাতা, অথচ আশ্চর্য এই, তাঁর স্বদেশের মানুষ তাঁর প্রতি 'সীমাহীন ঔদাসীন্যই' শুধু দেখায় নি, নগরীর হৃৎকেন্দ্রে স্থাপিত তাঁর প্রস্তরমূর্তিটি ধ্বংস করে তাঁর স্মৃতিকেও বিলুপ্ত করতে চেয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ভাবার সুযোগ নিতে পারি, পূর্ব বাংলায় 'বাংলাদেশ'-এর শিক্ষাজীবী মানুষ এবং সাহিত্যিকের হাতে তাঁর কী মূল্যায়ন ঘটেছে।

আমরা স্মরণে রাখতে পারি, বাংলাদেশের মানুষই বুকের রক্ত দিয়ে বাংলা ভাষাকে জাতীয় ভাষার মর্যাদায় উন্নীত করেছে, তাকে প্রাণের ভাষা করে নিয়েছে। আরও একটি কথা, বিদ্যাসাগরের সংস্কারমূলক কাজগুলির সঙ্গে সেদিনের মুসলমান সমাজের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল না। তাই বাংলাদেশের শিক্ষিত মুসলমান সমাজের দৃষ্টিতে বিদ্যাসাগরের যে মূর্তি গড়ে উঠেছে, নিঃসন্দেহে তা নতুন যুগের, এবং নৈর্ব্যক্তিক মূল্যায়ন হিসাবে গ্রাহ্য হবে।

এই মুহূর্তে আমরা যে গ্রন্থটিকে আমাদের সামনে রেখেছি, সেটি হল রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক গোলাম মুরশিদ-সম্পাদিত "বিদ্যাসাগর স্মারক গ্রন্থ"। বিদ্যাসাগর প্রসঙ্গে যাঁরা আলোচনা করেছেন, তাঁদের মধ্যে আছেন—ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আহমদ শরীফ, এবং রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়ের গোলাম মুরশিদ, আলী আনোয়ার, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকি, মযহারুল ইসলাম, মুখলেছুর রহমান প্রমুখ গবেষক এবং লেখক। বিদ্যাসাগরের সমকালীন সমাজ, সমাজচিন্তা, সমাজসংস্কার, শিক্ষাচিন্তা, শিক্ষাসম্প্রসারণ, নৈতিক মূল্যবোধ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

গ্রন্থের ভূমিকায় সম্পাদক গোলাম মুরশিদের কথাগুলি অত্যন্ত মূল্যবান বলে আমার মনে হয়েছে। বিদ্যাসাগরের প্রতি বাঙালি সমাজের 'পরিপূর্ণ ঔদাসীন্যে'র কারণ দেখাতে গিয়ে, তিনি যে কথাগুলি বলেছেন, তার কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করছি :

'স্বকালের পটভূমিকায় বিদ্যাসাগরের চিন্তা ও কর্মপন্থা অন্যান্যের তুলনায় এত প্রাগ্রসর ও স্বতন্ত্র যে, তাঁকে উনবিংশ শতকের মাপে কিছুতেই বাঁধা যায় না।

'বিদ্যাসাগরের যে পরিচয় তাঁর জীবনীগ্রন্থগুলিতে বিধৃত ; অথবা তাঁর চিন্তাধারা ও কর্মযোগের যে ব্যাখ্যা স্বনামধন্য সমালোচকগণ প্রদান করেছেন তাতে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের ঔদার্য সবটুকু ধরা পড়ে নি। না পড়ারই কথা; কেন না সমাজসচেতনতাই যাঁর অস্তিত্বের প্রধান অংশ, তাঁর যথার্থ মূল্যায়ন সমাজ সম্পর্কে অর্ধচেতন লেখকগণ স্বভাবতই করতে পারেন নি। তাঁর অনন্যতা এবং দেশ, কাল ও সমাজের তুলনায় অপরিসীম প্রগতিশীলতার ব্যাখ্যাই এই পণ্ডিতগণ করতে সমর্থ হন নি।'

আলোচ্য গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি সম্বন্ধে সম্পাদকের মন্তব্য—'বর্তমান গ্রন্থে বিদ্যাসাগরের পুনর্মূল্যায়নের একটি প্রয়াস আছে।' পূর্ববাঙলার মানুষ বিদ্যাসাগরকে যে নতুন আলোকে দেখেছেন, তার সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের মানুষের পরিচয় ঘটা উচিত বলেই মনে করি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের রীডার আহমদ শরীফের খ্যাতি গবেষক হিসাবে। ব্যক্তি বিদ্যাসাগর আর তাঁর ব্যক্তিত্ব নিয়ে আহমদ শরীফের যে চিন্তা, তা প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর প্রবন্ধে। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে আলোচনায় তিনি বলেছেন, বিধাতা সেকালের কোলকাতায় "মানুষ" একজনই গড়েছিলেন, যিনি ধুতিচাদরচটির মর্যাদা প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, যিনি জীবন ও জীবিকাকে আদর্শের জন্য পদানত করেছিলেন, যাঁর হিমাদ্রিদৃঢ় সংকল্পের কাছে মাথা নত করেছে ইংরাজ ভারতীয় সবাই। যাঁর মানস ঐশ্বর্যের কাছে হার মেনেছিল রাজসম্পদ।'

ব্যক্তি বিদ্যাসাগরকে নিয়ে আলোচনায় মযহারুল ইসলাম বলেছেন, 'জীবনে রক্ষণশীলতার জীর্ণ দুর্গকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন চূর্ণ বিচূর্ণ করতে সমর্থ হয়েছিলেন বলেই তিনি হয়েছিলেন বিদ্যাসাগর।...আমাদের একালের চরিত্রহীন বুদ্ধিজীবীদের পীড়াদায়ক নিরাসক্তি ও নপুংসক নির্বিকারত্ব নিয়ে তাই আমরা হাত যত লম্বা করেই বিদ্যাসাগরের প্রোজ্জ্বল আলোক স্পর্শ করতে চাই না কেন, আমরা ব্যর্থ হব, কেননা তিনি যে আমাদের নাগালের বাইরে অনেক উচ্চে দণ্ডায়মান একটি প্রভাময় সূর্য।'

একই কথা ১৩০২ সালে আরও তীক্ষ্ণ আর স্পষ্ট ভাষায় বলেছিলেন যিনি, তিনি হলেন রবীন্দ্রনাথ। "সাধনা"য় একটি প্রবন্ধে ("বিদ্যাসাগর-চরিত") তিনি লিখেছিলেন—'এই দুর্বল, ক্ষুদ্র, হৃদয়হীন, কর্মহীন, দাম্ভিক, তার্কিক জাতির প্রতি বিদ্যাসাগরের এক সুগভীর ধিক্কার ছিল। কারণ, তিনি সব বিষয়েই ইহাদের বিপরীত ছিলেন।' আশ্চর্য মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ ১৩০২ সালে বিদ্যাসাগর-চরিত্রের যে মূল্যায়ন করেছেন, সত্তর বছর পরে পশ্চিমবঙ্গে নয়, পূর্ববঙ্গের লেখকসমাজ বিদ্যাসাগরকে ভেবেছেন সেই একই দৃষ্টিতে।

একটি দীর্ঘ প্রবন্ধে সমকালীন যুগের ছবি এঁকেছেন গোলাম মুরশিদ। রামমোহন, রাধাকান্ত দেব, ডিরোজিয়ো এবং প্যারীচাঁদ মিত্র আর বঙ্কিমচন্দ্রের পাশাপাশি বিদ্যাসাগরকে তুলে ধরে একটি তুলনামূলক আলোচনা করেছেন তিনি। বাঙলার নবজাগরণের উদ্যোগে অন্যদের চারিত্রিক অসম্পূর্ণতা এবং স্বধর্ম-বিরোধিতার উল্লেখ করে তিনি বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বের মহত্বকে স্থাপিত করেছেন। তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে তুলে ধরেছেন এইভাবে—

'বিদ্যাসাগর রামমোহনের মতো সংস্কারবাদী ছিলেন না, তাঁর চিন্তা ও কর্ম ছিল রীতিমতো বৈপ্লবিক।...অকাল ও অবাস্তব প্রয়াস ইয়ং বেঙ্গলদের ব্যর্থতা অনিবার্য করে তুলেছিল,...বিদ্যাসাগর সংস্কারের ধীরপন্থার দ্বারা তাঁর বৈপ্লবিক ধ্যানধারণাকে মূর্ত করতে চেয়েছিলেন।...তিনি অনুধাবন করেছিলেন, ধর্মের পসরা ফেরি করে দিনযাপনের কাল শেষ হয়ে এসেছে, মানুষকে অধিকতর শোচনীয়তা থেকে বাঁচানোর একমাত্র পথ শিক্ষার বিকিরণ।'

ইউরোপীয় রেনেসাঁসের পণ্ডিতগণ মধ্যযুগীয় ধর্মীয় পরিবেশে সাহিত্য, শিল্প আর দার্শনিককে মানবিক দৃষ্টি দিয়ে দেখেছিলেন, এবং মানবতার বাণীকে প্রচার করেছিলেন। তাই তাঁদের "হিউম্যানিস্ট" আখ্যায় ভূষিত করা হয়েছিল। বিদ্যাসাগরকেও সেই অর্থে আমাদের দেশে কোন কোন পণ্ডিত লেখক সেই একই অর্থে "হিউম্যানিস্ট" বলে প্রচার করেছেন। আশ্চর্যের ব্যাপার, এপার-বাঙলার, বিশেষ করে কলকাতার বিশিষ্ট জীবনীলেখকদের কাছেও বিদ্যাসাগরের চরিত্রের সমগ্রতা দৃষ্টিগোচর হয় নি। অথচ রাজশাহি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মুরশিদ সাহেব বিদ্যাসাগরের অনেক দূরের মানুষ হয়েও তাঁর সেই সামগ্রিক চারিত্রধর্মকে অনুধাবন করার চেষ্টা করেছেন। তিনি লিখেছেন, 'বিদ্যাসাগর যদি রেনেসাঁ যুগের কর্মযোগীদের শুদ্ধ অনুকরণ ও অনুসরণ করতেন, তাহলে সত্যি তাঁকে অনাধুনিক বলতে হত।

বিদ্যাসাগর স্মারকগ্রন্থ—সম্পাদক : গোলাম মুরশিদ। সাহিত্য সংসদ, রাজশাহী।

কিন্তু সুখের বিষয়, এ ব্যাপারে বিদ্যাসাগর কালচেতনার স্বাক্ষর রেখে গেছেন ; এমন কি, তিনি স্ব-কালের চেয়েও অনেক প্রাগ্রসর একথাও বোধহয় বলা চলে।' তাঁর কথাকে আরও স্পষ্ট করে তিনি বললেন, 'বিদ্যাসাগরের মানবিকতা সমকালীন য়ুরোপীয় দর্শনের তুলনায় পশ্চাৎপদ তো নয়ই, বরং অনেক ক্ষেত্রেই প্রাগ্রসর। কেন না তাঁর মানবিকতা বিশুদ্ধ মানবিকতা, সে আদর্শ মোটেই ঈশ্বরনির্ভর নয়।'

আর-একটি জায়গায় তিনি লিখেছেন,—'সর্বোপরি, তাঁর চিন্তা মানবমুখিন, এবং তাঁর কার্য গণকেন্দ্রিক।'

এই গ্রন্থের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ হল আলী আনোয়ারের "বিদ্যাসাগর ও ব্যক্তির সীমানা"। অধ্যাপক আনোয়ারই জোর দিয়ে বলেছেন যে, বিদ্যাসাগর ধর্মীয় আন্দোলন করেন নি, রাজনৈতিক আন্দোলনও নামেন নি ; তিনি চেয়েছিলেন বিস্তৃত ক্ষেত্রে সামাজিক পরিবর্তন। 'সামাজিক সংস্কার দ্বারা যেমন তিনি সমাজকে মুক্ত শোধিত ও সচল করতে চেয়েছিলেন, শিক্ষাব্যবস্থাকেও তেমনি সমাজপরিবর্তনের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছেন। পরিবর্তনকে ভিতর ও বাহির উভয়দিক থেকেই আবাহন করেছেন ; তিনি একই সঙ্গে যোগী ও কর্মিসার।'

বস্তুত, বিদ্যাসাগর-চরিত্রের এই প্রচণ্ড গতিশীল আধুনিকতাকে বুঝবার চেষ্টা না করলে আমরা তাঁকে ভুল বুঝব। সমাজ এবং শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক এবং মানবিক করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে, সমাজে স্ত্রীপুরুষবৈষম্যের অবসান ঘটিয়ে এবং শিক্ষার আলোকে অতীতের অন্ধ তামসিকতাকে পুড়িয়ে দিয়ে যিনি সমগ্র দেশকে গড়ে তোলার বিশাল কর্মযজ্ঞে নেমেছিলেন, তিনি কিন্তু তাঁর আদর্শ আর লক্ষ্যের কথা, তাঁর শিক্ষাদর্শন আর মানবহিতবাদ দর্শনের কথা লিখে যান নি কোথাও। কাজেই তাঁর অন্যন্য প্রগতিশীলতাকে সামগ্রিকভাবে বুঝতে পারেন নি তাঁর জীবনীলেখকেরা।

বিভিন্ন সমালোচক তাঁকে নাস্তিক আখ্যা দিয়েছেন ; সম্প্রতি এক আশ্রম পত্রিকায় জনৈক লেখক তাঁকে ধর্মহীন, অশিক্ষিত ইত্যাদি বিশেষণেও ভূষিত করতে চেয়েছেন। বঙ্কিমচন্দ্র যেমন তাঁর বিধবাবিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ রহিত করার প্রয়াসকে তীব্র সমালোচনা করেছেন, তাঁর জীবনীকার বিহারীলাল সরকার এবং স্ববলচন্দ্র মিত্রও তেমনি তাঁর সমাজপরিবর্তনের চেষ্টাকে ভ্রান্ত নীতি বলে বর্ণনা করেছেন। তাঁর প্রিয় ছাত্র কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য ব্যক্তিগত কারণে বিদ্বিষ্ট হয়ে তাঁকে নাস্তিক, অজ্ঞেয়বাদী ইত্যাদি আখ্যা দিয়েছেন। অধ্যাপক আনোয়ার কিন্তু এ ধরনের লঘু মন্তব্য কোথাও করেন নি। বরং শ্রদ্ধার দৃষ্টি নিয়ে তিনি যে বিদ্যাসাগরকে জানবার চেষ্টা করেছেন, তার পরিচয় তাঁর প্রবন্ধের সর্বত্র। তিনি লিখেছেন, 'বিদ্যাসাগর ধর্ম সম্বন্ধে উদাসীন ছিলেন না। প্রভূত কৌতূহল ও আবেগ নিয়ে তিনি হিন্দুশাস্ত্র ও পুরাণাদি পাঠ করেছিলেন। প্রতিপক্ষ ইসলাম ধর্ম ও খ্রীষ্টানধর্ম সম্বন্ধেও তাঁর জিজ্ঞাসা ছিল। তাঁর ব্যক্তিগত লাইব্রেরিতে তাঁর পঠিত কোরান-শরীফ এখনো রক্ষিত আছে।' আনোয়ার সাহেব বিদ্যাসাগর-চরিত্রের মর্ম উদ্‌ঘাটন করতে চেয়েছেন নবযুগের চেতনা দিয়ে। তাই লিখতে পেরেছেন যে, বিদ্যাসাগর শিক্ষাকে 'মুক্তি আশ্রয়ী বিজ্ঞানমুখিন ও ধর্মনিরপেক্ষ করতে চেয়েছিলেন।...সামাজিক মুক্তি তাঁর শিক্ষাদর্শনের লক্ষ্য।'

অধ্যাপক আনোয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তুলেছেন বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে, যা আলোচনার সীমাকে প্রসারিত করেছে।

সে প্রশ্ন তাঁর রাজনৈতিক উদাসীনতা সম্বন্ধে। তিনি লিখেছেন, 'আত্মবিশ্বাস, সহায়ভূতি, বিবেক, চিন্তার ক্ষমতা বা সাহস কোনটারই অভাব বিদ্যাসাগরের ছিল না। সাহসের অভাব তো নয়ই। এই রাজনৈতিক আত্ম অপসারণ তথা সমষ্টির রাজনৈতিক ভূমিকার উপলব্ধির অভাবই কি তবে সাফল্য নির্ভর বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্বের তথা নেতৃত্বের সীমানা ?'

আলী আনোয়ার একই প্রবন্ধে অন্যত্র লিখেছেন, 'নতুন সমাজব্যবস্থার জন্মলগ্নে, তাঁর সংস্কারমূলক কর্মসূচীর বাস্তবায়ন করতে গিয়ে ইংরেজ শাসকদের যে সহযোগিতা তিনি পাচ্ছিলেন প্রচণ্ড ও দুর্মর রাজশক্তির বিরোধিতা দ্বারা সে পৃষ্ঠপোষণা তথা সামাজিক মুক্তি ও উন্নততর জীবনযাত্রার সম্ভাবনা তিনি হারাতে রাজি ছিলেন না।' বিদ্যাসাগরের চরিত্রের আর-একটি বৈশিষ্ট্য যা আনোয়ার সাহেবও উল্লেখ করতে সম্ভবত ভুল করেছেন, তা হল—বিদ্যাসাগর সাফল্যকে নিশ্চিতভাবে না জেনে কোনো কাজে অগ্রসর হতেন না, এবং যে কাজে যোগ দেবেন না, সে সম্বন্ধে কোনো মতামত তিনি ব্যক্ত করতেন না।

তলস্তয় সম্পর্কে রাশিয়া একদা যে মনোভাব পোষণ করত, পরবর্তী কালে তার সংশোধন করেছিল। ব্যক্তিত্ব যত বড়োই হোক, তার কাজের একটি নির্দিষ্ট সীমারেখা থাকাই স্বাভাবিক। বিশ্বখ্যাত দার্শনিক ভলতেয়ারের একটি উক্তি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ছে।—Politics is not in my line. I have always confined myself to doing my littie best to make men less foolish and more honourable.

গ্রন্থটিতে বিভিন্ন লেখকের আরও কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলিত হয়েছে। এই ক্ষুদ্র আলোচনায় প্রত্যেকটি প্রবন্ধ সম্বন্ধে বলা সম্ভব নয়। শুধু বলি, ওপার-বাঙলার লেখকসমাজ বিদ্যাসাগরকে দেখেছেন ধর্মনিরপেক্ষ এবং ইতিহাসসচেতন দৃষ্টি দিয়ে। ধর্ম, রক্ষণশীলতা এবং রাজনীতির আবিলতা থেকে মুক্ত থাকায় তাঁদের হাতে বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব আর কর্মধারার যে মূল্যায়ন হয়েছে, তা স্বাভাবিক এবং যুক্তিনির্ভর। এমন একটি মূল্যবান গ্রন্থের জন্য সম্পাদকের কাছে আমরা কৃতজ্ঞ।

মুদ্রার ইতিহাস

সৌম্যেন্দ্রকুমার গুপ্ত

সর্দার কে. এম. পানিক্কর যখন চীনে ভারতের রাষ্ট্রদূত, একজন প্রখ্যাত চীনা ঐতিহাসিক তাঁকে জানিয়েছিলেন যে ভারত-ইতিহাসের কোনো বই পড়তে গিয়ে বারবারই মাঝপথে তাঁকে নিরস্ত হতে হয়, কেননা বইগুলোকে ইতিহাস-বইয়ের চাইতে অনেক বেশি পরিমাণে টেলিফোন ডাইরেকটরি বলেই মনে হয়—যেন পরস্পর-বিচ্ছিন্ন নামের এক-একটি তালিকামালা! পানিক্কর ভারতীয় ইতিহাসচর্চার এই সীমাবদ্ধতা স্বীকার করে নিয়ে লিখেছেন যে ভারতবাসীর ইতিহাসের কাঠামো-বা কঙ্কাল-স্বরূপ বংশাবলী আর কালানুক্রমের কোনো রূপরেখাই যেখানে ছিল না, সেখানে সেটা রচনা করাই ছিল ভারতে ইতিহাসচর্চার প্রাথমিক কাজ। ফলে গবেষকরা নিযুক্ত ছিলেন আকর-গ্রন্থের সম্পাদনা, প্রত্নতাত্ত্বিক খনন, লিপির পাঠোদ্ধার, মুদ্রার অনুশীলনের মতো নীরস মজুর-সুলভ বৌদ্ধিক শ্রমে। এইসকল গবেষণার ফলে ইতিহাস রচিত হয় নি, যা রচিত বা সংগৃহীত হয়েছিল তাকে বলা চলে ইতিহাসের প্রেক্ষাপট। এরকম এক দৃষ্টিকোণ থেকেই আলোচ্য "ভারতের মুদ্রা" বইটি পড়তে শুরু করা গিয়েছিল—টেলিফোন ডাইরেকটরির এক অন্যতর সংস্করণের সঙ্গে পরিচয় ঘটবে এইরকম আশঙ্কা নিয়েই। কিন্তু অন্য চমক অপেক্ষা করছিল বইটির দুই মলাটের মধ্যে। লেখক খ্রীষ্টপূর্ব যুগে ভারতে মুদ্রা আবিষ্কার আর প্রচলনের কাল থেকে শুরু করে স্বাধীনতা-উত্তর যুগ পর্যন্ত ভারতীয় মুদ্রার চিত্তাকর্ষক কাহিনী আমাদের শুনিয়েছেন। এই কাহিনী যদি ভারতের রাজবংশাবলী আর ঐতিহাসিক কালানুক্রম রচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত, তাহলে আমাদের আশঙ্কাই হয়তো সত্য প্রমাণিত হত। কিন্তু লেখক যেভাবে মুদ্রার দর্পণে ভারতের সামাজিক-রাজনৈতিক ও ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক জীবনপ্রবাহকে তুলে ধরেছেন, তা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমাদের আকৃষ্ট করে রাখতে সক্ষম হয়েছে। সভ্যতার অগ্রগতি, সমাজসংগঠনের উত্থানপতন, সংস্কৃতির সমন্বয়রূপান্তর, দৃষ্টিভঙ্গির পালাবদল, রাষ্ট্রের ভূমিকার বিভিন্নতা ইত্যাদির মতো যেসব উপাদান নিয়ে জাতীয় ইতিহাস গড়ে ওঠে, সেগুলির নানা দিকে আলো ফেলে লেখক নীরস মুদ্রাতত্ত্বকে সরস ইতিহাসে পরিণত করেছেন।

উদাহরণ হিসেবে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ধারাটির দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়। আলেকজান্ডারের আক্রমণের পরে উত্তর-পশ্চিম ভারতে ব্যাকট্রীয় গ্রীকদের যে-সকল রাজ্য গড়ে ওঠে, ভারতে সর্বপ্রথম সেখানেই মুদ্রার মধ্যে দিয়ে সংস্কৃতির লেনদেনের পরিচয় মেলে। মুদ্রায় প্রথম লিখিত লিপির দেখা পাওয়া যায়, প্রথমে গ্রীক ভাষায়, পরে খরোষ্ঠী লিপিতে প্রাকৃত ভাষায়। শুধু তাই নয়, 'ভারত-ব্যাকট্রীয় শাসকগণ ক্রমশ ভারতীয় ঐতিহ্যের দ্বারা প্রভাবিত হচ্ছিলেন। এই মুদ্রার একদিকে অঙ্কিত রয়েছে চক্রসহ বাসুদেব (কৃষ্ণ) এবং অন্যদিকে স-লাঙ্গল বলরাম। শিল্পের জগতে এটাই সর্বপ্রথম ভারতীয় দেবতার চিত্রিত রূপ।' ভারতের ইতিহাসে সংস্কৃতি-সমন্বয়ের এই ধারার বারবার দেখা মিলেছে। মুসলিম যুগের শুরুতেও সংস্কৃতি-সমন্বয়ের এই প্রয়াসের পরিচয় থেকে গেছে মহম্মদ গজনী আর মহম্মদ

ভারতের মুদ্রা—পরমেশ্বরী লাল গুপ্তা (অনুবাদ অরুণ বিশ্বাস)। ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, নয়াদিল্লী। বত্রিশ টাকা।

ঘোরীর মুদ্রায়। গজনীর মুদ্রার সোজা দিকে আরবি ভাষা আর লিপিতে ইসলাম ধর্মের "কলিমা" মুদ্রিত; বিপরীত দিকে সংস্কৃত ভাষায় দেবনাগরী লিপিতে কলিমার অনুবাদ—'অব্যক্তমেকম্ মহম্মদ অবতার' এবং মুদ্রা-প্রবর্তনকারী রাজার নাম 'নৃপতি মহম্মদ' লেখা। মহম্মদ ঘোরীর মুদ্রার সোজা দিকে উৎকীর্ণ করা হত উপবিষ্টা লক্ষ্মী দেবী এবং নাগরী লিপিতে স্বীয় নাম মহম্মদ বিন সাম। হিন্দু মুসলিম ধর্ম এবং দর্শনের স্বতঃস্ফূর্ত বোঝাপড়ার এক আশ্চর্য নিদর্শন! পরবর্তী মোগল যুগেও আকবরের মুদ্রায় সমন্বয়-ভাবনার একই ধরনের অনুবর্তন লক্ষ করা যায়: আকবরের রাজত্বের ৫০ বর্ষ পূর্তি উপলক্ষে নাগরী হরফে 'রাম-সিয়া' লিপি সহ রামসীতার চিত্র অঙ্কিত সোনা আর রুপার মুদ্রা প্রবর্তিত হয়েছিল। মুসলিম যুগের মুদ্রার এই উদাহরণগুলি বিচারের সময় মনে রাখা দরকার যে, প্রতিমূর্তি বা ছবি চিত্রিত করা ইসলাম ধর্মে নিষিদ্ধ। পরবর্তী কালেও ইয়োরোপীয় জাতিগুলি ভারতের নানা প্রান্তে তাদের উপনিবেশ গড়ে তোলার পরেও দেশী-বিদেশী নানা মোটিফ ও ভাবাযুক্ত মুদ্রার মাধ্যমে একই ধরনের সংস্কৃতি-সমন্বয়ের ধারা বহমান থেকেছে। শুধু সংস্কৃতি-সমন্বয়ই নয়; সমাজ আর রাজনীতির গতিপ্রকৃতির পরিচয়ও ভারতের মুদ্রায় ধরা থেকেছে। পরমেশ্বরী লাল গুপ্তা এই সবকিছুকেই আমাদের গোচরে এনেছেন।

লেখক অনুমান করেছেন যে খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দীতে ভারতে সর্বপ্রথম মুদ্রার উদ্ভাবন হয়েছিল। সেই সময় থেকে শুরু করে স্বাধীনতা-উত্তর ১৯৬৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ৩৬৬টি মুদ্রার দুই পিঠের চিত্ররূপ ৩৪টি আর্টপ্লেটে সন্নিবেশ করে পরিচিতিসহ সংযুক্ত হওয়ায় বইটি একই সঙ্গে আকর্ষণীয় এবং প্রামাণিক হয়ে উঠতে পেরেছে। ভারতে মুদ্রা প্রচলনের সময় থেকে আলেকজানডারের ভারত আক্রমণের পূর্ব পর্যন্ত যে সকল পানচ-মার্কা আর ছাঁচে ঢালাই (cast) মুদ্রার চিত্র (১নং থেকে ৩২ নং) দেখা যাচ্ছে তাতে নানাপ্রকার জ্যামিতিক চিহ্ন, বৃষ, সিংহ, কর্কট, মৎস্য, হস্তী, চন্দ্র, সূর্য, পদ্ম, বৃক্ষ, পর্বত ইত্যাদির সুস্পষ্ট প্রাধান্য। দু-একটি ব্যতিক্রম ছাড়া মুদ্রায় মানুষের চিত্রের অভাব এই পর্বে লক্ষণীয়। আলেকজানডারের ভারত আক্রমণ থেকে সুলতান মামুদের ভারত অভিযান পর্যন্ত ৩৩নং থেকে ২১৪নং মুদ্রায় লক্ষ করা যায় চিত্ররূপে সুনিশ্চিতভাবে মনুষ্যমূর্তির প্রাধান্য। বিশেষত ভারত-ব্যাকট্রীয় মুদ্রামালায় রাজাদের মুখমণ্ডল যে-রকম সুস্পষ্ট করে অঙ্কিত হয়েছে অথবা দাঁড়ানো দেবমূর্তি বা ধাবমান অশ্বের অঙ্কনে যে শিল্প-সুষমার পরিচয় থেকে গেছে, তার কোনো তুলনা পরবর্তী কোনো যুগের ভারতীয় মুদ্রাতেই মেলে না। এইসকল মুদ্রার গভীর প্রভাবের ফলাফল পরবর্তী কালের শক, পার্থীয়, কুষাণ, হূণ, গুপ্ত ও গুপ্তোত্তর যুগের মুদ্রাগুলিতে বহমান থাকতে দেখা যায়। ২১৫নং থেকে ৩২২নং মুদ্রাচিত্রে একাদশ থেকে অষ্টাদশ পর্যন্ত ভারতের মুসলিম শাসনকালে মুদ্রার রূপান্তরের চিত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজা-রানী বা দেবদেবীর মূর্তি-চিত্রণ প্রায় অন্তর্হিত হয়; বদলে দেখা যায় মূলত আরবি ফারসি লিপি আর ভাষায় ইসলাম ধর্মের 'কলিমা' এবং সুলতান-বাদশাহদের নাম-পরিচয়। এই সাধারণ প্রবণতার উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমের কথা পূর্বেই আলোচনা করেছি। অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ৩২৩নং থেকে ৩৬৬নং মুদ্রাচিত্রে পুনরায় রাজা, রানী, প্রধানমন্ত্রী ইত্যাদির মূর্তি-চিত্রণ দেখা যাচ্ছে।

সাধারণ পাঠকের কাছে "ভারতের মুদ্রা" বইটি চিত্তাকর্ষক ঠেকবে কতকগুলি কারণে। প্রথমত, নিম্ন-বিদ্যালয় থেকে ভারত-ইতিহাসের যে রূপরেখার সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় ঘটে, বইটির মধ্যে দিয়ে সে পরিচয়ের এক প্রামাণিক ভিত্তির খোঁজ তাঁরা পাবেন। দ্বিতীয়ত, ভারত-ইতিহাসের অন্ধকার কিছু পর্বকে, যেমন গ্রীক-ভারত যোগাযোগ, নতুন আলোকে দেখা সম্ভব হবে। তৃতীয়ত, মুদ্রার চিত্ররূপ তথা অনুপুঙ্খ বর্ণনা তাঁদের আগ্রহকে উদ্দীপ্ত করবে।

সাবলীল বাঙলা অনুবাদে চিত্তাকর্ষক এই বইটি পড়ে বার-বার দুটি অভাবের কথাই মনে হয়েছে। প্রথমত ভারতীয় মুদ্রাচর্চার একটি ছোটো ইতিবৃত্ত সংযোজিত হলে, এ ক্ষেত্রে কানিংহাম, র‍্যাপসন, হোয়াইটহেড, টার্ন, অ্যালান, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, এ.এস. আলতেকার ও ডি: ডি. কোশাম্বী প্রমুখের অনুশীলনের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় ঘটত। দ্বিতীয়ত ভারতের মুদ্রা ভারতের অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার বিবর্তনে যুগে যুগে কী ধরনের ভূমিকা গ্রহণ করছে তার একটি সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ একান্তভাবে জরুরি ছিল। এক্ষেত্রে কোশাম্বীর দিকদর্শী ভারতীয় মুদ্রার সংখ্যাগাণিতিক বিশ্লেষণ ও গবেষণা সবচেয়ে বেশি কাজে লাগতে পারত। শেষ বিচারে অর্থনৈতিক বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবেই যে মুদ্রার ঐতিহাসিক গুরুত্ব, এ-সত্য কি উপেক্ষা করা যায়, না, করা উচিত?

স্বাধীনতা-সংগ্রামে মুসলিম নারী

খাজিম আহ্‌মেদ

বহুজাতিক ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাস বিশাল। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এই সংগ্রামের নানান অধ্যায়গুলো আলোচিত। কিন্তু এদেশের ইতিহাসচর্চার বড়ো খামতি হল বিচার-বিমুখতা। অবশ্য কিয়ংকাল থেকে নির্মোহ মূল্যায়ন শুরু হয়েছে—যদিও তা জাতীয় জীবনে গভীর কোনো প্রভাব ফেলতে পারে নি। স্বাধীনতা-সংগ্রামে বিভিন্ন জাতিসত্তার ভূমিকার সঠিক স্থানটি নিরূপিত হয় নি। বিশেষ-সম্প্রদায়ভুক্ত এক শ্রেণীর কথাই যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে প্রচার করা হয়েছে। ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে মুসলিম সমাজের প্রতিক্রিয়া, এমন কি, ফরাজি-ওয়াহাবি আন্দোলনে যেসব অর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিক প্রশ্নসমূহ উত্থাপিত হয়, তার প্রকৃত মূল্যায়ন হয় নি। হাল আমলে কিছু সেকুলার এবং সায়েনটিফিক আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। ভারতের মুক্তিসংগ্রামে মুসলমানরা বিশ্বাসঘাতকতা করেছে, এবং দেশভাগ তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি—এমন অভিযোগও কোনো-কোনো ঐতিহাসিক করে থাকেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি জাতীয় সংহতিকে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করছে নিরন্তর। এই কারণেই সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মুক্তি-আন্দোলনে ভারতের মুসলমানদের সদর্থক ভূমিকা কতখানি ছিল, তার পরিমাপ হওয়া দরকার।

সেই অনুচ্চারিত বিষয়ের ওপর আলোকপাতের উদ্দেশ্যে জনাব এম. আবদুর রহমান সারা জীবন অশেষ পরিশ্রম এবং গবেষণা করে চলেছেন। এই নিরলস জীবনধর্মী গবেষকের কাছ থেকে আমরা পেয়েছি প্রায় চব্বিশখানি মূল্যবান গ্রন্থ। "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমান" সিরিজের অন্যতম গ্রন্থ "ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম বীরাঙ্গনা"। অশীতিপর জ্ঞানবৃদ্ধ জনাব রহমান নয়জন দেশপ্রেমিক মহিলার আলোর অধিক জীবনকাহিনী বিবৃত করেছেন ঐতিহাসিক এবং সমাজবিজ্ঞানীর দৃষ্টি নিয়ে। মূল আলোচনায় প্রবেশের মুখে 'অবতরণিকা'য় স্বাধীনতাসংগ্রামে মুসলমানদের অবদান সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রয়োজনীয় আলোচনা সেরে নিয়েছেন।

পলাশি যুদ্ধের পর ১৭৬০ সালে বীরভূমের বাঙালি শাসক আসাদুজ্জামান খাঁয়ের নেতৃত্বে বাঙলা আর বিহারের কয়েকজন জমিদার সংঘবদ্ধ হয়ে ইংরেজ কোমপানিকে উৎখাত করার জন্য একাধিকবার অস্ত্র ধারণ করেন। এই-সমস্ত যুদ্ধে এবং আসাদুজ্জামানের মৃত্যুর পরেও বীরভূমের সাহসী নায়িকা রানী লালবিবি দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যে সংগ্রাম করেছিলেন, এবং ফকির বিদ্রোহের নায়ক মজনু শাহকে বিপুল অর্থ অর্পণ করেছিলেন, তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন। বিদুষী মহিলা চাঁপাবিবির তত্ত্বাবধানে রানী লালবিবি কোমপানি-প্রাধান্যকে খর্ব করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। কিন্তু তিনি ব্যর্থ হন। অযোধ্যার বেগম হজরত মহল ভারতের স্বাধীনতা-সংগ্রামের এক মহীয়সী মহিলা। সিপাহি বিদ্রোহের অন্যতম কেন্দ্র ছিল লখনৌ। এই মহাবিদ্রোহের অগ্রনায়ক মৌলবী আহমদুল্লাহ অশেষ সাহায্য পেয়েছিলেন বেগম হজরত মহলের পক্ষ থেকে। এমন-কি তিনি সৈন্য আর অর্থ প্রদান করেছিলেন। কিন্তু বড়োলাট ক্যানিং-প্রদত্ত পঞ্চাশ হাজার টাকার বিনিময়ে রাজা জগন্নাথ সিং স্বদেশভক্ত আহমদুল্লাহর ছিন্ন শির হাজির করেছিলেন ইংরেজ শাসকের দরবারে। ব্যর্থ হন বেগম হজরত মহল। তাঁর শেষ জীবন অজ্ঞাত। এই স্বাধীনতা-সংগ্রামে অসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিলেন মওলানা মোহম্মদ আলি এবং সৌকত আলির বৃদ্ধা মাতা আবাদি বেগম। তিনি পরিচিতা ছিলেন 'বিবি আম্মা' অর্থাৎ জনগণের শ্রদ্ধার জননী হিসেবে। অসহযোগ আন্দোলনের প্রচারকাজে তিনি বাঙলাদেশ পরিক্রমা করেছিলেন। শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল "মুক্তির সন্ধানে ভারত" নামক গ্রন্থে তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করেছেন।

স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রত্যক্ষ ভাবে যোগ না দিলেও বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের (১৮৮০-১৯৩২) বাঙালি মুসলমান সমাজে নারীমুক্তির মহানায়িকা হিসেবে আবির্ভাব বিস্ময়কর ঘটনা। বেগম রোকেয়া সম্পর্কে ড. অমলেন্দু দে 'Islam in Modern India' গ্রন্থে মন্তব্য করেছেন, 'a pioneer in the movement for emancipation of women in Bengali Muslim society.' তিনি নারীমুক্তির উদ্দেশ্যে উদ্বোধিত হয়ে কলকাতায় মুসলিম মহিলাদের জন্য

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম বীরাঙ্গনা—এম. আবদুর রহমান। প্রভিন্সিয়াল বুক এজেন্সি, কলকাতা-৯। চোদ্দ টাকা।

"পাথাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল স্থাপন করেন। তিনি স্থলেখিকা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন। জনাব রহমান ব্যাপক আলোচনা করেছেন। এই আলোচনাটি এই প্রজন্মের কাছে অশেষ মূল্যবান হিসেবে প্রতিভাত হবে। অবিভক্ত বঙ্গভূমির বাঙালি মুসলমান সমাজের পরিষ্কার চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বেগম রোকেয়ার সহোদরা বেগম করিমুন্নেসা মৈমনসিংহের দেল-দুয়ারের জমিদারপত্নী হিসেবেই বাঙালি মুসলমান জাগরণের ইতিহাসে পরিচিতা। বেগম করিমুন্নেসার অর্থানুকূল্য আর পৃষ্ঠপোষকতায় আব্দুল খান ইউসুফজী প্রকাশ করেছিলেন "আহমদী" পত্রিকা। বাঙালি মুসলমানদের স্বরূপসন্ধানে এই পত্রিকাটির ভূমিকা ছিল অনন্য। বিশিষ্ট সাহিত্যিক মীর মশাররফ্ হোসেন তাঁরই জমিদারি এস্টেটে চাকরি করতেন। মীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যে "বিষাদ-সিন্ধু" গ্রন্থটি বেগম করিমুন্নেসার নামে উৎসর্গ করেছিলেন। তাঁর পুত্রত্রয় স্যার আবদুল করিম গজনভী এবং স্যার আবদুল হালিম গজনভী সমকালীন নিখিল বঙ্গের রাজনীতিক্ষেত্রে বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরূপে স্থান করে নিয়েছিলেন। বেগম রোকেয়ার জীবন-বিকাশে তাঁর ভূমিকা ছিল ব্যাপক। বেগম রোকেয়া "মতিচূর" (২য় খণ্ড) তাঁর নামে উৎসর্গ করেন। ১৩৪৭ সালের বৈশাখ সংখ্যা "সওগাত" পত্রিকায় প্রকাশিত "মহীয়সী মিসেস এম. রহমান" শীর্ষক প্রবন্ধটি পরিমার্জনা করে এই গ্রন্থে স্থান দিয়েছেন। বাঙালি মুসলমান নারী-সমাজের সামনে বেগম রোকেয়া এবং মিসেস এম. রহমান আলোকবর্তিকার মতো সটান দাঁড়িয়েছিলেন। মিসেস এম. রহমান হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার শেখপুরা গ্রামে ১২৯১ বাংলা সনে জন্মগ্রহণ করেন। কাজি নজরুল ইসলাম তাঁর "বিষের বাঁশী" কাব্যগ্রন্থ-খানি এই মহীয়সী মহিলার নামে উৎসর্গ করেন। উৎসর্গপত্রে লিখেছিলেন, 'বাঙলার অগ্নিনাগিনী মেয়ে মুসলিম মহিলাকুলগৌরব আমার জগজ্জননী-স্বরূপা মা··· রক্ষণশীল সমাজপতিদের কাছে মিসেস রহমানের আবির্ভাব অনেকাংশে অসহনীয় হয়েছিল। খান মইনুদ্দিন তাঁকে 'অগ্নিফুলিঙ্গ' হিসেবে অভিহিত করেছেন। সাহিত্যসেবিকা হিসেবে অসীম সাহসের পরিচয় দিয়ে-ছিলেন তিনি। বর্ষীয়ান জনাব এম. আবদুর রহমান এই "অগ্নিনাগিনী মেয়ে"র আসল নামটি উল্লেখ করেন নি।

তৎকালীন সমাজে প্রচলিত অবরোধ-প্রথাকে অগ্রাহ্য করে অসহযোগ ও স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন ঢাকা ইডেন হাইস্কুলের ছাত্রী বগুড়ার দৌলতউন্নিসা, বেগম রহিমা খাতুন এবং কবি হোসনে আরা বেগম। দেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামে প্রত্যক্ষভাবে যোগ-দান করে কারারুদ্ধ হয়েছিলেন তাঁরা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, হোসনে আরা ছিলেন মহাপণ্ডিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহর ভ্রাতুষ্পুত্রী।

স্বাধীনতা-সংগ্রামের উপেক্ষিত একটি অংশকে আমাদের সামনে হাজির করেছেন এম. আবদুর রহমান আলোচ্য গ্রন্থটির মাধ্যমে। তাঁর এই অমূল্য প্রয়াস ব্যতিরেকে স্বল্পালোচিত বিষয়গুলো আমাদের অগোচরে থেকে যেত।

প্রত্যয় হয়, বইটি ইতিহাস-অনুসন্ধানী পাঠকদের আগ্রহী করে তুলবে। মূল্যবান বইটির অজস্র মুদ্রণ-প্রমাদ আমাদের আহত করে।

"নূতন নাৎনী"র সঙ্গে দাদু রবীন্দ্রনাথের পত্রালাপ

কান্তি গুপ্ত

অজস্র চিঠি লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ। 'যাদের দিকে চিঠির রাস্তা সহজ হয়ে গেছে' সেইসব ভাগ্যবাজোর অধিবাসী-দের তিনি চালান করেছেন, 'তার ভরতি মনের বকুনি।' রবীন্দ্রনাথের পত্র-ধারা আমাদের কেজো মনে সর্বপ্রথম জানান দিল যে, লাভ-লোকসানের কোলাহল এড়িয়ে সহাস্য হৃদয়ের সংগোপন ইশারাকে আশ্রয় দিতে হয় চিঠিতে। এক-একটি চিঠি সার্থক হয়ে ওঠে অবকাশময় মনের উল্লাসেই। রবীন্দ্রনাথের ভাবনাতেই সেসব কথা জানা গেছে—

পরিপূর্ণ ভাবভরে
লেপাফা ফাটিয়া পড়ে,
বেড়ে যায় ইষ্টাম্পের দাম।

"ছিন্নপত্রাবলী"র কোনো এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ইন্দিরা দেবীর কাছে লেখা তাঁর চিঠিগুলো আবার তাঁকে দেখতে দেওয়ার অনুরোধ জানিয়ে-ছিলেন। কেননা, বৃদ্ধ বয়সে তিনি তাঁর চিঠিতে দেখবেন যৌবনের 'এক-একটা দুর্লভ সৌন্দর্য, দুর্মূল্য সম্ভোগের সামগ্রীকে', যা তাঁর ব্যক্তিগত 'জীবনের অসামান্য উপার্জন।' এই অসামান্য উপার্জনের পরিপূর্ণতায় রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলো আর ব্যক্তিগত থাকে নি; বাঙলা গদ্যসাহিত্যের অসামান্য সং-যোজনরূপে সাধজনীন হয়ে উঠেছে।

ত্রিশ বছরের "ছিন্নপত্রাবলী" আর সত্তর বছরের "ভানুসিংহের পত্রাবলী" সকল চিঠিতেই সজীব-আনন্দে রবীন্দ্র-নাথের পৃথিবী প্রসার্যমাণ।

পারুলদেবীর কাছে রবীন্দ্রনাথ চিঠি লেখা শুরু করেন পঁচাত্তর বছর বয়ঃক্রমে। কালের ভর্ৎসনায় তখন দেহ পরাভব মেনেছে, পরাভবের ভ্রূকুটিতে মনের লাস্যও স্তিমিত। মন পরাভূত হয় নি বটে, তবে বিদায় গ্রহণের প্রস্তুতিতে সেখানে বৈরাগ্যের গেরুয়া রঙ। সবুজ সজীবতা ধূসর হয়ে এসেছে। মনের কোণে স্থান নিয়েছে অনেকটা যেন 'শিশু' কাব্যগ্রন্থের খোকার মার কোলে যাবার আকুতির মতো একটা ভাব—

ছুটোছুটি লাগল না আর ভালো।
ঘণ্টা বেজে গেল কখন
অনেক হল বেলা,
তোমায় মনে পড়ে গেল
ফেলে এলাম খেলা।

পারুলদেবী, দাদু রবীন্দ্রনাথের নতুন নাতনি। কোনো এক চিঠিতে রবীন্দ্র-নাথ তাঁর পরিচয় দিয়েছেন দৌহিত্রী নন্দিতাকে—'পারুল আর তার ছোটো বোন এসেছিল—তারা আমার বরানগর-বাসিনী নূতন নাৎনী।'

দাদু রবীন্দ্রনাথ নাতনি পারুলকে প্রথম চিঠি লেখেন ১৩৩৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। চিঠি লেখা চলেছে একটানা ১৩৩৯ সাল পর্যন্ত। মাঝখানে একবছরের চিঠির হদিশ নেই, অতঃপর মৃত্যুর তিন মাস আগে ১৩৪১ সালে একটিমাত্র চিঠি। সংকলক কুণাল সিংহ জানিয়েছেন, পারুলদেবী আর তাঁর ভাই রণজিৎ লাহিড়ীকে রবীন্দ্রনাথ মোট ৬৪টি চিঠি লিখেছিলেন। বর্তমান গ্রন্থে স্থান পেয়েছে পারুলদেবীকে লেখা মোট ৫৩টি চিঠি।

প্রথম চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁর অক্ষমতার কথা জানিয়েছেন পারুল দেবীকে, 'আমার পত্র লেখার একটা যুগ ছিল তখন পল্লবিত করে লিখতে পারতুম। এখন ঝরাপত্রের পালা—তুমি বিলেতে এসেচ—পত্রের আশা কর যদি তার শীর্ণতা দেখে দুঃখ পাবে। আমার নাৎনীরা এখন নিঃস্বার্থতার সাধনা করচে, সেবা করে, ফল কামনা করে না।'

রবিরশ্মির স্পর্শে পারুলদেবী ধন্য। পূর্বোক্ত প্রথম চিঠিতেই তার পরিচয় রয়েছে 'আবদার করবার অধিকার তুমি জয় করে নিয়েছ, সেটা পাকা হয়ে গেল বলেই মনে হচ্ছে।' হৃতরাং চিঠিগুলো আয়তনের সীমায় শীর্ণ বটে, কিন্তু অন্তরের আলোর অভাবে ক্ষীণ ও জীর্ণ রূপ নিয়ে পারুলদেবীর দুখের কারণ হয়ে ওঠে নি, আমাদেরও নয়। 'শীর্ণ সমারোহের পাণ্ডুরতা' বটে, কিন্তু স্নেহ-মায়া-মমতার দেশাভিমুখে প্রবহমান প্রস্রবণের কলহাস্যধ্বনি অশ্রুত নয়।

এই গুচ্ছের পত্রধারায় প্রকাশ পেয়েছে নাতনি-সান্নিধ্যে দাদুর হৃদয়ের প্রসন্নতা। নাতনিকে স্পর্শ করতে চেয়েছেন; কী নির্মল শুভ্রতা! 'হাতের কাছে দুটি একটি নাৎনী আছে তাদের বলি সেক্রেটারীগিরি কর পঁচিশ টাকা করে দরমাহা দেব, অবশ্য আপখোরাকি। যদি বুড়ো দাদু না হতুম, চেহারাটা কাঁচা থাকত তাহলে দরমাহার প্রস্তাবটা অনাবশ্যক হোত। কিন্তু নাৎনীদের মন অন্যত্র থেকে ফেরাতে পারি, এমন টান দেবার শক্তি এখন আর নেই। দীর্ঘশ্বাস ফেলি স্মরণ করে যখন বয়স ছিল পঁচিশ।'

কোনো-কোনো পত্রগুচ্ছে আশ্রয় দিয়েছেন নিসর্গপ্রকৃতির সান্নিধ্যে উন্মনা মনকে। একাধিক পত্রে লিপিবদ্ধ করেছেন বর্ষাশীতবসন্তে নিসর্গপ্রকৃতির সাজবদলের খবর। মাঝে-মধ্যে বিরূপতা প্রকাশ পেয়েছে বাসঘোগ্যের অতীত কলকাতার প্রতি। কখনো-কখনো স্মৃতি-চারণা করেছেন ফেলে-আসা পুরোনো দিনের দিকে তাকিয়ে, 'সেই পুরোনো বোটে আশ্রয় নিয়েছি—এই বোটে যৌবনের দিনে সোনার তরীর কবিতা লিখেছিলুম গল্পগুচ্ছের অনেক গল্পই এই বোটে লেখা।···নদী আমার ভালো লাগে। ছেলেবেলায় এক সময়ে এই চন্দননগরে ঐ সামনের বাড়িটাতে বৌঠানের আদরে কাটিয়েছিলুম।··· সন্ধ্যাসংগীতের কবিতা লিখছিলুম এইখানেই—মন উড়ে বেরিয়েছে রঙীন স্বপ্নের মেঘলোকে।'

আসন্ন বিদায়ের ম্লান অন্ধকার ছড়িয়ে পড়ার চিহ্ন রয়েছে কোনো-কোনো চিঠিতে, 'তুমি আমার বিশ্রামের কথা ভেবো না—কাজের ধারা আপনিই তো কমে এসেছে—বৈশাখ মাসের অজয় নদীর জলের মতো। বিশ্রামটাই ধূ ধূ করচে যেন বালুর চর। আমার খবর পাবার জন্যেও ব্যস্ত হোয়ো না—নানা খবর থাকে জীবনের মধ্যাহ্নদিনে—এখন প্রদোষের একটানা প্রহরের খবর আজও যেমন কালও তেমন।' সাহিত্য-প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়েছে কয়েকটি চিঠিতে। কিন্তু নিগূঢ় তত্ত্বকথায় দাদু-নাতনির চিঠি-চালাচালির মাধুর্যকে বিঘ্নিত করায় রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল।

আদরের নাতনির হাতের তৈরি

রবীন্দ্রনাথের চিঠি পারুলদেবীকে—কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশন বিভাগ, কল্যাণী, নদীয়া। ত্রিশ টাকা।

অন্নরঞ্জন গ্রন্থণের সরস বার্তা জানিয়েছেন। কিন্তু সাবধানবাণী উচ্চারণ করেছেন প্রথম পর্বেই। জীবন-সায়াহ্নকালে নাতনিকে ঘিরে রসসম্ভোগের ভাগে যেন ঘাটতি না পড়ে তত্ত্বকথার কচকচানিতে। লিখেছেন, 'তুমি মনে করচ তুমি প্রশ্ন করবে আর আমি উত্তর দেব, সে হবে না।···এখন এ বয়সের দস্তুর হচ্ছে নাৎনীরা কথা কয়ে যাবে আর দাদু স্মিতহাস্যমুখে মাঝে মাঝে নীরবে মাথা নাড়বে মাত্র। ···আমার কাছ থেকে কথা ফিরে চেও না।'

পারুল দেবীকে ঘিরে কবিপ্রাণ সঞ্জীবিত হয়েছিল। "প্রহাসিনী" কাব্য-গ্রন্থের ছুটি কবিতা, আর "ফুলিঙ্গে"র একটি কবিতা পারুল দেবীকে উদ্দেশ করে লেখা চিঠি থেকে আহৃত।

পারুল দেবীকে লেখা এই পত্রধারা "ছিন্নপত্রাবলী" নয়, "ভানুসিংহের পত্রাবলী"ও নয়। এর স্থাননির্গয়ে, তুলনামূলক আলোচনার প্রবর্তনাতে, পণ্ডিতের পালোয়ানি মনোবৃত্তি প্রকাশের আয়োজন বৃথা। অথচ এই পত্রগুচ্ছের অসামান্যতাকে অস্বীকার করায় বেরসিকের ধৃষ্টতা বড়ো হয়ে ওঠে। দীর্ঘকালের সৃষ্টির ঐশ্বর্যকে এড়িয়ে প্রতীক্ষার নিশ্চল বেদনায় জীবনের শেষ কয়েকবছর কবির কেটেছে। লিখেছেন, 'জীবনটা প্রথমে ছিল ঝরনা, তারপরে হয়েছিল নদী, এখন এসে দাঁড়িয়েছে সরোবর রূপে। এখন না আছে গতিবেগ না আছে ধ্বনিবৈচিত্র্য, চুপচাপ আছি আপন গভীরতার মধ্যে।' 'বাইরেকার চঞ্চল বিশ্বের ছোটো বড়ো নানা ধারা এসে এখানে পৌঁছয়'—কবি তাদের গ্রহণ করেন 'বক্ষতলে, কিন্তু নিঃশব্দে।' রবীন্দ্রজীবনের এই শেষপর্বের নৈঃশব্দ্যের অনির্বচনীয় মৌন বাণী বহন করছে পারুল দেবীর কাছে লেখা প্রত্যেকটি চিঠি। রবীন্দ্র-চিঠিপত্রের ভাণ্ডারে এই পত্রগুচ্ছ অমূল্য সম্পদ।

পারুল দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিগুলোর সংগ্রহ, সংরক্ষণ, সম্পাদনা এবং পুস্তকাকারে প্রকাশের রূপ দানে শক্তি ব্যয় করেছেন কল্যাণী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারিক কুণাল সিংহ মহাশয়। সর্বত্রই তাঁর শ্রমযোগের স্বাক্ষর। গ্রন্থটি তিনটি অধ্যায়ে বিভাজন করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায় "প্রসঙ্গ-কথা", দ্বিতীয় অধ্যায় পারুল দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির সংগ্রহ এবং তৃতীয় অধ্যায়ে পারুল দেবীর ছোটো বোন দেবরানী দেবীর "স্মৃতিচারণ"।

কুণাল সিংহের "প্রসঙ্গকথা" এই গ্রন্থের অপরিহার্য অঙ্গ। এই প্রসঙ্গকথা ব্যতিরেকে বরানগরবাসিনী শরৎচন্দ্র লাহিড়ীর কন্যা, দিনেশচন্দ্র রায়ের স্ত্রী, কুড়ি বছর বয়স্কা পারুলের রবীন্দ্রসান্নিধ্যে আসার সংবাদ অগোচরে থেকে যেত। কুণাল সিংহ সংক্ষেপে পারুলের জীবন-পরিচয় দান করেছেন। সচেষ্ট থেকেছেন কয়েকটি মূল্যবান চিঠির উৎস সন্ধানে। পারুলের ছুটি চিঠি সংযোজিত করে তিনি পারুলকে স্পর্শ করার সুযোগ পাঠককে দান করেছেন। এই অধ্যায়েই সংযোজিত হয়েছে পারুলকে কবিতায় লেখা তিনটি চিঠি। (এই তিনটি চিঠি চিঠিপত্রের অধ্যায়ে সংযোজিত না হওয়ার কৈফিয়তের দাবি কিন্তু উপেক্ষা করা যায় না)।

তৃতীয় অধ্যায়ে স্মৃতিচারণ অংশের সঙ্গে পত্রধারার যোগ সামান্য। তবে, আটপৌরে স্বভাবের মধ্যে রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া গেল, এইটুকুই লাভ। দিদি পারুলের সঙ্গে দেবরানী, বিয়ের আগে রবীন্দ্রনাথের কাছে যেতেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেবরানীর যোগাযোগের কালসীমা খুবই সংক্ষিপ্ত। এই সংক্ষিপ্ত সময়সীমার মধ্যে তিনি রবীন্দ্রনাথের মানবমূর্তি খুঁজেছেন। "ভাইফোঁটা" প্রভৃতি বিবরণে সার্থকও হয়ে উঠেছেন। "শ্যামলী"তে কোনো এক রাত্রিতে যন্ত্রণাকাতর শুশ্রূষা-বুভুক্ষু নিঃসঙ্গ কবির কথা জানিয়ে তিনি যখন লেখেন, 'লোকে জানে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ—তিনি ধনী, তিনি জ্ঞানী, তিনি বিরাট, জগৎজোড়া তাঁর নাম। কিন্তু কত অসহায়, তিনি স্নেহের কাঙাল। তিনি অপেক্ষা করেন, কে এসে তাঁর অন্তর-দুয়ারে কখন স্নেহের একটু যত্নের করস্পর্শ করবে। একথা কেউ জানে না।' বাস্তবিক, আমাদের চক্ষু সজল হয়ে আসে।

রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত জীবনের টুকিটাকি খবর রবীন্দ্রস্নেহধন্য-আশীর্বাদ-পুষ্ট অনেকেই নানাভাবে উপস্থিত করেছেন অসংখ্য গ্রন্থে। তাঁদের সাহচর্যে বঙ্গসাহিত্যের ধারা পুষ্টি লাভ করেছে। তাঁদের বৃহৎ ব্যক্তিত্বের স্বাদ দেবরানীর স্মৃতিচারণায় প্রত্যাশিত নয়। অথচ সহজ সুরে বয়োবৃদ্ধ রবীন্দ্রনাথের মানব-জীবনকে উপস্থিত করার সুপ্রচেষ্টায় শ্রেয়সী শিরোপা তিনি দাবি করতে পারেন।

গ্রন্থটির উৎকর্ষ এনে দিয়েছে রবীন্দ্র-নাথের সঙ্গে পারুল দেবীর একটি ছবি এবং পত্রগুচ্ছের কয়েকটি ফটো কপি। কাগজ দামি, ছাপানোতে সযত্ন প্রয়াস রয়েছে। চিঠিগুলিকে ক্রমিক সংখ্যায় সংখ্যায়িত করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা গেল। একই পৃষ্ঠায় শীর্ষকায় পত্র-গুলিকে একসঙ্গে গুঁজে দেওয়ায় পীড়ার কারণ হয়ে উঠেছে। পূর্ণেন্দু পত্রীর প্রচ্ছদে রয়েছে মনজুড়ানো স্নিগ্ধতার প্রলেপ।

বঙ্গদেশের গ্রন্থরাজ্যে পুরোহিত-তন্ত্রের যুগ এখনো অবসিত হয় নি। অনেক কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, গবেষক তাঁদের গ্রন্থের মূল্যবৃদ্ধিকল্পে ভূমিকা বা প্রস্তাবনা আসনে পুরোহিতের কণ্ঠে মন্ত্র শোনানোর ব্যবস্থা করেন। কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশবিভাগ রবীন্দ্রনাথের পত্রগুচ্ছ প্রকাশেও পুরোহিতের আসন পেতেছেন। রবীন্দ্রনাথের পত্রাবলী কত-খানি পত্র-সাহিত্য, কতখানি যুগচেতন ইত্যাদি বোঝাতে "প্রস্তাবনা" শীর্ষে ডীন, ফ্যাকালটি অব আর্টস অ্যানড কমার্স-এর বাগ-বিস্তার নিতান্তই কি আবশ্যক? সংগতি-ও পরিমিতি-বোধের ক্ষীণতা সুন্দর জগতে অসুন্দরকে ডেকে আনে মাত্র।

বাঙলা আধুনিক গান : সংকটের আবর্তে

সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়

বাঙলা আধুনিক গান বড়ো কঠিন সমস্যায় পড়েছে। একটা চাক্ষুষ অভিজ্ঞতার বিবরণ দিয়ে সমস্যাটাকে বোঝবার চেষ্টা করা যাক।

স্থান—কলকাতার অনতিদূরে একটি শহর।

কাল—আশ্বিন-কার্তিক মাস। বিজয়া-উৎসব উপলক্ষে একটি গানের জলসার আয়োজন করা হয়েছে।

প্রবীণ প্রথিতযশা এক সঙ্গীতশিল্পী গেয়ে চলেছেন তাঁর জনপ্রিয় বাঙলা গানগুলি। হঠাৎই ঘটে গেল সব ছন্দপতন। কয়েকজন শ্রোতার 'হিন্দি ফিল্‌মি গান চাই' দাবির সঙ্গে এক টুকরো ইট তীব্রবেগে ছুটে এসে আঘাত করল এক বাদ্যযন্ত্রে। শিল্পী নীরবে, ম্লানমুখে, নতমস্তকে মঞ্চ থেকে নেমে গেলেন।

তখন মঞ্চে উঠলেন এক "আশাকর্মী"। যান্ত্রিক তাণ্ডবের সাথে হিন্দি ছবির নায়িকার মতো কোমর দুলিয়ে শুরু হল তাঁর "গান"। প্রতিবাদমুখর সেই শ্রোতাদের তালে-তালে নাচ আর "সিটি"র তালহীন উচ্ছ্বাসে জমে উঠল জলসা।

প্রায় অবিশ্বাস্য এই ঘটনার পিছনে যে ভয়ঙ্কর সত্যটি লুকিয়ে আছে, সময় এসেছে সেটিকে স্পষ্ট করে চেনার—বিচারের, বিশ্লেষণের। কেন এমন হয়? হয়ে চলেছে? কে বা কারা দায়ী?

বাঙলা গানের কোন্ ধারাকে আমরা "আধুনিক" নামে চিহ্নিত করেছি? পণ্ডিতী আলোচনার মধ্যে না প্রবেশ করে, এই কথা বলা যায়: বাঙলা আধুনিক গান বিধিবদ্ধ শাস্ত্রীয় নিয়মের বন্ধনহীন এক সাঙ্গীতিক রূপ—ভাষা আর সুরের এক সুষম নান্দনিক সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে তা শ্রোতাকে আনন্দ দেয়, শ্রোতার মনে এক তৃপ্তিদায়ক ভাবরসের উদ্‌বোধন ঘটায়। এই সংগীতধারার প্রধানতম উপজীব্য হল মানবচিত্তের নানা ভাব—প্রেম, বিরহ, উল্লাস, বিষাদ, মুগ্ধতা, সংকল্প, অনায়ত্ত কিছুকে আয়ত্ত করার জন্য গভীর আকুলতা ইত্যাদি। ভাষাকে আশ্রয় করে, সুরের দ্বারা বাহিত হয়ে সেই ভাব নিজেকে প্রকাশ করে।

১. ইতিহাস

কবে থেকে বাঙলা গানের শুরু? আপাতত বলা সম্ভব নয়, এই মুহূর্তে তার প্রয়োজনও নেই। তবে, এইটুকু বলা যায়, সম্ভবত চর্যাগীতগুলির সময় থেকে এই সংগীতধারার, এই ভাষাশ্রিত-সুরবাহিত ভাব প্রকাশের রূপের সূচনা হয়েছে। তাহলে, এর বয়স প্রায় এক হাজার বছর—এত দীর্ঘদিন ধরে বাঙালি উত্তর-ভারতীয় মার্গসংগীতচর্চার সঙ্গে-সঙ্গে এই ধারায়ও গান বাঁধছে এবং গাইছে।

এর পরে এল বৈষ্ণবভাবাশ্রিত কীর্তনের কাল। পদাবলী-কীর্তন, নামকীর্তন, পালাকীর্তন, নগরকীর্তন—নানা নামে সংগীতের এই ধারাটি দীর্ঘকাল বাঙালির প্রাণমনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে, আজও এর আবেদন অক্ষুণ্ণ। রবীন্দ্রসংগীতে, দ্বিজেন্দ্রগীতিতে, অতুলপ্রসাদের সংগীতসাধনায় কীর্তনাঙ্গ গানের সংখ্যা নেহাত কম নয়। বোঝা যায়, গানপাগল বাঙালির মনে কীর্তনগানের আবেদন আজও সজীব। এরই পাশাপাশি বইতে থাকল শ্যামাসংগীতের ধারা।

একটা সময় পর্যন্ত বাঙলা পদ্যসাহিত্যে যা-কিছু লেখা হত সবই গেয়ে শোনানো হত। সম্ভবত ভারতচন্দ্রের যুগে এসে কবিতা সুরের আশ্রয় ত্যাগ করে একটা স্বতন্ত্র, নিজস্ব প্রতিষ্ঠাভূমি গড়ে তুলল, আর এই পরিণতি একটা সমৃদ্ধ রূপ অর্জন করল ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের কালে এসে।

অষ্টাদশ শতকে এসে দেখা গেল, ভিন্নতর ভাব আর আঙ্গিক নিয়ে কিছু-কিছু নতুন ধারার উদ্ভব হয়েছে—কবি-গান, তরজা, হাফ-আখড়াই, টপ্পা, যাত্রাগান। এ-সমস্ত গানের ভাববস্তু ছিল প্রধানত পৌরাণিক, তবে সমকালীন সমাজের নানা ছবিও অনেক সময় ফুটে উঠত। গ্রামে শহরে এইসব গানের উৎসুক শ্রোতের সংখ্যা বড়ো কম ছিল না। নিধুবাবুর 'ভালোবাসিবে বলে ভালোবাসি না', 'পীরিতি না জানে সখি সে জন সুখী বলে কেমনে' ইত্যাদি টপ্পাগান এক সময় লোকের মুখে-মুখে ফিরত। তখন নীলকণ্ঠ মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ অধিকারী, কৃষ্ণকমল গোস্বামী প্রমুখের যাত্রাপালার গান এবং দাশরথি রায়ের পাঁচালি মানুষ শুনতে ভালো-বাসত। পরে বিকৃতরুচি শহুরে বাবুদের খুশি করতে গিয়ে

এইসব গানের ভাববস্তুর মধ্যে স্থূলতা এসে পড়ে।

নানা যুগের বিবিধ সাঙ্গীতিক ঐতিহ্যকে স্বাঙ্গীকৃত করে বাঙলা গান প্রসারিত হয়েছে, রসসমৃদ্ধি লাভ করেছে।

২. একালের কথা

বাঙলা "আধুনিক" গানের প্রথম সার্থক উদ্‌বোধক নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রনাথ। বাঙলা গানের বিচিত্র, ঐশ্বর্যবান ঐতিহ্যের (বিশেষত বাউলগান, কীর্তন ইত্যাদির) সঙ্গে পাশ্চাত্ত্যের বিভিন্ন সুরের ধারাকে মিলিয়ে কবি সৃষ্টি করলেন এমন একটি বিশেষ সংগীতরীতি যা সম্পূর্ণভাবেই অভিনব রচনা। মার্গসংগীতের ছাঁচে তৈরি হলেও তা বাঙলা গানের ভাণ্ডারে সম্পূর্ণ নতুন অর্জন। রবীন্দ্রসংগীতই হল বাঙলা আধুনিক গানের উৎসমুখ।

সেই সঙ্গেই নাম করতে হয় দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের। ভাবের গভীরতায় আর ওজস্বিতায়, বাণীরচনার সৌকুমার্যে, পাশ্চাত্ত্য সংগীতরীতির সম্মিলনে, সুরের বৈচিত্র্য আর উদাত্ততায় দ্বিজেন্দ্রলাল বাঙলা গানে নিয়ে এলেন এক নতুন রসের প্রবাহ। অন্য দিকে, টপ্পাগানের সুরে আর রাগমিশ্রণে রজনীকান্ত সেন সৃষ্টি করলেন তাঁর ভক্তিরসাশ্রিত শান্ত ভাবের গান; অতুলপ্রসাদ সেন বাঙলা গানে হিন্দুস্থানি ঢঙে আনলেন মার্গসংগীতের মেজাজ; নজরুল ইসলাম রাগ-মিশ্রণের নিপুণতায় আর আরবি-ফারসি সুরের অনবদ্য প্রয়োগে বাঙলা গানে কিছু নতুন গুণের প্রকাশ ঘটালেন।

পরবর্তী যুগে বাঙলা গান যে পথে, যে রূপে বিবর্তিত হয়েছে, তার মূল প্রেরণা অবশ্যই এসেছে রবীন্দ্রনাথ-দ্বিজেন্দ্রলাল-অতুলপ্রসাদ-রজনীকান্ত-নজরুলের সংগীতরূপ থেকে।

এরই কাছাকাছি সময়ে (১৮৯৮ সালে) "হিজ মাস্টার্‌স্ ভয়েস"-এর বেলেঘাটা স্টুডিও থেকে রেকর্ড বেরিয়েছে লালচাঁদ বড়ালের 'কাদের কুলের বউ গো তুমি, কাদের কুলের বউ'। পাশাপাশি বেদনাবালা দাসী, কে. মল্লিক, ইন্দুবালা, আঙুরবালা প্রমুখেরা দাপটে গেয়ে চলেছেন। সেই সময়ের বাঙলা গানে মোটামুটি ছটি ধারার প্রাধান্য ছিল—একটি ভক্তিমূলক, অন্যটি টপ্পা-খেমটা জাতীয়। পরের দিকের সুরকারদের তাই পথসন্ধান করতে হয়েছে নতুনভাবে।

৩. আরও সামনের দিকে এসে

১৯৩১ সাল থেকে, চলচ্চিত্রে "না-বলা কথা" হিসাবে গানের প্রচলন শুরু হল। সুরের বহুধা বিচিত্রতায় সেই পথসন্ধানের চরিত্রে আর আদলে ঘটতে থাকল নিত্যনতুন পরিবর্তন, পরিবর্ধন। সেই যুগে যাঁদের কণ্ঠদানে চলচ্চিত্র সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁরা হলেন কৃষ্ণচন্দ্র দে (প্রথমে দেবকী বসুর "চণ্ডীদাস" ছবিতে), কুন্দনলাল সায়গল (প্রথমে প্রমথেশ বড়ুয়ার "দেবদাস" ছবিতে), কানন দেবী ("মুক্তি" ছবিতে) প্রমুখ।

এই সময়ে সিনেমাসঙ্গীতে সুরকার হিসাবে যাঁরা এসে-ছিলেন তাঁদের মধ্যে প্রথমেই মনে আসে রাইচাঁদ বড়াল আর হীরেন বসুর নাম। কিছু পরে এলেন হিমাংশু দত্ত, তারও কিছু পরে কমল দাশগুপ্ত। হিমাংশু দত্তর রাগভিত্তিক গানে ছিল শান্ত-স্নিগ্ধ সুরের মায়াজাল। আর, বিভিন্ন সুরের সংমিশ্রণে, প্রাচ্য-পাশ্চাত্ত্য ধারার সম্মিলনের মৌলিক মুনশিয়ানায় কমল দাশগুপ্ত সৃষ্টি করেছেন যথার্থ আধুনিক গান। তাঁর 'পৃথিবী আমারে চায় রেখো না বেঁধে আমায়' (সপ্ত চৌধুরী), 'আমি বনফুল গো' (কানন দেবী), 'আমি ভোরের যূথিকা' (যূথিকা রায়), 'অমনি বরষা ছিল সেদিন' (ফিরোজা বেগম) বাঙলা আধুনিক গানে নতুন পথ দেখিয়েছে। তাঁর সময় থেকে, বিশেষত ১৯৫০ সাল পর্যন্ত, বাঙলা গানের সুরকার হিসেবে যাঁরা এসেছিলেন তাঁরা অনেকেই কমবেশি তাঁর দ্বারা প্রভাবিত। ব্যতিক্রম ছিলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক আর সুধীরলাল চক্রবর্তী। পঙ্কজকুমারের 'কোন্ লগনে জনম আমার', 'এই পেয়েছি অনলআলায়', 'ও কেন গেল চলে' অনবদ্য মৌলিক সৃষ্টি। সুধীরলালের 'মধুর আমার মায়ের হাসি', 'খেলাঘর মোর ভেঙে গেছে হায়', 'স্মৃতি তুমি বেদনা', 'এ জীবনে মোর যত কিছু ব্যথা যত কিছু পরাজয়' বাঙালির চিত্তে চিরজীবনের সনদ পেয়ে গেছে।

এরই প্রায় সম-সময়ে এসেছিলেন শচীন দেববর্মন। তাঁর 'ঝিলমিল ঝিলমিল ঝিলের জলে', 'মন দিল না বঁধু' ইত্যাদি গানে রাগসংগীত আর লোকসংগীতের আন্তর সুক্ষ্মতার ঐক্য বড়ো সুন্দর প্রকাশ পেয়েছে।

এরই সমসময়ে, অন্যতম ঘটকের 'গানে মোর কোন্ ইন্দ্রধনু' (সন্ধ্যা), 'বলে কুহু কুহু কোয়েলা' (শ্যামল ও সন্ধ্যা), 'জীবননদীর জোয়ারভাটা' (সত্যনাথ) জোলবায় নয়। সেই সঙ্গেই মনে রাখতে হয় রবীন চট্টোপাধ্যায়ের

'এ শুধু গানের দিন' (সন্ধ্যা), 'মাধুমালতী ডাকে আয়' (সন্ধ্যা), 'আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা' (শ্যামল) এবং সুবল দাশগুপ্তের সুরে জগন্ময় মিত্রের গাওয়া 'চিঠি', 'সাথী ও সখী।'

৪. আর-এক নতুন ধারা

এই সমস্ত গানই ছিল বিরহ-প্রেমের গান, রোমানটিক আবেগের রসে অভিসিঞ্চিত। এই সময়েই আমরা শুনতে পেলাম উন্মাদক রসের গান—যাকে "গণসংগীত" বলে চেনানো হয়ে থাকে। জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্রের 'নবজীবনের গান'; বিনয় রায়ের 'ফিরাইয়া দে দে মোদের কায়ুর বন্ধুদেরে', 'বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ'; হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'কাস্তেটারে দিয়ো জোরে শান কিসান ভাই রে', 'মাউনটব্যাটেনমঙ্গলকাব্য'; সলিল চৌধুরীর 'রানার', 'কোনো এক গাঁয়ের বধূর', (সুকান্ত-লিখিত) 'অবাক পৃথিবী', 'চলো চলো হে শান্তিসেনানী', 'পথ হারাব বলেই এবার'; বিজন ভট্টাচার্যের 'ও হোসেন ভাই দামুকদিয়ার চাচা'—এসব সৃষ্টি আধুনিক বাঙলা গানের জগতে ওজোগুণের, উদ্দীপক ভাবের সঞ্চার করল।

দুই

৫. স্বর্ণযুগ

১৯৫০ সাল বা তার কিছু আগে থেকে প্রায় ১৯৬৫ সাল—এই পনেরো-কুড়ি বছর ছিল বাঙলা আধুনিক গানের, বলা যেতে পারে, স্বর্ণযুগ। এই কালপর্বে একাধিক অনন্যসাধারণ গীতিকার-সুরকার-কণ্ঠশিল্পীর আবির্ভাব হয়েছিল। তাঁরা জয় করে নিয়েছিলেন সংগীতপ্রেমিক বাঙালির হৃদয়কে। এঁদের মধ্যে বিশেষভাবে মনে রাখতে হয় সলিল চৌধুরীকে।

৬. নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা

সলিল চৌধুরী শুধু বাঙলায় নন, সারা ভারতে সেই গুটিকয়েক সুরকারদের একজন যাঁরা পাশ্চাত্ত্যের ধ্রুপদী সংগীত আর লোকসংগীতকে বাঙলা গানে সার্থকভাবে, রসোত্তীর্ণ করে প্রয়োগ করেছেন। কবি বিমলচন্দ্র ঘোষের কবিতা 'উজ্জ্বল একঝাঁক পায়রা'র সুরসৃষ্টি এর এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উদ্দীপক গান থেকে শুরু করে রোমানটিক গান, এমন-কী নিকট-অতীতের শিশুসংগীতে ধরা আছে তাঁর নবরূপ-উদ্ভাবনী প্রতিভা। বাণীরচনায়, সুরের সম্মেলনে, কখনও বা সমস্ত গানটাতেই—এমন-কী ইনটারল্যুড, প্রিল্যুড মিউজিক পার্টেও তাঁর মৌলিক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিচয় পাই। তিনি একটি নিজস্ব সংগীতবলয় রচনা করেছেন যার ছায়ায় ঘুরে-ফিরেছেন অনেক সুরকার। অনল চট্টোপাধ্যায়ের ['জানি এ ভুল' (আরতি), 'কাঞ্চন কাঞ্চন আহারে বাহারে' (সন্ধ্যা)], অভিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ['হংসপাখা দিয়ে' (শ্যামল), 'সবাই চলে গেছে' (হেমন্ত), 'এমন একটা ঝড় উঠুক' (হেমন্ত)], প্রবীর মজুমদারের ['মাটিতে জন্ম নিলাম' (ধনঞ্জয়), 'অনেক রাত ঝিমোন চাঁদ' (হেমন্ত)] সুরসৃষ্টিতে এই ধারার অনুবর্তী।

ভিন্নতর ধারায় সুর-রচনা করেন নচিকেতা ঘোষ আর সুধীন দাশগুপ্ত। বাণীর প্রতিটি শব্দের ব্যঞ্জনাকে গানের সুরে ফুটিয়ে তোলা, বাণী আর সুরের সার্থক সম্মেলন নচিকেতা ঘোষের বৈশিষ্ট্য। 'মৌবনে আজ মৌ এসেছে' (হেমন্ত), 'নিশিরাত বাঁকাচাঁদ আকাশে' (গীতা দত্ত), 'কাহারবা নয় দাদরা বাজা' (মান্না), 'মায়াবতী মেঘে এল তন্দ্রা (সন্ধ্যা), 'এমন একটা ঝিনুক খুঁজে পেলাম না' (নির্মলা মিশ্র) ইত্যাদি তাঁর প্রাণভরানো সুরসৃষ্টির সাক্ষ্য।

সুধীন দাশগুপ্ত মেলডিপ্রধান সুরে আমাদের মাতিয়ে তুলেছিলেন। 'একঝাঁক পাখিদের মতো কিছু রোদ্দুর' (মান্না), 'কোন্ সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে যেন আমার' (আশা), 'আজ মন চেয়েছে আমি হারিয়ে যাব' (লতা), 'তোমার সমাধি ফুলে-ফুলে ঢাকা' (শ্যামল) তাঁর চিরদিন মনে রাখার মতো সুরসৃষ্টি।

এই সময়ে এমন অনেক সুগায়ক আর সুগায়িকার আবির্ভাব হয়েছে যাঁদের কণ্ঠে গানগুলি তাদের পূর্ণ ঐশ্বর্যে প্রকাশ পেয়েছিল—হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, মান্না দে, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়; গায়িকাদের মধ্যে সুপ্রভা সরকার, সুপ্রীতি ঘোষ, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, নির্মলা মিশ্র, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়।

অবশ্য, সুগায়ক এবং সু-সুরকার হিসাবে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কথা বিশেষ করে বলতে হয়। দীর্ঘ ৫০ বছরের বেশি সময় ধরে বাঙলা আধুনিক গানে তিনি একাই একটি স্বতন্ত্র প্রতিষ্ঠান। রবীন্দ্রনাথ-অতুলপ্রসাদের ঐতিহ্যকে আশ্রয় করে, পল্লীসংগীত আর কীর্তন ভেঙে বাঙলা গানে মেলডিপ্রধান সুরের যে ব্যাপ্তি আর গভীরতা তিনি এনেছেন, তা বাঙলা গানের অম্লান সম্পদ।

তিন

৭. কেন এই বন্ধ্যাদশা ?

মোটামুটিভাবে বলা যায়, ১৯৬৪-৬৫-র পর থেকেই আস্তে-আস্তে বাঙলা আধুনিক গানে ভাঁটার টান শুরু হয়ে যায়। শ্রোতাদের অনেক কাছাকাছি আসতে পেরেছিলেন আরতি মুখোপাধ্যায়, পিন্টু ভট্টাচার্য, অনুপ ঘোষাল, হৈমন্তী শুক্লা, অরুন্ধতী চৌধুরীর মতো শিল্পীরা, কিন্তু চিরকালের সংগীত সৃষ্টিতে তাঁরা তেমন সফল হলেন না।

বাঙলা আধুনিক গান আজ গুরুতর রূপে সংকটাপন্ন। কিন্তু আজ কোন্ শিল্পই বা সংকটমুক্ত ? যে আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বন্ধ্যাদশা ঘিরে রেখেছে আমাদের দেশকে, সংগীতজগতের বর্তমান অবনমনে তারই আংশিক প্রতিফলন।

৮. সংকটের নানা রূপ

বাঙলা আধুনিক গানের সংকটের কারণ খুঁজতে গিয়ে মূলত দুটি ঘটনার দিকে চোখ পড়ে। প্রথমত, নবীন যোগ্য প্রতিভাবান গীতিকার-সুরকার-গায়কগায়িকা উঠছেন না; দ্বিতীয়ত, পুরনো প্রতিষ্ঠিত শিল্পীরাও আর নতুন কিছু সৃষ্টি করতে পারছেন না। কী বাণীরচনায়, কী সুরসৃষ্টিতে, কী কণ্ঠদানে মানুষকে জাগিয়ে তোলার মাতিয়ে তোলার মতো, মনকে অনুভবের গহন গভীরে পৌঁছে দেওয়ার মতো সৃষ্টি তেমন কিছু পাওয়া যাচ্ছে না। সবই যেন কেমন তরল, নিষ্প্রাণ, ছকে ফেলা—ভাবে অতিদীন।

ক. নতুন প্রতিভাবান শিল্পীর যে অভাবটি আজ তীব্রভাবে অনুভব করা যাচ্ছে, তার মূলটি প্রোথিত হয়েছিল মোটামুটি ষাটের দশকের শুরু থেকেই।

সমস্যাটি যে রূপ নিয়ে দেখা দিল সেটি এই :

আগে যাঁরা চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনা করতেন—ভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়, রাইচাঁদ বড়াল, রবীন চট্টোপাধ্যায়, নচিকেতা ঘোষ, গোপেন মল্লিক, অনিল বাগচী, সুধীন দাশগুপ্ত, রাজেন সরকার, কালীপদ সেন প্রমুখ—তাঁরা সুকণ্ঠ গায়ক-গায়িকাদের আহ্বান করতেন কণ্ঠদানের জন্য। একমাত্র ব্যতিক্রম ছিলেন পঙ্কজকুমার মল্লিক।

এই সময়ের কিছু আগে থেকেই অনেক সুকণ্ঠ শিল্পী চলচ্চিত্র-সংগীতে একাধারে সুরকার-গায়করূপে আবির্ভূত হলেন। ফলে, নবীন শিল্পীদের আত্মপ্রকাশ এবং আত্মবিকাশের সুযোগ বেশ কিছুটা সঙ্কুচিত হয়ে গেল।

খ. দ্বিতীয় সমস্যাটি সৃষ্টি করলেন রেকর্ড কোমপানির মালিকেরা। আগে সংগীতশিল্পীদের গানের রেকর্ড করা হত একান্তভাবে তাঁদের সাংগীতিক কৃতিত্বের ভিত্তিতে—তাঁরা চলচ্চিত্রে গান কি গান না, এটা বিচার্য বিষয় ছিল না। কিন্তু যখন থেকে সিনেমা-সংগীত জনপ্রিয় হয়ে উঠল, তখন থেকে চলচ্চিত্রে যাঁরা নেপথ্যশিল্পী হিসাবে কণ্ঠদান করতেন তাঁরাই রেকর্ড করার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকার পেতে থাকলেন। কারণ, তাঁদের গানের বাজার ভালো। ফলে, চলচ্চিত্রে গান করেন না, এমন প্রতিশ্রুতিমান গায়ক-গায়িকার আত্মপ্রকাশের পথ ক্রমে-ক্রমে বন্ধ হয়ে যেতে থাকল। এই সমস্যাটি নিয়ে—সংগীতজগতে নতুন প্রতিভার উদয় কেন হচ্ছে না, এই প্রশ্ন নিয়ে—প্রবন্ধলেখক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কাছে উপস্থিত হয়েছিল। তিনি বলেন, 'আমরা যে সময়ে গান করেছি সে সময়ে প্রায় প্রতি মাসেই রেকর্ড হত। নবীন শিল্পীরা একাধিক সুযোগ পেতেন। একটা না লাগলে আর-একটা লাগত। এখনও শিল্পী প্রচুর, কিন্তু তাঁদের সেই সুযোগ কোথায় ?'

যাঁরা নবীন, যাঁরা যোগ্য, যাঁরা সত্যিই প্রতিভাবান, যাঁরা গান গেয়েই ভুবনকে ভরিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন, তাঁদের বেশির ভাগই, উৎসাহ সংবর্ধনার অভাবে হারিয়ে যেতে থাকলেন অপরিচয়ের অন্ধকারে। কোনো শিল্পের মূল্য যখন ব্যবসায়ীর লাভ-লোকসানের অঙ্কে নির্ধারিত হয়, তখন এই-রকমটাই হয়—শিল্প মার খেতে থাকে।

৯. মান নেমে যাচ্ছে

(গ) সংকট ঘনিয়ে ওঠার আরও একটি কারণ আছে—সেটি হল সংগীতচর্চার গুণমানের ক্রম-অধোগতি। পঁচিশ-তিরিশ বছর আগের তুলনায় বাঙালি সমাজে এখন সংগীতচর্চায়

যথেষ্ট প্রসার হয়েছে, সংগীতশিক্ষার্থীর সংখ্যা বেড়েছে, কিন্তু সুযোগ্য শিক্ষকের অভাবে তার মানোন্নয়ন হচ্ছে না। মান ক্রমশ নেমেই যাচ্ছে।

এমন একটা সময় ছিল যখন সুশিক্ষকের অভাব ছিল না; তুলনায় শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছিল কম। তাই গিরিজাশঙ্কর চক্রবর্তীর মতো সংগীতগুরুর হাতে তৈরি হয়েছিলেন তারাপদ চক্রবর্তী, সুধীরলাল চক্রবর্তী, যামিনী গাঙ্গুলী, সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়, সন্তোষ মুখোপাধ্যায়ের মতো কৃতী সংগীত-সাধক—যাঁরা নিজেরাও হয়ে উঠেছিলেন সার্থক শিক্ষক। সুধীরলালের কাছে শিক্ষা নিয়ে উঠে এসেছেন শ্যামল মিত্র, উৎপলা সেন, নীতা সেন। সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তৈরি হলেন নির্মলা মিশ্র, আরতি মুখোপাধ্যায়। সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় আর সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের গুরু ছিলেন যামিনী গাঙ্গুলী আর চিন্ময় লাহিড়ী। এঁদের মতো সংগীত-গুরু এখন তো দেখাই যাচ্ছে না। গ্রামে শহরে পাড়ায়-পাড়ায় গানের ইস্কুল, প্রচুর শিক্ষার্থী সেখানে, কিন্তু সংগীত-চর্চার মান নেমেই চলেছে। সংগীতশিক্ষণ এখন একটা লাভ-জনক ব্যবসায়ে পরিণত হয়েছে। পয়সা খরচ করলেই সার্টিফিকেট জোটানো যায়।

(ঘ) বাঙলা আধুনিক গানের এই অবনমনের জন্য গীতিকাররাও কম দায়ী নন। তাঁদের রচনায় সেই ভাবৈশ্বর্য কোথায় যা মনকে সত্যকার আবেগে আন্দোলিত করে? গভীরতম অনুভবের সরোবরে স্নান করিয়ে শ্রোতার চিত্তকে পরিশুদ্ধ করে, নতুন উপলব্ধিতে সমৃদ্ধ করে? এখন, চটুল সুরের সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে গানের কথা হয়ে উঠেছে অতি-তরল, ভাবরিক্ত, নিরর্থক। বাজারের ফরমায়েশ মানতে গিয়ে তাঁরা নিজেদের শক্তির অপচয় ঘটাচ্ছেন।

গানের জগতের সংকটের কথা বলা হল। কিন্তু শুধু গানে কেন, বাঙালি সমাজে সংকট তো আজ বৌদ্ধিক এবং মানস সৃষ্টির বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই।

আসলে, এক ক্রান্তিকালের মধ্য দিয়ে চলেছে আজকের বাঙালি সমাজ। আশা নেই, বিশ্বাস নেই, সংসংকল্পের দৃঢ়তা নেই, নতুন কিছু সৃষ্টি করার গভীর, প্রাণপণ উন্মাদনা নেই। আছে ভোগোপকরণ লক্ষ করে রুদ্ধশ্বাস, প্রাণান্তকর দৌড়। এমন অবস্থায় জীবনের কোনো ক্ষেত্রেই বড়ো কিছুর, সার্থক কিছুর, চিরস্মরণীয় কিছুর সৃষ্টি হয় না। পূর্বযুগের মহৎ সৃষ্টি-গুলিও আজকের নিরাশ্বাস জীবনে তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছে।

কিন্তু, এই উলটো প্রবাহ নিশ্চয়ই চিরস্থায়িত্বের সনদ নিয়ে আসে নি। এ প্রবাহ রুদ্ধ হবে, শুরু হবে। যাঁরা এ প্রবাহ রোধ করবেন, তাঁরা এই সমাজেই আছেন। ইতস্তত বিচ্ছিন্ন হয়ে আছেন। আমরা দিন গুনছি—কবে তাঁরা যূথবদ্ধ হবেন, নতুন বাতাস বইয়ে দেবেন।

আগামী সংখ্যা থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হবে ঐতিহাসিক এবং অধ্যাপক বিনয় চৌধুরীর গভীর গবেষণাপ্রসূত মৌলিক সন্দর্ভ: "ধর্ম ও পূর্বভারতে কৃষক-আন্দোলন ১৮২৪-১৯২০"

জুন সংখ্যায় ১১২ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত কবিতাটির ৮ম লাইনের শেষ শব্দটি হবে 'সব' ('শব' নয়)।

মতামত

বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্যের পত্র

হাসপাতাল থেকে লিখছি।

বলির পাঁঠার মতো অপারেশনের অপেক্ষায় হাসপাতালে শুয়ে-শুয়ে দিন গুনছি। যদি বিপদ কাটিয়ে উঠতে পারি, অবশ্যই খবর পাঠাব।

এখন শুধু এইটুকু বলছি—চতুরঙ্গ তার ট্র্যাডিশন মতো নির্দিষ্ট পথেই চলেছে। নতুন কোনো সংখ্যা হাতে এলে পড়ে ফেলতে দেরি হয় না।

চতুরঙ্গ পড়ে একটা বিশেষ লাভ বাংলাদেশের সাহিত্য সম্পর্কে বেশ কিছু জানা যায়—যার জন্য আমার কাছে অন্য কোনো জানলা খোলা নেই। আমার জীবনের প্রথম বছর-গুলি বরিশাল জেলার একটা গ্রাম্য স্কুলে কেটেছিল বলে ও-অঞ্চলের মানচিত্র এখনও মানসপটে প্রায় অম্লান। তাই ওখানকার কথা শুনতে বিশেষ আগ্রহ। জুলাই সংখ্যায় আবুল হাসানাত সাহেবের প্রবন্ধটি মনোযোগ দিয়ে পড়লাম। বাংলাদেশের আটষট্টি হাজার গ্রামের সবগুলি না হোক, অন্তত কিছু-কিছু গ্রামে—মানসভ্রমণ করি, বিশেষ করে বরিশাল-ফরিদপুর অঞ্চলের গ্রামগুলিতে। বোঝা যাচ্ছে, এ আকাঙ্ক্ষা আমৃত্যু থেকে যাবে। কিন্তু দুঃখ হয় এই ভেবে, যে-গ্রাম আমরা ফেলে এসেছি তার চাকচিক্য বাড়লেও এবং কিছু মানুষ সমৃদ্ধ হলেও সাধারণের দুঃখদুর্দশার কোনো হেরফের ঘটে নি। আবুল হাসানাতের প্রবন্ধ তো সেই কথাই বলে। আমার ইস্কুলের মুসলিম সহপাঠীরা বেঁচে আছেন কিনা জানি না, থাকলে তাঁদের জীবনধারা কী পথে চলছে জানতে ইচ্ছা হয়। আমার মতো তাঁরাও গেঁয়ো লোক। অনুমান করি, চাকরিবাকরি যাই করুন, গাঁয়ের মাটি আঁকড়েই পড়ে আছেন তাঁরা। আমাদের সময়ে গ্রামগুলি ছিল ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড়। এখন কী পশ্চিমবঙ্গে, কী বাংলাদেশে গ্রামগুলিতে ছায়া থাকলেও শান্তি বোধহয় কিছুমাত্র নেই। এই উপলব্ধি নিয়েই পরলোকের পথে পা বাড়িয়ে আছি।

গ্রন্থসমালোচনা অংশেও বাংলাদেশ থাকছে। বাংলা-দেশের সাহিত্যকথা কিছু জানা নেই, দুধের স্বাদ না পাই ঘোলের গন্ধ পাচ্ছি তো! তাই বা কম কিসে?

জুলাই সংখ্যায় 'সংগীত' প্রবন্ধটি আমার লিভারের পক্ষে দুষ্পাচ্য। এ যেন গ্রহান্তরের বার্তা। "এঙ্গেলস, রামকৃষ্ণ, সুব্রমনিয় ভারতী এবং রবীন্দ্রনাথ" (পৃ ২৪৫)—রামকৃষ্ণ ও রবীন্দ্রনাথের মাঝে সুব্রমনিয় ভারতী কেন? "মীরা দাঁড়িয়ে আছেন একা ভারতবর্ষ জুড়ে একজন নারী" (পৃ ২৪৫)। মীরার অনেক আগে এসেছিলেন আণ্ডাল (তামিলনাড়ু) এবং মহাদেবিয়ক্কা (কর্ণাটক)—সুতরাং মীরা একা নন।

বিনয়নমস্কারান্তে
বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য

আরবি লিপি এবং পারসিক লিপি প্রসঙ্গে

চতুরঙ্গ জুন ১৯৮৮ সংখ্যায় সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ ১৯৮৮ মে সংখ্যা চতুরঙ্গে প্রকাশিত আমার লেখা "ফররুখ আহমদ: তাঁর কাব্যবিশ্বাস" প্রবন্ধে 'তাঁরা পারসিক ভাষাকে আরবী হরফে লিখেছেন'—এ একেবারেই ভুল ধারণার যে উল্লেখ করেছেন, সেটা এতই সহজ যে, ভুল কি নির্ভুল তা নির্ণয় করা একেবারেই কঠিন কিছু নয়। প্রথমত, এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকা যদি অথেনটিক হয়, তবে তার মত হচ্ছে 'ইরানী ভাষা পূর্ব ইতিহাস অনুসারে বিভিন্ন লিপিতে লেখা হয়েছে, যদিও বিভিন্ন ধরনের আরামীয় লিপি তাতে প্রভাবিত ছিল। আধুনিক ফারসি ভাষা একেবারেই আরবি হরফে লেখা হয়ে থাকে, সেটাও আরামীয় বংশোদ্ভূত। ফারসি উচ্চারণ অনুযায়ী p $\bar{c}$ $\bar{z}$ এবং g—এই চারটি বর্ণ আরবি হরফের সঙ্গে অতিরিক্ত নোকতা বা চিহ্ন দ্বারা সংযোজিত হয়েছে। এইরকম বর্ণসংযোগ করে ফারসি-আরবীয় লিপিকে ভাষাতে গ্রহণ করা হয়েছে। আধুনিক ফারসি ছাড়াও পুস্তু, কুর্দিস, বালুচি ইত্যাদি ইরানীয় ভাষাতেও তা হয়েছে। কিন্তু আধুনিক ফারসি ভাষার যে দুটি ধারা সোভিয়েত ভূখণ্ডে চলছে—সেগুলি রুশ হরফে চলছে তাজিক এবং ওসেটিক। ওসেটিক আবার জর্জিয়ার লিপিতেও লেখা হয়।

প্রাচীন পারসিক ভাষা লেখা হত বাণমুখী লিপিতে; প্রকৃত তাই কিনা এখনো সেটা উত্তপ্ত আলোচনার বিষয়। মধ্য পারসিক, পার্থীয়, সোগডীয় এবং পুরানো খুরজেমেনীয় ইত্যাদি কিন্তু আরামীয় বিভিন্ন লিপিতে লেখা হত। দু ধরনের এইরকম লিপি গৃহীত হয়ে উন্নতি পেয়েছিল 'উইপুর-দের দ্বারা' (সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের "বৈদেশিকী"র প্রথম খণ্ডে উইপুরদের তুকি বলা হয়েছে। তারা রুণীয় লিপি ব্যবহার করত, যা মূলত রোমান বা গ্রীক লিপির সমতুল)।

এই লিপিদ্বয়ের টানা রূপটা পরবর্তী কালে ছড়াল মোঙ্গল এবং মাঞ্চুদের ভেতর।

মধ্য-ফারসির আরো তিনটি লিপিরূপ খুবই গুরুত্বপূর্ব ছিল, যেমন গ্রীক হরফ দিয়ে লেখা হত ব্যাকট্রিয়, আরবি হরফে লেখা হত অন্ত খুরজেমেনীয় এবং মধ্য এশিয়ার ব্রাহ্মীলিপি দিয়ে লেখা হত খোটেনাসীয় ও তুমস্থথীয় ফারসি ভাষা। কিন্তু আরামীয় লিপি শৃঙ্খলিতভাবে কখনো মধ্য-ইরানীয় ভাষাতে দেখা যায় নি। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, পহলভি লিপি মধ্য ইরানীয় ভাষা ও জুরাথুষ্ট্রীয় গ্রন্থাদিতে ব্যবহৃত হত, পরবর্তী কালে তাওঁ রূপ পালটে গেছে। মূল ২২টি আরামীয় বর্ণ ১৪টিতে দাঁড়ায়, শেষে ৪৮ স্পষ্ট বর্ণমালায় রূপ পায়।

এতে কিন্তু সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'ধারণা' নির্ভুল প্রমাণিত হয় না। দ্বিতীয়ত "জেন্দ আবেস্তা" লেখা হয়েছে ১৩শ শতকের পরে, যখন আরবি হরফ মোটামুটিভাবে পহলভি ভাষাকে গ্রাস করেছে। এ প্রসঙ্গে জুরাথুষ্ট্রীয় পণ্ডিত Georg Morgenstierne-এর মত হচ্ছে : The Avesta was not recorded until after the language had ceased to be used, except by Zoroastrian Priests. The present manuscripts date from the 13th century and later, although they reflect the recording of the priestly tradition in the special Avestan scripts during the 6th century AD. কারণ জেন্দ আবেস্তার পুরানো অংশ হচ্ছে গাথা, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে তা লোকমুখে-মুখে ছিল ; মৌখিক রূপকে জেন্দ বলা হত, পরে আবেস্তা (পহলভি) ভাষাতে রূপ পেয়ে তা জেন্দ আবেস্তা হয়েছে।

ইরানীয় (সংস্কৃত Arya বা আর্য, আবেস্তীয় Airya, প্রাচীন পারসিক Ariya ইংরেজিতে থাকে আমরা Aryan বলি) ভাষাকে পণ্ডিতেরা তিনটি স্তরে রেখেছেন—প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক। প্রাচীন ইরানীয় ভাষার শিলালিপি ও পট পাওয়া যায় দু ধরনের, আবেস্তীয় এবং প্রাচীন পারসিক। তাও খ্রীষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকের বেশি পুরানো বলে মনে হয় না।

আবেস্তীয় ভাষা সম্ভবত উত্তরপূর্ব ইরানে ব্যবহৃত হত, আর প্রাচীন পারসিক ব্যবহৃত হত দক্ষিণ-পশ্চিমে। তা ছাড়া আরো নানা পুরানো ইরানীয় ভাষার ব্যবহার ছিল, তারও বর্ণনা হিরোডোটাস দিয়েছেন খ্রীষ্টপূর্ব ৫ম শতকে। জরোথুষ্ট্রের কাব্য আবেস্তীয় ভাষায় লেখা হয়েছে, তাছাড়া আসামেনীয় রাজাদের শিলা ও মুদ্রালিপিতে এ ভাষা রয়েছে। প্রথম দারিয়াস (Darius I-522—486 BC)-এর পেপেরাস ডকুমেন্টস-এও এ ভাষা আছে।

আলেকজান্ডার এসে ইরান তছনছ করলেন, ইরানের যা-কিছু ছিল, তার অনেকটাই নিয়ে গেল গ্রীকেরা, দিয়ে গেল অনেক কিছু ; গ্রীসে ইরানের যেসব নিদর্শন আছে, তাতে জানা গেল প্রাচীন ইরানীয় ভাষার রূপ ছিল এক-প্রকারের আরামীয় ও ইলামিটীয়। মধ্য ইরানীয় ভাষায় লিখিত রূপ হচ্ছে পহলভি ও মানিচীয় মধ্য পারসিক ভাষায়। তা ছিল খ্রীষ্টপূর্ব তিন শতক থেকে ৯৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। এ সময় তাদের পার্থীয় এবং সোগডীয় ভাষাও বলা হয়। এ ভাষা গ্রীক-প্রভাবিত। এদের ভেতর থেকে খোটেনাসীয় এবং তুমস্থথ ভাষার উদ্ভব হয়েছে। এ সব ভাষাতে কোন আরবি কিংবা স্পষ্ট সেমেটিক শব্দ দেখা যায় না।

আধুনিক ইরানী ভাষার সঙ্গে উপরে উল্লিখিত ভাষার রূপের সহসা কোন সাদৃশ্য বা সম্পর্ক দেখা যায় না। আধুনিক ভাষার তিনটি রূপ খোয়াজেনীয়, ব্যাকট্রীয় এবং সাকা, তবে তাকে পার্থীয় ভাষার পরিবর্তিত রূপ বলে ধরা যায়। ভাষা হিসাবে ইরানীয় ইন্দোইয়োরোপীয় ভাষা, তার সঙ্গে সেমেটিক ভাষার কোন সম্পর্ক নেই।

মধ্য-পারসিক ভাষার রূপ পাওয়া গেছে তৃতীয় শতকে প্রথম শাহপুর-এর শিলালিপি ও মুদ্রালিপি থেকে যাকে গ্রীকলিপি কিংবা পার্থীয় লিপির সমতুল্য বলা যায়।

বর্তমান ইরানীয় ভাষা রূপ পেয়েছে ৭ম থেকে ৯ম শতকের পর, মুসলমানেরা যখন ইরানে আধিপত্য বিস্তার করেছে।

শামসুল আলম সাঈদ

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের বক্তব্য

শামসুল আলম সাঈদ আমার বক্তব্যকে নেহাত ব্যক্তিগত 'ধারণা' ধরে নিয়ে নিরর্থক বিবিধ অপ্রাসঙ্গিক বিষয়ের অবতারণা করে অনিদিষ্ট ঐতিহাসিক সরলতাকে অহেতুক জটিল করে ফেলেছেন। কৌতুকপ্রদ ব্যাপার, তিনি নিজেই যা সব লিখেছেন, তার অর্থ সম্পর্কেও সচেতন নন। ভাষা ও লিপি নিয়ে নিবন্ধ লেখার অবকাশ ও অভিপ্রায় এ মুহূর্তে আমার নেই। শুধু বিষয়টি কিঞ্চিৎ খোলসা করে দিতে চাই। তাঁর চিঠিতে এটাও স্পষ্ট, তিনি ভাষা, বর্ণমালা (alphabets), লিপি (script), লিখনশৈলী (calligraphy) এসব টার্ম সম্পর্কে সম্যক সচেতন নন।

এনসাইক্লোপীডিয়া ব্রিটানিকার তথ্যাদির প্রামাণিকতা কদাচ প্রশ্নাতীত নয় এবং এই 'বুক অব নলেজ'-জাতীয়

স্যাডো-পণ্ডিতীর সহায়ক ও ধনী-গৃহের শোভাবাঞ্চক কেতাব সম্বল করে কোনও ধারণা গড়ে তোলা বিপজ্জনক। কারণ জ্ঞানচর্চা থেমে নেই। নিরন্তর গবেষণার ফলে নিত্যনতুন তথ্যাদি আবিষ্কৃত হচ্ছে। তথ্যের প্রাথমিক উৎসগুলির প্রতি তন্নতন্ন দৃষ্টিপাত জরুরি। নেজস্ব ভাষা ও লিপিবিষয়ক প্রচুর গ্রন্থাদি পাঠই একমাত্র উপায়। ইতিহাসপাঠও আবশ্যিক।

শামসুল ই. বি র কোন্ বছরের কোন্ সংস্করণ এবং কোন্ বিভাগ থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন, জানান নি। তাঁর জানা দরকার ছিল, ই. বি-র দুটি বিভাগ আছে : 'নলেজ ইন ডেপ্থ্' এবং 'রেডি রেফারেন্স।' ই. বি-র প্রথম প্রকাশ ১৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দে। নিত্যনতুন তথ্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে বলেই ই. বি (মাইক্রোপীডিয়া)-র এ পর্যন্ত গোটা ষোলো সংস্করণ বেরিয়েছে দুটি বিভাগেরই। ১৯৭৪ সালের পঞ্চদশ সংস্করণ 'নলেজ ইন ডেপ্থ্' বিভাগের প্রথম খণ্ডের ৬২০ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত করছি : Aramaic alphabets can be divided into two main groups : the scripts employed for Semitic languages and those adapted to non-Semitic tongues...Among these scripts, which are directly, or indirectly adapted to non-Semitic languages from the Aramaic alphabates are : (I) the Persian (Iranian) scripts known as Pahlavi, which are used for writing the sacred (pre-Islamic) Persian literature.' আমার চিঠিতে এই পহলভি লিপির উৎসনির্দেশ করেছিলাম, যাতে শামসুলের চক্ষুকর্ণের বিবাদভঞ্জন হয়। এবার ই. বি-র 'রেডি রেফারেন্স' বিভাগের ১৯৭৪ সালের পঞ্চদশ সংস্করণের প্রথম খণ্ডের ৪৬৯ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি :...it (আরবি বর্ণমালা ও লিপি) probably developed in the 4th century A. D as a direct descendant of the Nabatean alphabet, its origin and early history is vague. The earliest extant example of Arabic writing is a trilingual inscription in Greek, Syriac, and Arabic dating from A.D 512.'

শামসুল এবার নিজেই দেখুন ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে! 'জরাথুষ্ট্রীয় পণ্ডিতে'র যে উদ্ধৃতিটি তিনি দিয়েছেন, তার অর্থের প্রতি মনোযোগই দেন নি। 'রেকর্ডেড', 'স্পেশাল অভেন্তা ক্রিপ্ট,' (যা খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের বলা হয়েছে) এসব শব্দে কী বোঝায়, একটু ভেবে দেখা উচিত ছিল না কি? তা ছাড়া শব্দটি আসলে জোরাস্তার।' এটিকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের তথাকথিত আর্যজাতি (!)-বাদীরা সংস্কৃত ভাষায় বদলে দিয়ে উদ্ভট করে ফেলেছেন। যাই হোক, ওই পণ্ডিতের বইটির নাম, সংস্করণকাল ইত্যাদির উল্লেখ জরুরি ছিল। জোরাস্তারীয় ধর্মগ্রন্থ ত্রয়োদশ শতকে 'রেকর্ডেড' হলে তা পারস্যে বা আধুনিক ইরানে হতে পারে না। কারণ তৎকালে এই-ধর্মাবলম্বী অর্থাৎ পার্শীরা সে-দেশে ছিলেনই না। কেন ছিলেন না, ইতিহাসের নির্মোহ ছাত্রও বিশদ জানে। তার চেয়ে চোখে আঙুল দিয়ে দেখানোর মতো ঘটনা হল, ভারতে পালিয়ে আসা পার্শীদের লিপি। কলকাতায় বিস্তর পার্শী বাস করেন। তাঁরা কী হরফে লেখেন, খোঁজ নিন। আরবি হরফে? তাঁদের লিপি পহলবি এবং এ লিপি উর্দু-ভাষীরাও অনায়াসে পড়তে পারেন।

শামসুল নিজের অজান্তেসারে যুগপৎ ব্রাহ্মণ্য শোভিনিজম 'আর্যিয়ান' (Aryanism) এবং ইসলামি মোল্লাতন্ত্রের শোভিনিজমে আক্রান্ত। 'ইরান' শব্দটি নিখাদ আরবি। এর সঙ্গে ছান্দস/সংস্কৃত 'আর্য' শব্দের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। আরবি আইর্>ইর্ শব্দের গৌরবার্থ বহুবচন আন্-যোগে নিষ্পন্ন হয়েছে ইরান শব্দ। অর্থ হল চন্দ্রকলাকৃতি উর্বর ভূখণ্ড (Fertile Crescent)। 'ইরাক' শব্দেও একই কনোটেশন প্রচ্ছন্ন। এর বিপরীতার্থক শব্দ হল আরবি বাইর্>বর এবং বর অর্থ জলহীন রুক্ষ ভূখণ্ড। বহুবচন আন্-যোগে অপভ্রংশে (Dialectal Variation) শব্দটি দাঁড়িয়েছে 'বিরান।' ইংরেজি Barren এ থেকেই উদ্ভূত। 'বিরান' বাংলাতেও এসেছে। অর্থও প্রায় অবিকৃত। প্রখ্যাত আল-বিরুনির নামেও মূল অর্থ প্রচ্ছন্ন। পারসিক খোয়ারু-পমীয় (অপভ্রংশ) উপভাষায় শব্দটি একটু বদলে গেছে। যাই হোক, মূল বিষয়টি ছেড়ে শব্দার্থতত্ত্ব ও ভাষাতত্ত্বের কচকচি অপ্রাসঙ্গিক। ঐতিহাসিক আধুনিক তথ্য হল :

(১) পারস্তে হখমনীয় আমলের (খ্রীপূ ৫৫৮-খ্রীপূ ৩৩০) শেষাশেষি অক্কাদীয়-ব্যাবিলনীয় কীলকাকার (Cuniform) লিপিকে হটিয়ে আদি পারসিক লিপির উদ্ভব ঘটে। আরামীয় লিপিই ছিল মডেল। ত্রিভাষিক কীলকাকার লিপির নিদর্শন এত প্রচুর যে, এ নিয়ে 'উত্তপ্ত আলোচনা'-র প্রশ্নই ওঠে না। ভাষা তিনটি হল, তৎকালীন পারসিক, এলামীয় ও অক্কাদীয়-ব্যাবিলনীয়। আদি পারসিক লিপিই তথাকথিত 'অবেস্তা লিপি', ঈষৎ গোলাকার গড়ন। এই লিপিকেই Alphabetic writing system বলা চলে। (আগের চিঠিতে উৎসনির্দেশ ছিল)।

(২) পহলবি আমলে (খ্রীপূ ২৫০-খ্রী ১৫১) ওই লিপির

লিখনশৈলী (calligraphy) বদলে যায়। তার নাম হয় পহলবি লিপি। পহলবি লিপিতে লেখা বিশাল সাহিত্যসম্ভার আবিষ্কৃত হয়েছে। ফেরদৌসির 'শাহ্‌নামাহ্‌' তার ভিত্তিতেই রচিত হয়েছিল (গ্রীকরা দেশটিকে Parthia বলত)।

(৩) সাসানীয় আমল (খ্রী ২২৮-খ্রী ৭২৯) পর্যন্ত পারস্যে পহলবি লিপি বহাল ছিল। ৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে শেষ জোরাস্তার-ধর্মাবলম্বী সম্রাট ইয়াজদাগির্দ হিরার যুদ্ধে আরব মুসলিমদের হাতে পরাজিত হন এবং সারা পারস্যে ইসলামি-আরব প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে ক্রমশ পারস্যের ভাষা ও লিপি Arabicised হয়ে পড়ে। বর্ণমালার বর্ণনামগুলি এবং বর্ণ-পরম্পরাও Arabicised হয়। এটাই আধুনিক ফার্সি। উল্লেখযোগ্য ঘটনা, ইসলামের আবির্ভাব ৬১০ খ্রীষ্টাব্দে।

(৪) খ্রীষ্টীয় ৫ম শতক পর্যন্ত আরবি ছিল মৌখিক ভাষা। ৬ষ্ঠ শতকে ইরাকের কুফা অঞ্চলে প্রথম আরবি লিপির উদ্ভব। লিখনশৈলীর বিচারে পরবর্তী কালে তাকে কুফি লিপি নাম দেওয়া হয়। এই লিপির জন্ম আরবরা প্রাথমিক-ভাবে নাবাতীয় খ্রীষ্টানদের ব্যবহৃত হিব্রু লিপি এবং পরোক্ষ-ভাবে আরামীয় লিপি ও পহলবি লিপির কাছেও ঋণী। আবার হিব্রু লিপি সরাসরি আরামীয় লিপির কাছে ঋণী।

(৫) পহলবি লিপি Arabicised হয়েছে শুধু Alpha-betic unitগুলিতে। কিন্তু calligraphy-তে এ দুটি লিপির পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ার মতো। আরবি লিখন-শৈলীর উজ্জ্বল বিকাশের পিছনে স্বয়ং ইসলামপ্রবক্তার প্রেরণা ছিল। তাই Arabicised 'ফার্সি'-র তুলনায় আরবি calligraphy সৌন্দর্যে এবং উৎকর্ষে অসাধারণ।

ভাষা, লিপি, লিখনশৈলী এক জিনিস নয়। পারসিক ভাষা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর একটি প্রধান ভাষা হলেও ঐতিহাসিক ঘটনাচক্রে সেমেতীয় লিপি গ্রহণ করে-ছিল। কিন্তু লিপির script) ইতিহাস অনুসারে পারসিক লিপির (Alphabetic writing system) প্রায় এক হাজার বছর পরে আরবি লিপির জন্ম। Language, Script, Alphabets, Calligraphy এই টার্মগুলি তলিয়ে বোঝা দরকার। নতুবা 'সব চীনাকেই একই লোক' মনে হওয়ার বিভ্রান্তিতে ভুগতে হবে। আর একটি কথা। প্রাচীন আরবরা 'ইরান বলতেন পারস্যসাম্রাজ্যের একটি উর্বর ছোট্ট ভূখণ্ডকে। আজ আমরা যে পারস্যদেশটি দেখছি, তা 'ইরান' নাম অর্জন করেছে ১৩৫৪ খ্রীষ্টাব্দে। ছিন্নবিচ্ছিন্ন পারস্যের অবশিষ্ট টুকরো মাত্র। কাজেই ভাষার দিক থেকে 'ইরান' শব্দপ্রয়োগ ভ্রমাত্মক। ভাষাটির নাম 'পারসিক' বলাই যুক্তিযুক্ত এবং ভাষাবিজ্ঞানসম্মত। শামসুল আলম নিজেই যা লিখেছেন (যেমন, 'আবেস্তীয় ভাষায় লেখা হয়েছে'), সেদিকে একবার দৃষ্টিপাত করুন। 'আবেস্তীয় ভাষায় লেখা' বললেই লিপির কথা আসে না কি? হখমনসীয় বা Achaemenid (গ্রীকদের দেওয়া নাম) কীলকাকার লিপি (শামসুলের ভাষায় বাণ-মুখী)-তে সম্রাট প্রথম দারিয়ুসের লেখাগুলি ত্রিভাষিক: এলামীয়, অক্কাদীয়-ব্যাবিলনীয় এবং তৎকালে প্রচলিত পারসিক ভাষার। ওই আমলের শেষাশেষি তথাকথিত 'Avestan script'-এর উদ্ভব, যাকে প্রকৃত অর্থে বর্ণমালা-ভিত্তিক লিপি বলা চলে। এরই অন্যনাম প্রাচীন পারসিক লিপি। এর নিদর্শন চামড়ায় লেখা জেন্দা অভেস্তা। আমি আগের চিঠিতে যার তথ্যসূত্র নির্দেশ করেছিলাম। এই লিপির গড়ন ছিল ঈষৎ গোলাকার।

শৌভিনিজম জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এক মারাত্মক বিপদ। আমি গ্রন্থাগারিক নই। তবে শামসুল যদি কিছু মনে না করেন, তাঁকে অন্তত এই প্রাথমিক গ্রন্থগুলি পাঠের অনুরোধ জানাব। A History of Eastern Civilization—G. A. Dudley (John Wiley & Sons, New York, 1973), The Dead Sea Scrolls—John. Allegro (Pelican, 1964), The Art and Architecture of Ancient Egypt.—W. S. Smith (Pelican, 1981), The Cultural Atlas of Islam—I. R. Al-Faruqi & L. Faruqi (Macmillan, New York, 1986), The Alphabet : A Key to the History of Man-kind—David Diringer (Mac. London, 1927), History of the Persian Empire—H. Olstead (Mac. London, 1921), Voices in Stone—E. Doblhofer (Paladin, London, 1973), Painting in Islam—T. W. Arnold (Dover Pub., New York, 1965), The Prehistory of the Mediterran-ean—D. H. Trump (Peguin, 1980), Linguistics—David Crystal (Penguin, 1981), Middle Eastern Mythology—S. H. Hooke (Penguin, 1987) ইত্যাদি। Herodotus কী লিখেছেন, তা সরাসরি পড়ার জন্য ইংরেজি অনুবাদ 'History' রয়েছে। পূর্ণাঙ্গ অনুবাদটি করেছেন A. de Selincourt এবং পেঙ্গুইনের ১৯৭২ সালের সংস্করণটি সুলভ। আরও কিছু প্রাসঙ্গিক গ্রন্থের তালিকা দেওয়া যেত। প্রয়োজন নেই আপাতত। উল্লিখিত গ্রন্থাদিতে আলোচ্য বিষয়ের বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। আরবি লিপি যে পারসিক লিপির জনক কখনই নয়, তা সুনির্দিষ্টভাবে প্রমাণিত।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ
কলকাতা-১৪

Premier Sprinkler Systems
A Total Tea Irrigation Plan

The Premier 'total-tea-Irrigation-plan' means the best irrigation sys-tem with specialized equipment engineered at the lowest capital cost for your garden.

Sprinklers

Spray water gently and evenly. Exclusive sealed bearings to ensure years of continuous reliable operation.

Coupling Valves

New and exclusive to Premier Systems. Sprinklers are moved and reconnected easily and quickly. Less labour. More irrigation.

Pipelines

Flexible and strong. Fastest coupling and uncoupling. Best water sealing.

Pumpsets

More reliable. More economi-cal.

Soil Moisture Meter

Helps you control irrigation. Maximize production with minimum water.

Premier Service

Highly trained expert team who survey and analyse before proposing the Premier Sprink-ler System best suited to your garden. Backed by prompt and comprehensive after-sales-service.

Prernier Irrigation—not just a complete system, a complete service.

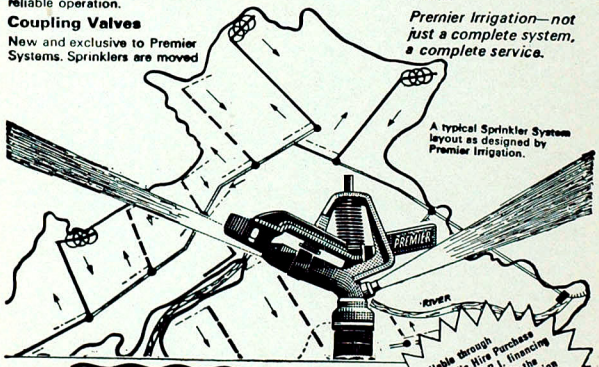

A typical Sprinkler System layout as designed by Premier Irrigation.

Available through Tea Board's Hire Purchase Scheme and I.D.B.I. financing facilities. In addition to the normal annual I.T. depreciation deduction, a 25% deduction as investment allowance is permitted in the year of installation.

PI PREMIER IRRIGATION EQUIPMENT LIMITED

Plantation Irrigation Department
17/1C, Alipore Road, Calcutta 700 027
Tel : 45-7455/7626/5302